জুলাই ২০০৯ শ্রাবণ ১৪১৬

সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

সহযোগী সম্পাদক
ড. সরকার আমিন

প্রচ্ছদ ও শিল্পনির্দেশক
কাইয়ুম চৌধুরী
অলংকরণ
রাজিব রায়

প্রকাশক : মোহাম্মদ আবদুল হাই পরিচালক
ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ বাংলা একাডেমী

সম্পাদনা সহযোগী : মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক
মেহেলিকা ববিতা কাজী রেহানা বেগম
অক্ষর বিন্যাস : শামিমা শবনম মোহাম্মদ অলিউল্লাহ খান

মুদ্রক : মোবারক হোসেন ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস

মূল্য : ৪০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা

উত্তরাধিকার বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল পৌষ ১৩৭৯/জানুয়ারি ১৯৭৩-এ, সমন্বিত বাংলা একাডেমীর প্রথম মাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাকে 'বিশেষ বর্ষশুরু সংখ্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সমন্বিত বাংলা একাডেমীর প্রথম মহাপরিচালক ড. মযহারুল ইসলাম।

সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে সহায়তা, নতুন লেখক সৃষ্টি এবং দেশি-বিদেশি সাহিত্যের আলোচনা-পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণকে পাঠকের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যেই মাসিক উত্তরাধিকার প্রকাশ করা হয়েছিল। দশ বছর পত্রিকাটি মাসিক পত্রিকা হিসেবে চালু থাকলেও ১৯৮৩ সাল থেকে ত্রৈমাসিকে রূপান্তরিত হয়। কেন এই পরিবর্তন একাদশ বর্ষের ১-৩ সংখ্যায় তা বলা হয় নি। বাংলা একাডেমীর মতো একটি বৃহৎ জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে একটি সাহিত্য পত্রিকা কেন চালু রাখা সম্ভব হয় নি তা ভেবে দেখা যেতে পারে। শুধু মাসিক থেকে ত্রৈমাসিকে রূপান্তরিত নয়, পত্রিকাটি ধীরে ধীরে অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং বাজারে পাওয়া না যাওয়ার কারণে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা হিসেবে আখ্যা লাভ করে। উত্তরাধিকারের এই পরিণতি মোটেই কাম্য ছিল না। বাংলা একাডেমী তার সৃজনশীল সাহিত্যকর্মী এবং নিজস্ব জনশক্তির সাহায্যে এ পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবে জাতির কাছে সেটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তা হয় নি। বিষয়টি হতাশাব্যঞ্জক। তবে এই পত্রিকা কোনো কোনো সময় অসাধারণ সব বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে বিস্ময়েরও যে সৃষ্টি করেছে সে-বিষয়টিও বিস্মৃত হওয়া যায় না। বাংলা একাডেমীর জনবল দিয়ে যদি ওইরকম উঁচুমানের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা যায় এবং বাংলা একাডেমী থেকেই তার জন্য অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তাহলে নিয়মিতভাবে মাসিক পত্রিকা হিসেবে উত্তরাধিকার কেন চালু রাখা যাবে না তা নিয়ে তো প্রশ্ন উঠতেই পারে।

যাহোক, আমরা বাংলা একাডেমীর প্রথম অঙ্গীকারের কথা মনে রেখেই উত্তরাধিকার পত্রিকাকে আবার নবপর্যায়ে এবং নতুন আঙ্গিক ও বিন্যাসে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বর্তমান সংখ্যাটি সেই প্রয়াসেরই ফসল। বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বাস্থ্যকর বিকাশ এবং আমাদের চিন্তা-চেতনার বহুমাত্রিকতা ও সংস্কৃতি রুচির ঋদ্ধি, নান্দনিক বোধ ও বুদ্ধিবৃদ্ধিকতার তীক্ষ্ণতার প্রতিফলনে উত্তরাধিকার সদা সচেষ্ট থাকবে। সেইসঙ্গে এই পত্রিকা যুক্তিবিচার, তর্কতদন্ত এবং তরুণদের উদ্ভাবনাময় দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করবে। সবকিছুর ওপরে নিয়মিতভাবে এবং উন্নতমানে প্রতিমাসে উত্তরাধিকার প্রকাশ করাই আমাদের অঙ্গীকার। এ বিষয়ে আমরা লেখক-পাঠক-বিজ্ঞাপনদাতা, সংস্কৃতিকর্মী এবং মননজীবীদের সাহায্য ও সহায়তা প্রত্যাশা করি।

বর্তমান সংখ্যায় নানা স্বাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির লেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে দ্বিশত বার্ষিক আলোকপাতের কেন্দ্রে এসেছেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। এবং মৃত্যুবার্ষিকী মাসের কারণে রবীন্দ্রনাথ।

হে অমর আগুনপাখি

সৈয়দ শামসুল হক

আমাদের এক নয়, অনেক জীবন।
মাঝে মাঝে মনে হয় সংখ্যা নয়, সংখ্যার বিভ্রম–
তবে একটিই জীবন ! বিপরীত বিরুদ্ধ কি নয় তারা ?
ভাস্কর্যের গ্যালারিতে দর্শকের ভিড়। স্ফুলিঙ্গের মতো ওড়ে কথা।
'আরে, দ্যাখো, পাথর জীবন্ত হয়ে উঠেছে কেমন !'
'আবার কখনো এই জীবন্ত মানুষই কিন্তু পাথরের প্রায়।'
রঁদা তো কবেই মৃত, মানুষ ও মানুষীর অমর চুম্বন তাঁর স্পন্দিত পাথরে।
চিন্তিত মানব তার বিশ্বভার নিয়ে নগ্ন বসে।
পাথরেও তবে কি সম্ভব ? শুধু এক কঠিন হাতুড়ি আর ধারালো ছেনির
প্রতীক্ষাই তবে পাথরের ? আমারই কি ভেতরে পাথর ?
আমার প্রান্তর মরু, অরণ্যের বৃক্ষছায়া, পর্বতের চূড়া–এখানেই,
এখানে প্রবাসে ধ্যানে মগ্ন হতে চাই, প্রশ্নের উত্তর চাই,
কিন্তু শীত ! শীতের কামড়। হাড়ে মৃত্যুর বাতাস।

এখন অনেক রাত । লন্ডনে শীতের রাত । সারারাত নিষ্ঠুর শিশির ।
এখনো দুপুরে দেখি পার্কের বীথিতে
মেপলের পাতা থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে শিশির !
একা বসে আছি পার্কে, মরচে পড়া লোহার হেলনা বেঞ্চে, দেশ থেকে দূরে ।
বহু দূরে ! প্রবাসেও ব্যক্তি শুধু নয় তার দেশটিও আসে ।
কখনো কি পিছু ছাড়ে দেশ, ভাষা, শ্রাবণের মেঘ কিংবা মাঘের শিশির ?
দূর-নৈকট্যের চোখে দেখি লোক জগিং করছে ।
দৌড়ে যে চলেছে ওরা, আগুন লেগেছে যেন জামায় অথবা
হঠাৎ রঙিন তাঁবু, সেখানে ম্যাজিক হবে, তারা তাই ভীষণ ছুটছে,
যেন ডাক ঝাঁপতালে কনসার্ট দিচ্ছে ।
পিঙ্গল নয়না ওই মেয়েরা ছুটছে, বার্ধক্যেও তরুণ বৃদ্ধেরা,
ঘোর গতি চাকায় চাকায় ওই শিশুদের প্যারাম্বুলেটারে ।
পার্কের সবুজ । ভেজা ভেজা । আকাশ ধূসর । হুইসিল পাতাল ট্রেনের–
ঘোর লাগে দৃশ্যপটে । ম্যাজিক, ম্যাজিক ! ঝাঁপতালে কনসার্ট ।
তারপর, নীরব- নীরব সব হয়ে যায়
আর দৃশ্যগুলো– এই ঘাস, এই যে, মানুষগুলো মুছে যায়,
কালক্রম যেন তার দীর্ঘ শাদা হাত দিয়ে মুছে ফেলে শ্লেটের লিখন ।
ফুটে ওঠে কমল কানন– করোটিতে
কবিতা লেখার খোলা খাতার পৃষ্ঠায়–
প্রবাসে কোলের পরে স্বদেশের মাতৃভাষা থাকে অপেক্ষায়,
একটু দোলায় দুলে উঠবে সে, কথা কয়ে উঠবে সে– আমি অপেক্ষায় ।

দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে অপেক্ষার কাল ।
মেঘের আড়ালে সূর্য চলে যায় । তীব্রতর হতে থাকে শীত ।
কনকনে হাওয়া ওঠে । সময় শিউরে ওঠে । হঠাৎ পার্কের লোক ফাঁকা হয়ে যায় ।
চুল্লির আগুনে দেহ সেকে নিতে তারা
দ্রুতপায়ে যে যার গুহায় ছোটে, শুধু
আমি বসে থাকি– একা বসে থাকি আমি– তখনো শীতের পার্কে–
যেমন থেকেছি আমি রক্তমাখা সকল সবুজে–
যেমন থেকেছি আমি– একটি জীবন আমি যেমন দেখেছি
তুন্দ্রার বরফে সব ঢেকে যেতে স্বদেশের উষ্ণ মণ্ডলেই–
কত কাল কাটিয়েছি কত স্বৈরশাসকের বুটের তলায়,
চাবুকের প্রহারে প্রহারে আমি কুঁকড়ে গেছি, পউষের শীতেও কি আমি
রৌদ্রের প্রার্থনা নিয়ে দাঁড়াই নি জানাজার মৃতা মাঠ ব্যপ্ত হাহাকারে ?
কতবার–কতবার । কবিতার কাছে আমি নগ্ন নতজানু হয়ে কতবার
প্রার্থনা করেছি, 'দাও শব্দ, দাও বাক্য, ধ্বনিতে চূর্ণিত করো সময় –পাথর ।'
রৌদ্র তো সত্যই ফুটে উঠেছিল সেই দীর্ঘ রাত সেই শীতের কামড়

সহনের–সহনের –দীর্ঘ অতিবাহনের পরে ।
কিন্তু কেন এখনও পাথর ?
কেন আমি শীতের ভেতরে আজও ? আমার সময়
কেন আজও রক্তাক্ত চরণ থেকে রক্ত তার এখনও মোছে নি ?
এখনও নতুন কাঁটা কেন ধরে ওঠে পদ্মনাল প্রতি বাংলার দিঘিতে ?
চম্পকের মতো তার আঙুল এখনো যদি রয়েচে বীণায়,
দেবী কেন নির্বিকার, আঙুল পাথর তার, কেন দেবী সংগীত করে না ?

প্রশ্নের তাপিত সিঁড়ি । উত্তরের হাওয়া কনকনে ।
রাতের গভীর ঘন স্তব্ধতার সোপানে পৃথিবী ।
এ কথা বলতেই হয়– আমাদের এক নয়, অনেক জীবন ।
আরো সত্য, আমাদের এক নয়, অনেক ভুবন ।
অনেক ভুবন আর অনেক সমুদ্র নদী মরুভূমি পাহাড় প্রান্তর ।
উত্থান পতন আর আবার উত্থান,
নিমজ্জন শেষে জাগরণ– এই তবে চক্রের স্বরূপ ।
কর্দমের পরেই প্রস্তর, ক্ষয়া মোম পরেই মশাল ।
বর্তমান অতীতে গড়ায় কিন্তু থেকে যায় ভবিষ্যত চির ভবিষ্যতে ।
দৃষ্টি চাই । তুমুল তৃষ্ণাও চাই । শোষণে শোষণে বিষ কণ্ঠে নিতে হলে,
প্রয়োজন হয় বটে এক নয় অনেক জীবন ।
সিনেমার কাউন্টারে রক্তশূন্য হাত পেতে দেয় বসনিয়া–
মুছে যায় দৃশ্যপট মুহূর্তেই, প্রসারিত হয়ে থাকে হাত –
একটি পয়সার জন্যে–যুবতীর প্রসারিত হাত–যেন গোর থেকে–
ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে– 'করুণা করুন । পেতে চাই আবার জীবন ।'
এত ধ্বস্ত এত ছিন্ন এত রক্তমাখা যে জীবন তার– বিস্ময়! বিস্ময় ! দেখি
সেই তার শতচ্ছিন্ন কামিজে ছাপার ফুল এখনো অটুট ।
একে কি ম্যাজিক বলা যেতে পারে ? ইতিহাস কী ইন্দ্রজালিক !

ঘরে ফিরে আসি, প্রবাসের ছোট্ট ঘর, যেন বন্য দাঁতালের তাড়া
খেয়ে গুহায় সেঁধোই । আলো জ্বালি । চুঁয়ে পড়ে দেয়ালের নীল ।
বিছানার চাদরেও নীল । অকস্মাৎ ভূমধ্যসাগর ।
লেপে আঁকা ড্যাফোডিল । এখানেও ফুল !
ঘোর লাগে চোখে । বাতি জ্বালি । জানালার পর্দা টেনে দিই ।
পর্দার মেরুন রঙ! টাল খেয়ে পড়ে যাই বিছানায় ।
রক্তলাল ছিল একাত্তর ! এখানেও!
ব্যক্তি নয়, অধিকন্তু দেশ, দেশ ব্যক্তির সঙ্গেই যায় প্রতিটি প্রবাসে ।
স্মৃতিকে কে ফেলে আসতে পারে ?
আমার পশ্চাৎপটে ঋতুচক্র ঘুরে চলে–ম্যাজিক ! ম্যাজিক !

তুষারের বৃষ্টি এই, এই পড়ে রোদের ঝলক।
এই পত্রহীন গাছ, এই ভরে উঠলো পল্লবে, দুটি কাক উড়ে গেলো–
আরে সে কোত্থেকে ? ওরা বাংলাদেশ থেকে !

জানালার ওপারে প্রান্তর, ঘাস, ফুল। মাঝে মাঝে কবিতার খাতা ফেলে
অনেক দেখেছি আমি পাখিদের ঘাসে নেমে আসা।
অনেক দেখেছি ওই পাখিদের, পাঠচক্রে যেন ওরা বিদ্যার্থী সকল।
নিবিষ্ট চঞ্চুতে ওরা খুঁটে খুঁটে চলেছে সবুজ– আমি অনেক দেখেছি।
ভেবেছি কী খোঁজে ওরা ? খাদ্য বীজ এখানে কোথায় ?
কিন্তু ওরা খুঁজে পায়। সবুজের ঘ্রাণ বুঝে ঘাসবীজ ঠিকই খুঁজে পায়।
কিন্তু বীজ কোথায় ভাষার ?
ভাষা আজ বাক্যবন্ধ ভুলেছে যে শুধু তাই নয়।
ব্যবহারও ভুলেছে সে শব্দ সকলের
অথচ সময় ছিল, কবিতার খাতা হাতে আমার সময়–যুবনাশ্বের সময়।
সে ছিল অশ্বের বর্ষ– ঘোড়ার সময়।
একটি সফেদ ঘোড়া একদিন এসে মাঠে স্থির হয়েছিল।
পা দুটি তখনো তার সমুখের দিকে উত্তোলিত,
দুরন্ত যাত্রায় উড়ে কোথা থেকে এসে যেন এখানে সে স্থির–
নাকি, আমারই ভাস্কর্য ওটি– ওই ঘোড়া–সৃজনের তুমুল তাড়ায় ?
প্রশ্ন পরে কত প্রশ্ন। নদীজল মেপে চলি। মধ্যরাতে আজও
প্রত্যহ গভীর শোকে জেগে উঠি ঘোর ঘুম থেকে,

একহাতে উৎকণ্ঠা লাগাম, অন্যহাতে মুছে চলা দু' চোখের অশ্রু অবিরল।
বহুদূর প্রবাসে যদিও আমি, স্বদেশের ডাক ভেঙে ওঠে।
পুনরায় জন্ম নিতে চাই আমি, স্নান পেতে চাই আমি বাংলার নদীতে।
কিন্তু এ প্রবাসে এ কোন্ হঠাৎ নদী? কার শংখনাদ?
অকস্মাৎ এ কোন্ উত্তাল জল চেতনার কিনারে কিনারে ?
কারবালার মাঠে যেন ফোরাতের শব্দ ছলচ্ছল
কিন্তু ঘোর পিপাসায় ফেটে যাচ্ছে ছাতি–
নদীতীরে শত্রুদল, উদ্যত ধনুক তীর, মাথার ওপরে সূর্য,
তরল তামার মতো গনগনে রোদ আর শিবিরে ক্রন্দন।
সেখানে নিজেকে আমি একবার দেখে উঠি, পরমুহূর্তেই
ভীষণ উৎক্ষীপ্ত হয়ে পড়ে যাই দাবানলে দগ্ধ এক নগরীর বুকে।

ভস্ম মেখে হেঁটে যাই হ্রদের কিনারে, সেখানে জলের বুকে
প্রতিবিম্বে মুখ দেখে ভীত হয়ে উঠি অকস্মাৎ।
এই কি সে ব্যক্তি আর এই কি সে মুখ–
মাতা যাকে একদিন জন্ম দিয়েছিল ? –

বাংলার গহীন গ্রামে, রমজানের রাতে ?
সেই রাতে যে-রাতে পৃথিবী বৃক্ষ বাড়িঘর গ্রাম

নদী ফুল মাছ পাখি–একটি পলক মাত্র–সেজদায় যায় ।
এই কি সে ? এই জন ? এই ব্যক্তি ? এই তার মুখ?
একটি কি দুটি পাখি প্রান্তরের ঘাসে । আর ঘাসে
পদচ্ছাপ উধাও ঘোড়ার । কিন্তু তাও নয় । ওই দেখি
ঘাসে অশ্বখুর চিহ্নগুলো পড়ে আছে অর্ধবৃত্তের আকারে ।
একদিন দরোজার কাঠের হাতল ওই খুরচিহ্নের আকারে
ঘুরে যায়–মনে পড়ে যায়–মনে পড়ে যায় সব–
ওপারেই দেবী তার বীণাখানি নিয়ে ।
পদ্মবনে একটিই ফুল, সেই ফুলে রাখা ছিল
একটি চরণ তার রাঙা লাল আলতায় । বাতাসেও ঘ্রাণ ছিল ঘন ।
নন্দন কানন থেকে চন্দনের ঘ্রাণ ।
ছিল স্বপ্নের ভেতরে দুটি ভ্রমরের পাখা ।
আর ছিল গ্রামের গভীর থেকে তীব্র হুইসিল– রাতের ট্রেনের ।
কিন্তু লাল সিগনাল!
সবুজ করতে কি তাকে ভুলে গেছে সিগনালম্যান ।
দরজার হাতল ঘুরেছে, দরজাও খুলে গেছে, কিন্তু যাব কি ভেতরে ?
নাকি, এই আমাকেই ছুটে যেতে হবে রেললাইনের ধারে ?
শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে হাতল ঘোরাতে হবে আরেক হাতল ?
তবেই সিগনাল হবে সবুজ সংকেত, আর তবেই এ ট্রেন
অবাধ ছুটবে, ট্রেন পৃথিবীর বুক চিরে পৌছুবে স্টেশানে ।

আমাদের এক নয়, অনেক জীবন ।
অনেক জীবন আর এক নয় অনেক জননী
প্রতিটি বেদনা শোক বঞ্চনা আঘাত আমাকেই হত্যা করে,
জন্ম দেয় ফিরে ফিরে নতুন আমাকে ।
আমি নিতান্ত বালক । আমি প্রাকৃত ভাষার লোক । মানদণ্ড হাতে নেই ।
আমি এক অবোধ বিজন জন, মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়েই
নগ্ন রোদে অন্ধ হয়ে যাই । জন্মান্ধ হয়েই যেন জন্ম নিই আমি–
যেমন আমার পূর্বে বহুজন যুগে যুগে জন্ম নিয়েছিল
যখন তস্কর এসে রাজদণ্ড কেড়ে নেয়,
যখন নৈরাজ্যে ভেঙে যেতে যেতে রাষ্ট্রদেশ কারবালায় পৌছোয় ।

আমি ঘোর পউষের । পউষে আমার জন্ম, উত্তরের হিমালয় শীতে
কুঁকড়ে যাওয়া মাংসপিণ্ড , গর্ভকাল পূর্ণ হয়ে ওঠার আগেই,
বন্যায় উন্মত্ত এক নদীর কিনারে ।
এতটুকু শক্তি ছিল না যে জননীর স্তন টানি । স্তন দেয় মাটিই আমাকে ।
যাঁতায় যাঁতায় পিষ্ট শস্যদানা আর ইক্ষু শর্করার তরলে বর্ধিত হই ।
পৃথিবীর দুগ্ধপোষ্য আমরা সবাই ।
ভাষা শিখি পাখির পাখার শব্দে,
ছন্দ শিখি চন্দ্রকলা থেকে,
দেখি বিশ্বযুদ্ধের কনভয় পার হয়ে যায় গ্রাম্যপথ দিয়ে,
পিষে যায় ঘাসের সবুজ, ছিঁড়ে নিয়ে যায় নিসর্গ আমার ।
যুদ্ধ আর অনাহার করাতের মতো কাটে বিশ্বাসের কাঠ–
আজও কেটে চলে– আমার সময়গুলো
স্বদেশের নদীতীর থেকে এই তুন্দ্রার নিকটবর্তী প্রবাসের ঘরে ।
তবে ওই কাঠ থেকে গড়ে তোলো আসবাব র‍্যাদায় তুর্পুণে–
পূর্বগতগণ থেকে এমন মন্ত্রণা পেয়ে আজও আমি নিরত নির্মাণে–
ঘোড়া, তার পদচ্ছাপ, ছুটে আসা ট্রেন, ঘাস, নদীর কিনার,
জনপদে মানুষের সংসার ও সরাই, সুরা জীবনের দ্রাক্ষার পেষণে ।
এই দৃশ্যগুলো সরিয়ে নাও হে ।
এই চিত্রকল্পগুলো পুড়িয়ে দাও হে ।
কেটে দাও এইসব বাক্যগুলো ওহে
ভালো করে বুঝে নাও বলছে কী এইসব, লিখো তারপরে ।
আমি কত কিছুই বুঝি নি ।
যেন এটি চলচ্চিত্র ছিল, ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়েছিল,
কিন্তু রীল পড়ে ছিল সম্পাদনাহীন এক অন্ধকার স্টুডিওর ঘরে ।

মাঝে মাঝে কৌতূহল হতো– কী ছবি ? কী ছবি ? তাই চালিয়ে দেখেছি–
শটগুলো স্বরাট, স্বাধীন, তারা পারম্পর্য এখনো পায় নি ।
এই দেখি ফুল, এই মলভাণ্ড এসে পর্দায় ফলিত হলো,
এই ছিল নদী, এই শিরা থেকে লাল রক্ত প্রবাহিত হলো ।
সুটকেস থেকে নীল আকাশ বেরুলো,
পরক্ষণে বৈশাখের ঘন কালো মেঘ ।
এই ছিল গান ,এই তানপুরা বিস্ফোরিত হলো, লাশ পড়ে গেলো মাঠে ।
এই ট্রেন ছুটে যাচ্ছে–এই ঘোড়া গর্তে পড়ে যায়, তার মরণ–হ্রেষায়
ফসলের মাঠে অগ্নি ধরে যাচ্ছে দাউ দাউ করে ।
পারম্পর্য চাই চলচ্চিত্রে দুই বিপরীত শটে–মননের সৃপ্রাইসাবে
এমত জোড়ন চাই যেন এক শট পরে দ্বিতীয় যে শট
দুই মিলে তৃতীয় মাত্রাটি পায়, চলচ্চিত্র হতে পারে তবে ।
আর, ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরবর্ণটিও চাই–
তবে উচ্চারণ হবে, তবে তো অক্ষর পাবে দাঁড়াবার ভিত ।

শব্দ পরে শব্দ গাঁথুনির দৃষ্টির আলোটি চাই,
তবে তো সাক্ষাত তুমি পাবে কবিতার,
শব্দে শব্দে তবেই ফলিত হবে সময়ের আলো আর অন্ধকারও বটে।
এ বিদ্যা সহজ নয় করতলে পাওয়া।
বস্তুত যা পাই সবই শুধু শ্রুত কথা !
পরস্ব শব্দের ধনে উত্তরাধিকার–এর বেশি এতটুকু নয়।
এর বেশি অধিকাংশ মানুষ চায় না। সামান্যেই খুশি থাকে–
মেনে নেয়, ভেঙে পড়ে, প্রশ্ন কিংবা প্রতিবাদ, ভাঙনের বিরুদ্ধে নির্মাণ
অধরাই থেকে যায়, আবিল নদীর বুকে নৌকো ডুবে যায়।
এই চিত্রনাট্য থেকে বুঝি চলচ্চিত্র হতে পারে– যা পাবে অস্কার?
সত্যজিৎ সকলেই নয়। অথবা ঋত্বিক।
শব্দ আর বাক্য তো অপেক্ষা করে– কিন্তু কতজন
চিত্র আর রূপকল্প আবিষ্কার করতে হে? তুমি তো অদ্ভুত !

আবার দাঁড়াও এসে, তাহলে দাঁড়াও,
শীতের প্রবাস ভেঙে মেধাবী নদীর এই জল সীমানায়–এখনো অবেলা নয়,
এখনো সম্পন্ন সব হতে পারে যদি তুমি সবুজ জামায়
আবার শোভিত হও, আবার নিজেকে যদি আয়নায় দেখে নিতে পারো।
ভোরে উঠে শেভ করে নিও–সৃজন তো পরিচ্ছন্নতা চায়–
মেখে নিও সবুজ ঘাসের ঘ্রাণ আফটার শেভ।
পকেটেও টাকা নিতে ভুলো না হে ! তোমার সেদিন নেই যেদিন তোমার
অনাহারে দিন যেত– পা দুটি বাহন ছিল বিনামূল্যে শহর চষার।
পথে খরচা আজকাল খুব। রেস্তোরাঁরও দাম খুব চড়া।
শহরও এখন বড়– ট্রাফিকের ভয়াবহ জ্যাম–ছিনতাইকারী ও পকেটমারে
ফুটপাথ থৈ থৈ, নিরাপদে চলা দায়– স্বপ্নেরও ছিনতাইকারী এখন অনেক,
বিশ্বাসে তোমার বুক স্ফীত দেখে অনেক পকেটমার এখন সড়কে।
অতএব আজ সাবধান ! পকেটে কলম নিও, কবিতার খাতাটিও থাকা চাই।
আগেকার মতো সেই বাতিল কাগজে কিংবা খামের ওপরে
দ্রুত হাতে কবিতার পঙক্তি লিখে রাখা–সেটি আর নয়–ওটি চলবে না।
কারণ তুমি তো জানো, সহজেই ওসব কাগজ উড়ে যায়,
দেরাজে রাখলে সেও দেরাজেই নিশ্চিত হারায়– বহুবার হারিয়েছে–
তদুপরি, তোমার কাগজ ছিন্ন করবার জন্যে ওঁৎ পেতে
আছে ঘোর দুঃশীল সময়।
রাষ্ট্রের ক্ষমতা যদি কেড়ে নেয় বিরুদ্ধ মানুষ,
নষ্টের ছুরিতে তবে কাব্য কেন– রাষ্ট্রেরই পাল ছিন্ন হতে কতক্ষণ?
লিখেছো যা সেদিন যৌবনে– আজও সেই লেখা,
আজও সেই প্রেম, আস্থা, মানবতা, প্রতিরোধ, পূর্বাচলের প্রথম কিরণ
অক্ষরে অক্ষরে আজও ধরে রাখছো যে, আজ আরও একটি বিষয়–
তোমাকে লিখতে হয় রাষ্ট্রের স্বপ্নের ঘরে ডাকাতিরও কথা–
হয়তো সেটাই মুখ্য, হয়তো বা এরই চাপে তুমি ভুলেছো তোমার প্রেম,
ব্যক্তিগত জানালার নীল পর্দা, নিজস্ব নদীটি।
কেননা এ সময় এমন
মোহরের চেয়ে বেশি দাম হাঁকে পেতলের বোতাম যখন।

এখন বয়স কিছু হয়েছে তো–কিছুটাতো আলুথালু চলা !
মোড় পার হবে সাবধানে !
তারচেয়ে বেশি সাবধান– কোথায় গ্রেনেড হাতে জঙ্গী কোন মৌলবাদী!
যৌবনে যে গুলিস্তানে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত কাটিয়েছো,
সেখানেই যেতে যদি ইচ্ছে করে পরবাসে নস্টালজিয়ায়–
তবে তুমি মনে মনে একবার হেঁটে যেয়ো সেই পাশ দিয়ে
যেখানে আইভি লাশ হয়ে যান, নিথর নীরব তাঁর হয়ে যায় যেখানে শ্লোগান।
সেদিন এ এভেন্যুয়ে আরও লাশ অনেকেই হন,
কিন্তু কি দৈবের হাত, রক্ষা পান গ্রেনেডের লক্ষ্য গণতন্ত্রের হাসিনা
বস্তুত সেদিন– রক্ষা পায়– ব্যক্তি নয় গণতন্ত্র– রক্ষা করে ইতিহাস–
ইতিহাসই স্বয়ং সেদিন। তিরিশ লক্ষের রক্ত, জনকের লাল রক্ত,
বৃথা তো যাবার নয়। ইতিহাস কত আর মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে পারে ?
যথেষ্ট কি হয় নি ক্ষরণ ? কত হবে কারবালা ? কুরুক্ষেত্র ?
কত আর লাল হবে শহীদের রক্ত মেখে সন্ধ্যার আকাশ ?
অকস্মাৎ পদশব্দ। মিছিল নেমেছে। বাইরে বেরোই। এ কী!
শ্লোগানে অভ্যস্ত আমি, মানুষের উচ্চকণ্ঠে চিরে যেতে দেখেছি আকাশ,
সিংহাসনও পড়ে যেতে দেখেছি স্বদেশে আমি জনতার গর্জনে হর্জনে।
কিন্তু এখানে মিছিল এটি সম্পূর্ণ নীরব।
মাথার ওপরে নেই সূর্য গনগনে,পায়ে পায়ে নেই গতি একরোখা,
দরদর করে পড়া ঘাম নেই, রোদে পুড়ে কারো মুখ হয় নি তামাটে।

এখানে আকাশে এই দুপুরেই উঠে বসে আছে শাদা পাতলা চাঁদ
ফিকে দুধে সর যেন ভেসে আছে ঠাণ্ডা নীল দুধে।
এখানে মেপল থেকে ঝরে যাচ্ছে পাতা,
এখানে মেপল তার কঙ্কাল আঙুল তুলে নীরবেই চিরছে আকাশ।
পোস্টারে প্লাকার্ডে অক্ষরের বন্যা শুধু বহে যাচ্ছে– শব্দহীন,
যেনবা নির্বাক এক চলচ্চিত্র– দূর অতীতের।
কিন্তু এ ইরাক যুদ্ধ একালেরই।
আর সেই আগ্রাসী যুদ্ধের প্রতিবাদি এই ভিন্ন মহাদেশে
লন্ডনে মিছিল। মিছিলের তরুণী ও তরুণের মুখ–

শীতে লাল। গ্রীবা মাফলারে ঢাকা, মাথা পুরু পশমি টুপিতে।
এমন কি সেই যে বিখ্যাত টুপি চে গুয়েভারার–
কারো কারো মাথায় সেটিও, সোনালি চুলের গুচ্ছ উপচে পড়েছে।
এরা কি দেখেছে যুদ্ধ ? জেনেছে কি আগ্রাসন সাম্রাজ্যবাদের?
লিখেছে কি রক্ত দিয়ে মুক্তির যুদ্ধের কথা যেমন বাংলায়,
ভিয়েৎনামে, কোরিয়ায়, এশিয়ায়? আফ্রিকায়? দেখেছে?দেখেছে?
শরণার্থী যুবতীর মলিন কামিজে তারা দেখেনি কি ফুল?
নিশ্চয় দেখেছে তারা । নিপুণ প্রযুক্তি আজ টেলিভিশনের–
তাজা তথ্য তাজা চিত্র মুহূর্তেই পৌঁছে দেয় দূরতম বিন্দুসম সাগরের দ্বীপে।

মানুষের সঙ্গে আজ মানুষের দূরত্ব অমোচ্য নয়, তাই
রক্ত যদি এক প্রান্তে বহে যায়, আর-প্রান্ত সেই রক্তে ভাসে।
রক্ত যে ঝরায় তার স্বদেশেরও মানুষের হাত রক্ত মাখা হয়ে যায়।
জমে ওঠে সান্ধ্য পানশালা আজ লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায়।
বিয়ারের ফেনা উথলে পড়ে। 'আহা, আস্তে ঢালো!'
এরই মধ্যে কেউ কেউ মাতাল হয়েছে।
হঠাৎ দাঁড়িয়ে কেউ মাগ তুলে ধরে বিয়ারের, বিজড়িত কণ্ঠে তার–
'চিয়ার্স! শুনেছো নাকি মার্কিন সৈনিক এক আত্মহত্যা করেছে ইরাকে।'
নিঃশব্দে মিছিল পার হয়ে যায় পানশালা,
গির্জার পাথর চূড়া তুলে ধরে রাখে ক্রুশ সন্ধ্যার আকাশে।
রক্তের বিরুদ্ধে যিশু, যিশুর বিরুদ্ধে রক্ত। সন্ধ্যার আকাশ লাল এখানেও হয়।
হোমার বা ব্যাসদেব মহাকাব্য লিখেছেন, যুদ্ধের ভয়াল ছবি এঁকেছেন–
কই, যুদ্ধ কি থেমেছে? আজও জন্ম নিচ্ছে হিটলার। জন্ম কি থেমেছে?
সেলাইয়ের কলে উর্দি সেলাই থেমেছে?
থেমেছে কি রাজ্যলোভ, স্বর্ণলোভ, নারীলোভ, রক্তের পিপাসা?

কত না মিছিলে গেছো, কত না মিছিলে তুমি দিয়েছো শ্লোগান।
পাশে এই সত্যটুকু–তাও লিখে রেখো:
এমন সময় গেছে, নিহত জাতির পিতা–মানুষ উধাও, ভীত, নামে নি মিছিলে।
চার নেতা কারাগারে হত–কিন্তু দেখো নি মিছিল।
রাষ্ট্রকে ধর্মের টুপি পরানো হয়েছে, কিন্তু লোক নির্বিকার,
মুক্তিযুদ্ধের শপথ, যুদ্ধ করা জাতি তার যুদ্ধ ভুলে প্রত্যহের রুটিই সেঁকেছে।
ভোটে নয়, নির্বাচনে নয়, কবি নিজেই নির্বাচন করে নেন,
কবি সেই জনপ্রতিনিধি যাঁর আসনটি মাত্র পাঁচ বছরের নয়–
বরং সমগ্রকাল– যতদিন তিনি আয়ুষ্মান–কেউ কেউ মৃত্যুর পরেও।
সময়ের কণ্ঠ তিনি, উত্থানের বাহু, নির্মাণের নকশা তাঁর,
আসন্ন নষ্টের কালে পতনেরও পূর্বাভাষ তাঁরই।
আমাদের এক নয় অনেক জীবন।

রাত নেমে আসে শীত দেশে, দৃশ্য মুছে গেছে কুয়াশায়,
তুন্দ্রার ভল্লুক তার মুখ ঘষে চলে জানালায়, গরগর করে রাগে,
মড়মড় করে ওঠে শুকনো কাঠ চুল্লির আগুনে,
সেঁকে নাও হাত, তুমি বরফের কাফন সরিয়ে
আবার ঘাসের মাঠ, শীতছিন্ন গ্রীষ্মদেশ প্রকাশিত করো।
ওই তো রঙিন তাঁবু! ওই দ্যাখো লাল নীল রিবন উড়ছে–
আজ থেকে শুরু হোক ম্যাজিকের নতুন পর্যায়–
বোমার আগুনটিকে লুফে নাও, বরফে ধরিয়ে দাও, গলুক বরফ।
তারপর ক্ষিপ্রহাতে আগুনের বলটিকে চোখের পলকে
পারাবত করে দাও– পিকাসোর।
আকাশে উড়িয়ে দাও উড়তে থাকুক।
ব্রাউন পেপারে ওই জয়নুলের কালো ব্রাশে আঁকা সানকিতে
অন্ন এনে দাও, হাড়ে স্বাস্থ্য এনে দাও, মন্ত্র দাও ব্রাত্যজনে,
বালিগ্রাস থেকে নৌকোটিকে তুলে আনো,
তার গলুই গ্রীবায় চোখ এঁকে দাও, বৈঠা করো তোমার অস্থিকে।
চলচ্চিত্র সম্পাদনা করো, শটগুলো পড়ে আছে বহুকাল,
জোড়া দাও, অর্থের মাত্রায় তাকে জুড়ে দাও মেধাবী আঠায়।
নির্বাক মিছিলে তুমি যুক্ত করো ধ্বনি।
সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে, প্রস্তর ভাঙার চাপে, মানুষের পদচারণায়
কালচক্রের ঘূর্ণনে তানে মন্দ্রে তালে গড়ে ওঠে যে সংগীত
তাকে জুড়ে দাও চিত্রে। মানবের ধ্বনি থেকে ছন্দের দ্যোতনা নাও
অক্ষরে অক্ষরে শব্দ গড়ে তোলো, শব্দ পরে শব্দ লেখো–
যেন প্রতি দুটি শব্দ পরস্পরে দ্যুতি পাত করে,
মিছিলের মতো যেন কবিতার স্বর অগ্রসর হতে থাকে।
অনির্বাণ মানব-শিখায় তুমি প্রকাশিত হও।
অনন্তের পাখির ডানায় উড়ে চলো।
ধূপগন্ধে শুদ্ধ হও, প্রণত-প্রণত হও
চিত্রময় ধ্বনিময় সংগীতে উত্তল মহাবিশ্বে তুমি অমর সন্তান–
তুমি কবি, তুমি সুরস্রষ্টা, তুমি চলচ্চিত্রকার,
তুমি রাজনীতিবিদ, তুমি কালের পটুয়া,
ভস্ম থেকে বারবার জন্ম নেয়া তুমি তো আগুনপাখি,
মরাখাতে বিপুল বিশাল স্রোত বহাবার ভগীরথ তুমিই পুরানে॥

খসড়া : ১৫ ই অক্টোবর ২০০৬, লন্ডন
পরিমার্জনা : ২৯শে জুন ২০০৯, ঢাকা

দ্বিশতবর্ষের আলোকে নব্যবাংলার দীক্ষাগুরু ডিরোজিও

শান্তনু কায়সার

এ বছর, ২০০৯-এর ১৮ই এপ্রিল হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ ১৮০৯-এর ঐ তারিখে তাঁর জন্ম হয়েছে কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডের শহরতলির দোতলা বাড়িতে। সেন্ট জন'স ওল্ড ক্যাথিড্রালে ঐ বছরের ১২ই আগস্ট তিনি ব্যাপটাইজ্‌ড হন। ডিরোজিওরা চার পুরুষ ধরে কলকাতার বাসিন্দা হলেও আগমনসূত্রে বা জাতিগত পরিচয়ে তাঁরা অবশ্য এদেশীয় নন। ডিরোজিওর পূর্বপুরুষরা এসেছেন ইউরোপ, আরও স্পষ্ট করে বললে লুসিটানিয়া বা পর্তুগাল থেকে। ডিরোজিওর পিতামহ মাইকেল ডিরোজিওর জন্ম ১৭৪২-এর ২২শে আগস্ট, পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিওর ১৭৭৯-র ৭ই সেপ্টেম্বর। তাঁর প্রথম স্ত্রী সোফি-সার গর্ভে জন্ম হেনরি ডিরোজিও-র। ১৮৩১-এর ২৬শে ডিসেম্বর কলেরায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র ২২ বছর ৮ মাস ৮ দিন। অকালপ্রয়াত এই ব্যক্তি ভারতবর্ষে তাঁর এমন স্থায়ী পদচিহ্ন রেখে গিয়েছেন যে, দ্বিশতবর্ষে বিস্মৃত হওয়ার পরিবর্তে তিনি বরং উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছেন।

ডিরোজিও তাঁর জীবনে মৃত্যুর মিছিল প্রত্যক্ষ করেছেন। ছ বছর বয়সে মা মারা যান, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফ্রান্সিস ও কনিষ্ঠ বোন সোফিয়া মারা যান তাঁর জীবদ্দশায়। অন্য বোন এমিলিয়া ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্লডিয়াসের মৃত্যু তাঁর প্রয়াণের কয়েক বছরের

মধ্যেই। অবাক হওয়ার ব্যাপার, স্বল্পায়ু হলেও ভাই-বোনদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দীর্ঘজীবী। এলিয়ট ওয়াল্টার মেজ (Madge) তাঁর যে জীবনী লিখেছেন তাতে 'দ্য ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন' উদ্ধৃত করে ডিরোজিওর যে বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে তাতে তাঁর স্মিতহাস্য ও প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। 'He was an affectionate son, a kind brother and a warm friend. He was lively and humourous. We confidently state that anger was never seen to cloud his brow. All was sunshine with him'. কিন্তু মৃত্যুর মাত্র স্বল্পকাল আগে তিনি হিন্দু কলেজ থেকে যেভাবে বিতাড়িত হয়েছেন এবং তারপরেও মানসিক স্থৈর্যে অবিচল থেকে নীতি ও আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় দিয়েছেন তা-ই প্রকৃতপক্ষে ডিরোজিওকে ডিরোজিও করেছে। এবং দ্বিশতবর্ষ পরেও তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

উত্তরকালের কাছে ডিরোজিও কীভাবে মূল্যায়িত হবেন? কবি, অধ্যাপক, সাংবাদিক, তার্কিক, বক্তা, বুদ্ধিজীবী, না এর সবকিছু মিলিয়ে এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব? যে ঘটনা সাধারণত ঘটে, সামাজিক হলে সৃজনশীল হন না অথবা সৃজনশীল হলে সামাজিক, তার এক অসাধারণ ব্যত্যয় ঘটেছে ডিরোজিওর ক্ষেত্রে। তিনি একইসঙ্গে সামাজিক ও সৃজনশীল। এবং উভয় ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক উচ্চতা, সততা ও দৃঢ়তা সত্ত্বেও অত্যন্ত সংবেদনশীল।

এলিয়টের জীবনীতে তাঁকে ইউরোশিয়ান কবি ও সংস্কারক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অ্যাংলো বা ইস্ট ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় বা সমাজ ব্রিটিশদের চোখে অনেকটাই অচ্ছুৎ বলে বিবেচিত হতো। ফলে সম্প্রদায়গতভাবে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন ইস্ট ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং নিজেদের ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যে কলকাতার টাউন হলে নিয়মিত মিটিং করতে থাকেন। ঐ সমাজ বা সম্প্রদায়ের একজন মানুষ হিসেবে তাঁরও নিশ্চয়ই তাতে অংশগ্রহণ ছিল। কিন্তু তা ছিল ন্যূনতম। তাঁর হয়ে ওঠা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি এই মৃত্তিকার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে হয়ে উঠতে চেয়েছেন একজন 'ভারতীয়'। 'The Harp of India' কবিতায় তাঁর ভাবনা থেকে মনে হয়, তিনি ইঙ্গ-ভারতীয় নন, ভারতে বসবাসকারী একজন ইংরেজিভাষী মাত্র। ভারতের নানা জায়গায় বসবাসকারী বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ নানা ভাষাভাষী হয়েও যেমন মূলত ভারতীয় তেমনি তিনিও ছিলেন আসলে তাই। তবে বলাই বাহুল্য, ইংরেজি ভাষায় লিখলে ও ভাবলেও তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সংস্কৃতিরও একজন প্রধান প্রতিনিধি। 'The Fakeer of Jungheera, The Metrical Tale and Other Poems'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতায় যে তিনি বলেছেন–

My country ! In thy day of glory past
A beautious halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou was
Where is that glory, where that reverence now ?

তা পড়ে যেমন কোনো আত্মজনের বেদনা মূর্ত হয় তেমনি নিম্নোধৃত পঙ্‌ক্তিমালা পড়েও মনে হয়, কত ভালোবেসেই না তিনি তাঁর স্বদেশঅন্বেষায় যুক্ত হতে চান–

Well – let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragment of those wrecks sublime.

কবিতায় যেমন তেমনি কর্মেও তিনি তাঁর মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালের রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়, এক্ষেত্রে তিনি কতটা মৃত্তিকা-প্রোথিত ছিলেন। ডিরোজিও যে বলেছেন,

'I was born in India' তার চেয়ে বড় কথা, 'have been loved there.' এদেশে জন্মে তিনি শুধু গর্বই বোধ করেন নি, চেয়েছেন 'to do my best in her service'. স্বল্পায়ু হলেও তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবনকে এই ব্রতে উৎসর্গ করেছেন।

দুই.

ডিরোজিওর একটি সনেটের নাম, 'Sonnet to My Pupils' তার প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :

Expanding, like the petals of young flowers,
I watch the gentle opening of your infant minds,
As the sweet loosening of the smell that binds
Your intellectual energies and powers
That stretch, like young birds in soft summer hours,
Their wings, to try their strength.

শিক্ষার্থীদের তিনি এভাবে বিকশিত হতে সাহায্য করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ যথার্থই বলেছেন, 'চুম্বকে যেমন লৌহকে টানে' 'হিন্দু কলেজে পদার্পণ করিয়া' ডিরোজিও ' সেইরূপ কলেজের প্রথম চারি শ্রেণীর বালক'কে 'আকৃষ্ট করিয়া লইলেন।' 'এরূপ অদ্ভুত আকর্ষণ, শিক্ষক-ছাত্রে এরূপ অদ্ভুত সম্বন্ধ কেহ কখনও দেখে নাই।'

এ থেকে গুণমুগ্ধতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, ডিরোজিও প্রকৃতপক্ষে তার অবসান চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন তাঁর

শত্রুনিধনের জন্যে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কিছু খোঁড়া কিন্তু মুখরোচক অজুহাত বেছে নিয়েছিল। কোনো সত্যিকার ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই তারা আত্মমর্যাদাশীল ডিরোজিওকে 'হত্যা' করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মারি অরি পারি প্রকারের সেই যুদ্ধে তারা তখন 'জিতে'ও গিয়েছিলেন। কিন্তু কলেরায় আক্রান্ত শিক্ষককে যে সংখ্যক শিক্ষার্থী শুশ্রূষা করেছিলেন, তার উত্তরকালে অনেকগুণ অদেখা ও অচেনা শিক্ষার্থী তাঁকে তাঁর নীতির কারণে ভালোবেসেছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন

শিক্ষার্থীরা যেন 'ক্রিটিক্যাল ম্যান'-এ পরিণত হয়, তাদের মধ্যে যেন সেই বিশ্লেষণী ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে যাতে তারা সকল কিছুকে মোহমুক্ত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে ও বুঝতে সমর্থ হয়। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, তারা যুক্তির যান্ত্রিক অনুসারী হবে এবং তাদের মধ্যে অনুভূতি, আবেগ অথবা সংবেদনশীলতার কোনো জায়গা থাকবে না। তৎকালে প্রচলিত সতীদাহ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ সম্পর্কে বোঝা যেতে পারে। তাঁর একটি কবিতার নাম 'On the Abolition of Satee.' সেখানে তিনি এদেশীয় বিধবা রমণীদের বেদনার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লিখেছেন : 'And woman hath endured, and still endures/ Wrong'. তিনি দেখেছেন 'To her, the sky is dark, the earth is bare'আর সতীদাহ রদের মধ্যে তিনি দেখেছেন 'The priesty tyrant's cruel charm is broken' এবং ' The widowed Hindoo's fate no longer weeps.'তাঁর 'দ্য ফকির অব জঙ্গিরা' কাহিনিকাব্যের রয়েছে সতীদাহের পটভূমি। তার স্বামীর চিতা থেকে নলিনীকে নিয়ে গেছে দস্যুদল। মুসলমান দস্যুসর্দারের সঙ্গে ছিল নলিনীর প্রেম। ধর্মরক্ষার অজুহাতে 'নলিনীর বাবা সাহায্য প্রার্থনা করেন রাজমহলাধীশ শাহ সুজার কাছে। তিনি সৈন্য প্রেরণ করেন। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায় প্রেমিক-প্রেমিকা, কিন্তু এর নোট নিতে গিয়ে হিন্দু বিধবাদের বিষয়ে ডিরোজিও যা বলেছেন তাতে তাঁর সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সতীদাহ নিন্দনীয় অবশ্যই, কিন্তু গৃহে হিন্দু বিধবারা যে অমানবিক জীবনযাপন করতে বাধ্য হতো তার প্রতিকারকেও তিনি বড় কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর ভাষায় : ' The most degrading and humiliating household offices must be performed by a Hindu widow; she is not allowed more food than will suffice to keep her alive, she must sleep upon the bare earth and suffer indignities from the youngest members of her family.' তিনি যখন 'On the Colonization of India by Europeans' প্রবন্ধের উপসংহারে জেরেমি বেন্থামের 'greatest good of the greatest number-কে সুশাসনের ভিত্তি বলে গণ্য করেন, তখন তাঁর সামাজিক প্রত্যয়ের মধ্যে জনচেতনার প্রতি ন্যূনতম অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়।

তিন.

কিন্তু যে কারণে ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত হন সেই কারণটির মধ্যেই রয়েছে তাঁর মূল চিন্তার প্রতিফলন এবং প্রধানত সেই দার্শনিক প্রত্যয় ও প্রয়াসই আজও উপমহাদেশে তাঁর প্রাসঙ্গিকতাকে অধিকতর উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ করে রেখেছে। কী কী অভিযোগ ছিল ডিরোজিওর বিরুদ্ধে? সাধারণভাবে বলা হয়েছে হিন্দু কলেজের অভিজাত পরিবারের পঁচিশজন ছাত্রের অভিভাবক কলেজ থেকে তাদের সন্তান অথবা পোষ্যদের প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ১৬০ জনের মতো অনুপস্থিত। কেউ কেউ অসুস্থ থাকলেও এই ব্যাপক অনুপস্থিতির কারণ অন্য। অনেকে বলেছে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে বা এর প্রতিকার না হলে তারাও কলেজে আসবে না। এই সবকিছুর মূলে কী রয়েছে তা বোঝা যায় ১৮৩১ সালের ২৩ শে এপ্রিল হিন্দু কলেজের পরিচালকরা যে বিশেষ সভা করেন তার বিবরণ থেকে। এদের প্রধান নেতা ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। তিনি ও তাঁর অনুসারী কয়েকজন যা বলেন তাতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। তরুণদের শিক্ষক হিসেবে হেনরি ডিরোজিও তাঁদের দৃষ্টিতে একজন অনুপযুক্ত ব্যক্তি (improper person)। কিন্তু কেন? তা বোঝা যাবে ঐ সভায় স্মারকলিপি হিসেবে প্রস্তুতির জন্যে যেসব প্রস্তাব করা হয়েছিল তার উল্লেখ থেকে। ১ নম্বরেই বলা হয়েছিল : 'Mr. Derozio, being the root of all evils and cause of public alarm should be discharged from the college and all communication between him and the pupils be cut off.' সতের বছরের একজন তরুণ ঐ কলেজে ঢুকে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে কী এমন করলেন যে তাঁর সম্পর্কে এই রকম কঠোর মন্তব্য করতে বা সিদ্ধান্ত নিতে হলো? সেটা তাঁর কোনো নৈতিক স্খলন, না তাঁর

নিয়োগকর্তা ও পরিচালকমণ্ডলীর কোনো ভয়, আতঙ্ক অথবা আশঙ্কা? বিশেষত ঐ সভায়ই যেখানে majority of managers বুঝতে পারেন নি শিক্ষক হিসাবে কোথায় বা কী তাঁর disqualifications এবং কেউ কেউ এমনও বলেন যে, ...he was far from being improper person এবং তখনকার বিশিষ্ট শিক্ষাপরিচালক ডেভিড হেয়ারের মত হচ্ছে এই যে, Mr. Derozio was a highly competent teacher and that his instructions have always been beneficial. সেখানে তাঁর বিষয়ে পদচ্যুতির এই সিদ্ধান্তের কারণ কী? ঐ সভার প্রস্তাবিত প্রস্তাবে উঁচু শ্রেণির ছাত্রদের 'bad habits', তাদের প্রতি হিন্দুত্ব ও দেশের প্রচলিত প্রথার বৈরী মনোভাব ইত্যাদির যে কথা বলা হয়েছে তার আসল কারণ কি স্থিতাবস্থাকে পাকাপোক্ত রাখা এবং কোনোভাবেই যেন জিজ্ঞাসু হয়ে শিক্ষার্থীরা বিদ্যমান অন্যায় ও ভুল চিন্তাকে প্রশ্ন করতে না পারে তার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াই কি ছিল এর মূল লক্ষ্য? বাছাই না করে ছাত্র ভর্তি না করার যে রক্ষণশীল মনোভাব খসড়া ঐ প্রস্তাবগুলোর একটিতে রয়েছে তাতে বোঝা যায়, ছাত্রদের বিকাশ নয়, তাদের মানসিকভাবে বন্দি, পঙ্গু ও স্থবির করে রাখাই ছিল তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মূল প্রবণতা। 'ম্যানেজার'দের মনোভাব থেকে তারই সাক্ষ্য মেলে। ডিরোজিও যেহেতু চাইতেন ছাত্ররা স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়ে নিজের ভাবনা ও চিন্তাকে ঋদ্ধ করুক সেহেতু স্থিতাবস্থার পাহারাদারের গায়ে গিয়ে তা সরাসরি লেগেছে। ডিরোজিও যেহেতু ক্লাসের অতিরিক্ত সময়ে ছাত্রদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা মেটানোয় সদা ব্যস্ত ও তৎপর ছিলেন এবং প্রয়োজন হলে বাসায়ও তাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন সেহেতু কলেজের বৈকালিক অথবা সান্ধ্য ক্লাস, ক্লাসের পরে শিক্ষার্থীদের বাইরে থাকা এবং 'নৈতিকতার জন্যে ক্ষতিকর' বই পড়া নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু কলেজের ম্যানেজিং কমিটির কাছে ডিরোজিও যে পদত্যাগপত্র পাঠান তার মূল অংশ পড়লেই বোঝা যাবে, স্বাধীন ও মুক্ত চিত্ত এবং চিন্তাকে দমন করার লক্ষ্যে তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অত্যন্ত আগ্রাসী অংশ কী ভূমিকা নিয়েছিল। 'It would, however, be unjust to my reputation, which I value, were I to abstain from recording in this communication certain facts, which I presume, do not appear upon the face of your proceedings. Firstly, no charge was brought against me. Secondly, If any accusation was brought forward, I was not informed of it. Thirdly, I was not called up to face my accusers, if any such appeared. Fourthly, no witness were examined on either side. Fifthly, my conduct and character underwent scrutiny and no opportunity was afforded me of defending either. Sixthly, while a majority of the committee did not, as I have learned, consider me an unfit person to be connected with the college. It was resolved, notwithstanding, that I should be removed from it. So that, unbiased, unexamined, and unheard you resolve to dismiss me without even the mockery of a trial. These are facts - I offer not a word of comment.' ২৫ তারিখের প্রস্তাবে ডিরোজিওকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার, পিতামাতাকে সম্মান না করা এবং ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে দেওয়ার ধারণাকে সমর্থনের বিষয়ে অভিযুক্ত করা হয়। এ বিষয়ে এইচ এইচ উইলসন তাঁর কাছ থেকে সরাসরি জানতে চাইলে তাঁর চিঠির উত্তরে ডিরোজিও জানান: ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি শিক্ষার্থীদের চোখ খুলে দিয়েছেন মাত্র, তাদের ওপর কোনো মত চাপিয়ে দেন নি। বায়রন উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'If a man will begin in certainties, he shall end in doubt'. তিনি মজা করে বলেছেন,'If I am to be condemned for the Atheism of some, let me receive credit for the 'theism' of others'. পিতামাতার প্রতি সম্মানবোধের বিষয়ে তাঁর রাগই বলে দেয় এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কী: 'For the first time in life did I learn from your letter that I am charged with having inculcated so hideous, so unnatural, so abominable a principle'. আর 'third question' অর্থাৎ ভাই-বোনের বিয়ে প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "No is my distinct reply; and I never taught such an absurdity".

তাহলে দেখা যাচ্ছে শত্রুনিধনের জন্যে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কিছু খোঁড়া কিন্তু মুখরোচক অজুহাত বেছে নিয়েছিল। কোনো সত্যিকার ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই তারা আত্মমর্যাদাশীল ডিরোজিওকে 'হত্যা' করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মারি অরি পারি প্রকারের সেই যুদ্ধে তারা তখন 'জিতে'ও গিয়েছিলেন। কিন্তু কলেরায় আক্রান্ত শিক্ষককে যে সংখ্যক শিক্ষার্থী শুশ্রূষা করেছিলেন, তার উত্তরকালে অনেকগুণ অদেখা ও অচেনা শিক্ষার্থী তাঁকে তাঁর নীতির কারণে ভালোবেসেছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

কিন্তু ডিরোজিওর দ্বিশতবর্ষের এই দূরত্বে দাঁড়িয়ে কি আমরা বলতে পারি, আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের প্রকৃত ও গুণগত পরিবর্তন হয়েছে? এই প্রশ্নের সদুত্তর খোঁজার মধ্যে আমরা শুধু ডিরোজিওর প্রতিই নয়, নিজেদের প্রতিও যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি।
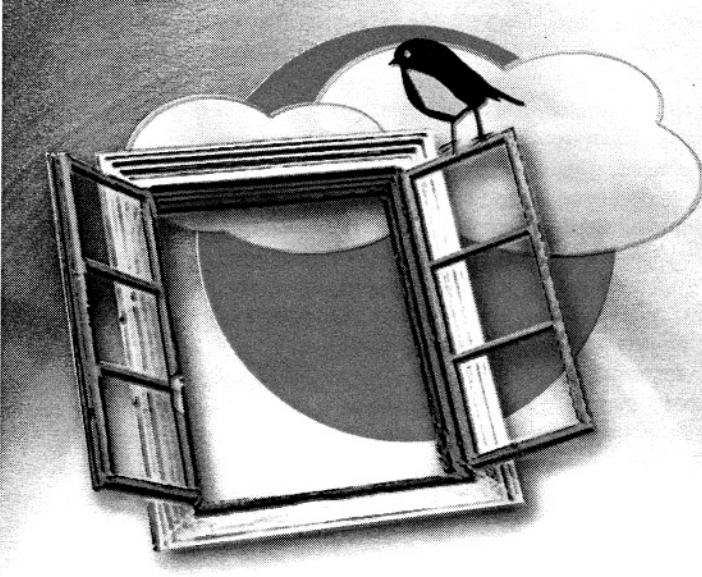
বাঙালির রেনেসাঁসের অগ্রপথিক

আবুল কাসেম ফজলুল হক

ডিরোজিও (১৮০৯-৩২) ছিলেন ব্রিটিশ-শাসিত বাংলায় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রবর্তক। সেজন্যই তাঁর দ্বিশত জন্মবর্ষে তাঁর কৃতি ও কীর্তির কথা আমরা অনুরাগের সঙ্গে স্মরণ করছি। কলকাতার হিন্দু কলেজে (প্রতিষ্ঠা ১৮১৭) শিক্ষক হিসেবে যখন তিনি যোগদান করেন, তার মাত্র বারো বছর আগে (১৮১৪) রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) স্থায়ীভাবে কলকাতায় আসেন (১৮১৪) এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের কাজ আরম্ভ করেন। তার আগে তিনি মুর্শিদাবাদে, রংপুরে ও ফরিদপুরে ছিলেন। *তুহ্‌ফাতুল মুওয়াহহিদিন* তিনি প্রকাশ করেছিলেন মুর্শিদাবাদে থাকাকালে। তাতে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর শাস্ত্রনিরপেক্ষ স্বাধীন অনুসন্ধানের ফল বিবৃত করেছিলেন। রামমোহনের ধর্মজিজ্ঞাসা ও ধর্মীয় অনুসন্ধান ছিল স্বাধীন, প্রচলিত সংস্কার-বিশ্বাস থেকে মুক্ত, মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচার-অবলম্বী। উন্নত জীবন ও সর্বজনীন কল্যাণের জন্য ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের আন্তরিক তাগিদ ছিল তাঁর পরিচালকশক্তি। উনিশ শতকের প্রথম পাদে বাংলায় রেনেসাঁস প্রবর্তনে রামমোহন ছিলেন ডিরোজিওর পূর্বসাধক, সমকালীনও বটে। প্রচলিত সংস্কার-বিশ্বাসে আস্থাহারা, শাস্ত্রনিরপেক্ষ, পূর্বসিদ্ধান্তমুক্ত, আত্মনির্ভর বিবেক ও যুক্তি অবলম্বন করে নতুন ধনাত্মক (positive) জীবন-জগত-দৃষ্টি উদ্ভাবন এবং ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের মাধ্যমে উন্নত নতুন জীবন ও সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবল প্রতিপক্ষের মোকাবিলা

করে চরম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছিলেন তাঁরা। এ কাজে অন্তরের তাগিদই ছিল মূল। তাঁদের সামনে বাধা এসেছিল তৎকালীন হিন্দুসমাজের অসহিষ্ণু ধর্মীয় শক্তির দিক থেকে। 'ধর্মীয় শক্তি' না বলে তাদেরকে 'ধর্মের ধ্বজাধারী কায়েমি স্বার্থবাদী শক্তি' বলাই সমীচীন। ধর্মসভাপন্থিরা– মহারাজা রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ– যতই হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় ঐতিহ্যের পতাকাবাহী হোন না কেন, তাঁরা কেউই ইংরেজি শিক্ষার ও নতুন কালের বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন না। তলিয়ে দেখলে দেখা যায়, তাঁরা তখন প্রগতির বিরোধিতা করেছিলেন নিজেদের নেতৃত্ব ও বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে। রক্ষণশীলতার এটাই ছিল মূল কারণ। রামমোহনকে তাঁরা পছন্দ করতেন না– এমনকি সহ্য করতে চাইতেন না, তার মূল কারণ হয়ত এই যে, রামমোহনের ব্যক্তিত্বের সামনে তাঁদের ব্যক্তিত্ব নিষ্প্রভ হয়ে যেত। রামমোহন-ডিরোজিওর কর্মক্ষেত্র ছিল নির্মীয়মাণ নতুন রাজধানী কলকাতার একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অপরদিকে সুবিধাবাদী হিন্দুসমাজ।

প্রায় শতাব্দীর ব্যবধানে রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের স্পিরিট সঞ্চারিত হয়েছিল বাংলাব মুসলমান সমাজে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), মোহাম্মদ লুতফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), এস ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১) প্রমুখের রচনাবলি ও ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন (১৯২৬-৩৮) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছিল শাস্ত্রনিরপেক্ষ, স্বাধীন মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচার। মুসলমান সমাজেও সূচিত হয়েছিল ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের কর্মকাণ্ড। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের ভাবুক ও কর্মীদের মধ্যে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিল সীমাহীন শ্রদ্ধা, ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানদের প্রতিও ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা– তাঁদের কেউ কেউ 'মুসলিম-সমাজের ইয়ং বেঙ্গল' বলে আত্মপরিচয় দিতেন।

বাংলার রেনেসাঁসের মনীষীরা প্রেরণা লাভ করেছিলেন ইউরোপের রেনেসাঁসের মনীষীদের চিন্তাধারা ও কর্মের অভিজ্ঞতা থেকে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের সাধকদের ভাবধারা থেকে, সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে, ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ–এর (৫৭০-৬৩৩) সাধনা ও সংগ্রাম থেকে, ফরাসি বিপ্লব (১৭৬৯-৮৯), রুশ বিপ্লব (১৯১৭) ও কামাল আতাতুর্কের (১৮৮১-১৯৬৮) বিপ্লব (১৯২২) থেকে এবং আরও নানা উৎস থেকে। তাঁদের সহিষ্ণুতা সর্বব্যাপী ছিল।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি :

জগতে যত মহৎ আছে হইব নত সবার কাছে,

হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে তাদের দ্বারে দ্বারে।

আজন্ম কলকাতায় থেকে ডিরোজিও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তাঁর সমকালীন হিন্দুসমাজের কুপ্রথা, কুসংস্কার এবং ভ্রান্তি ও মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত জনগণের মানসভিত্তি (mind-set)। তিনি নতুন চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আধুনিক যুগের ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসি ও জার্মান দার্শনিকদের রচনাবলি পড়ে এবং তাঁর সমকালীন বিশ্ববাস্তবতার গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করে। ডিরোজিও অনুপ্রাণিত ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের ভাবাদর্শের দ্বারা। তৎকালীন হিন্দুসমাজের তরুণদের নিয়ে ভারতবর্ষে যুগান্তরের বিরাট সম্ভাবনা তিনি আপন অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তাঁর আগ্রহ ছিল দর্শনে, বিজ্ঞানে, ধর্মতত্ত্বে, সাহিত্যে ও ইতিহাসে, এবং তিনি তাঁর চিন্তাশক্তি ও শ্রমশক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনে যতটা, তার চেয়েও বেশি সর্বজনীন কল্যাণে। অসাধারণ বৌদ্ধিক চরিত্রবলের অধিকারী ছিলেন তিনি।

ফরাসি বিপ্লব রামমোহনের প্রেরণারও উৎস ছিল। তবে রামমোহন ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে ডিরোজিও ও তাঁর অনুসারীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য ছিল। রামমোহন হিন্দু কলেজের প্রগতিশীল ধারার কার্যক্রম প্রবল আগ্রহের সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন এবং তাঁদের মহত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েও মনে করেছিলেন, ইয়ং বেঙ্গলরা ইউরোপের মোহে দেশীয় ঐতিহ্য ত্যাগ করে ছিন্নমূল হয়ে পড়ছে। ইয়ং বেঙ্গলরাও গুরুত্বের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন ব্রাহ্মরা প্রগতিশীল কিন্তু নরমপন্থি– এত নরম লাইন নিয়ে হিন্দুসমাজে অভীষ্ট পরিবর্তন সাধন করা যাবে না।

উনিশ শতকে বাংলার হিন্দুসমাজে ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে চিন্তা ও কাজের তিনটি ধারা ছিল।

ধারাগুলো হলো :

১.রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের ধারা

২. ডিরোজিও প্রবর্তিত ইয়ংবেঙ্গলদের ধারা ; এবং

৩. রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত ধর্মসভাপন্থিদের ধারা।

কাজী আবদুল ওদুদ, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরকে চিন্তার দিক দিয়ে ইয়ং বেঙ্গল ধারার অন্তর্গত মনে করেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্কিমচন্দ্রকে 'উনিশ শতকের শেষ পর্বের রামমোহন' বলে অভিহিত করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, ওই পর্বে রামমোহন আত্মপ্রকাশ করলে রামমোহনও বঙ্কিমচন্দ্র যা করেছেন তাই করতেন। তিনটি ধারার কর্মকাণ্ড ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ-শাসিত বাংলায় রেনেসাঁসের অভিব্যক্তি। প্রতিটি ধারাই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে এবং তাদের প্রকৃতি ও রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় আজও এই তিন ধারার অবশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্রিটিশ-শাসনামলে বাংলার হিন্দুসমাজ ও মুসলমানসমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ সমন্বয়মুখী (thesis-antithesis-synthesis) ছিল না–

ছাত্রদের অন্তর্গত সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলতে ও বিকশিত করতে তিনি চেষ্টা করতেন। ছাত্রদের তিনি করে তুলতে চাইতেন জিজ্ঞাসাপরায়ণ, অনুসন্ধিৎসু, সত্যনিষ্ঠ–সব রকম সামাজিক ও মানবিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ। ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে একথা রটে গিয়েছিল যে, হিন্দুকলেজের ছাত্ররা কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারে না। ডিরোজিওর ছাত্র হিসেবে রামতনু লাহিড়ী উল্লেখ করেছেন: চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, ডিরোজিও তেমনি আমাদের আকর্ষণ করতেন।

যদিও কোনো কোনো মনীষী এবং কোনো কোনো গোষ্ঠী সমন্বয়ের জন্য (synthesis) চিন্তা ও চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়েছে, বাংলাও ভাগ হয়েছে।

দুই শতাব্দীর ব্যবধানে আজ ডিরোজিওর চিন্তা ও কর্ম স্মরণ করতে গিয়ে আমরা যদি তাঁর মহত্ত্বের স্পর্শ আমাদের অন্তরে অনুভব করি এবং আমাদের দেশ-কালের পটভূমিতে মনুষ্যত্ব–সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে ও সর্বজনীন কল্যাণে কাজ করতে আগ্রহী হই, কেবল তাহলেই আমাদের স্মরণ সার্থক হবে। বর্তমান অপব্যবস্থা ও অপশক্তির বাস্তবতায় যে-প্রশ্নটির বিচার আজ আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে করা দরকার, তা হলো: রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গল দলের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে, বেগম রোকেয়া প্রমুখের লেখা ও মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার দেশে যে ধারা সূচিত হয়েছিল, তার পরিণতি কী হয়েছে? ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অভিব্যক্তি ঘটেছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬-৩৮) এবং প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের কর্মকাণ্ড (১৯৩৯-৫০), রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-৫২), একুশ দফা আন্দোলন (১৯৫৪-৫৮), ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬-৭১), উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান (১৯৬৮-৬৯), একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। সেকালে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ভেতরে চিন্তাবিদদের, সাহিত্যিকদের ও শিল্পীদেরও ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর অচিরেই দেখা দেয় পুরাতন পরাজিত সব সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির, পুরাতন পরাজিত সব চিন্তাভাবনার এবং অপসৃত সব রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি ও সংস্কার-বিশ্বাসের পুনরুজ্জীবন। সাধারণ মানুষদের মধ্যে দেখা দেয় অদৃষ্টবাদ। সুদীর্ঘ সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যা-কিছু অর্জিত হয়েছিল, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর চার/পাঁচ বছর যেতে না যেতেই প্রায় সবকিছু উল্টে যেতে লাগল।

নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জনের আশায় ব্রিটিশ শাসন ও পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সাধনা ও সংগ্রামের পরিণতিতে অর্জিত হয়েছিল বাংলাদেশ। আমাদের কি কর্তব্য ছিল না, পর্যাপ্ত বিচার-বিবেচনা পূর্বক এই রাষ্ট্রটিকে স্বাধীন, জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা? গত প্রায় চার দশক ধরে ঘটনাপ্রবাহ যেভাবে এগিয়েছে, তাতে বর্তমান ঐতিহাসিক পর্যায়ে, সে-সম্ভাবনা তো আর অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না! এমনটা কেন ঘটল? জাতীয় জীবনে আজ আমাদের করণীয় কী? ডিরোজিওর দ্বিশত জন্মবর্ষে আমাদের জন্য এসব প্রশ্নই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নসমূহের উত্তর সন্ধানের জন্য আমাদের মধ্যে দরকার নতুন কালের নতুন রেনেসাঁসের স্পিরিট। অতীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনো সুফল হবে না। অতীতের পুনরুজ্জীবন অসম্ভব। ইতিহাস কখনও পুনরাবৃত্ত হয় না। আজ দরকার গতানুগতি থেকে মুক্ত, পূর্বধারণামুক্ত, শাস্ত্রনিরপেক্ষ, গুরুবাদনিরপেক্ষ, পৌত্তলিকতামুক্ত (ভাবমূর্তির পূজা, ব্যক্তিপূজা ইত্যাদিও পৌত্তলিকতা) অনুসন্ধিৎসা এবং স্বাধীন মূল্যবোধ ও পক্ষপাতমুক্ত সত্যসন্ধ যুক্তিবিচার। দরকার নতুন চিন্তার সঙ্গে কর্মের নতুন ধারা। প্রচলিত প্রতিটি ধারারও সুযোগ আছে নিজেদের রূপ ও প্রকৃতি বদল করে নবায়িত হওয়ার।

ডিরোজিওর কৃতিত্ব শিক্ষক হিসেবে, এবং 'নব্যবঙ্গের দীক্ষাদাতা' হিসেবে। ডিরোজিওর শিক্ষা তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে ক্রমে সারা বাংলায় বিস্তৃত হয়েছে।

ডিরোজিও ছিলেন জাত শিক্ষক (A teacher by birth) এবং সকল শিক্ষকের আদর্শ।

ডিরোজিওরও শিক্ষক ছিলেন যাঁদের মধ্যে অন্তত একজনের কথা উল্লেখ না করলে গুরুতর অন্যায় হবে। ডিরোজিও কলকাতায় ডেভিড ড্রামন্ড (১৭৮৭-১৮৪৩) প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মতলা একাডেমি'র ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক লিখেছেন: *ডিরোজিও ছ-বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত 'ধর্মতলা একাডেমি'তে লেখাপড়া করেন। এ-বিদ্যালয়ে ড্রামন্ডের তত্ত্বাবধানে*

তিনি ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। শিক্ষক ড্রামন্ডের শিক্ষাগুণে তিনি সন্ধিৎসু, উদার, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র র‍্যাডিক্যালধর্মী ডিরোজিও হওয়ার পেছনে ড্রামন্ডের চিন্তা-দর্শনের অপরিসীম প্রভাব ছিল। সেকালে কলকাতায় ড্রামন্ড ছিলেন ব্যতিক্রমী ইউরোপীয়। একদিকে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, অন্যদিকে ছিলেন প্রগতিপন্থি। তিনি গতানুগতিক ধারার গুরু মহাশয়ধর্মী শিক্ষক ছিলেন না। তিনি ছিলেন 'পার্থিব জীবনের প্রতি আগ্রহী, সুস্থ ও সুউন্নত মনসম্পন্ন একজন সমাজসদস্য। বৈরাগীর আত্মনিগ্রহ তাঁর কাম্য ছিল না, ভোগ-বিলাস ও জীবনের রসাস্বাদনের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল যথেষ্ট।' তবে এ-সাথে তিনি ছিলেন গভীর মানবতাবাদী। মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনে তিনি যুক্তিধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। বস্তুতপক্ষে তিনি ছিলেন একাধারে সংশয়বাদী, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী। তিনি তাঁর সমাজ পরিমণ্ডলে নিজের ভাবাদর্শের যেমন প্রকাশ ঘটাতেন, তেমনি শিক্ষার্থীদের মধ্যেও তা নিঃসঙ্কোচে সঞ্চালন করতেন। ছেলেদের ধর্মপ্রাণ ও তর্কপ্রবণ হয়ে ওঠার আশঙ্কায় অনেক অভিভাবক তাঁর বিদ্যালয়ে সন্তান পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করলেও বিশেষধর্মী এ-শিক্ষকের ছাত্র–সঙ্কট তেমন দেখা যায় নি। তখনকার উঠতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী অনেক অভিভাবক ড্রামন্ডের বিদ্যালয়ে ছেলেদের পাঠাতেন। এর মধ্যে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিরা যেমন ছিলেন, হিন্দুসমাজের ছাত্ররাও তেমনি ছিলেন। (আবদুল মালেক : 'উনিশ শতকে বাংলার শিক্ষাচিন্তা ও সমাজসংস্কার ভাব-নার র‍্যাডিক্যাল ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮)

ড্রামন্ড ও ধর্মতলা একাডেমি সম্পর্কে গত প্রায় দুইশ বছর ধরে এসব কথা বাংলা ও ইংরেজিতে বহুজন নানাভাবে লিখেছেন। এই কথাগুলো ডিরোজিওর শিক্ষকতা সম্পর্কেও সত্য। ড্রামন্ডের শিক্ষকতার গুণাবলি ডিরোজিওর মধ্যে পুরোমাত্রায় দেখা দিয়েছিল। কখনো কখনো মনে হয়, ডিরোজিও ছিলেন ড্রামন্ডেরই বিকশিত রূপ বা সমৃদ্ধ সম্প্রসারণ।

ডিরোজিও সম্পর্কে গত প্রায় দুইশ বছর ধরে লেখালেখির অন্ত নেই। পশ্চিম বাংলায় মার্কসবাদী বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার (১৯৭৭) পর ডিরোজিও সম্পর্কে নতুন আগ্রহ দেখা দিয়েছে। অনেকগুলো বই তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে। তাছাড়া উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁস এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়েও অনেক গবেষণা ও তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসবের ফলে ডিরোজিও ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করলেই বিপুল তথ্য সামনে আসে। এখানে আমি তথ্য উপস্থাপনে কিংবা তথ্যাবলির সারসঙ্কলনে যাব না, জন্ম-দ্বিশতবর্ষের ক্ষুদ্রপরিসর বক্তব্যের জন্য নিতান্ত অপরিহার্য কিছু তথ্য উল্লেখ করব মাত্র।

ডিরোজিওর পিতা ছিলেন পর্তুগিজ, তিনি জে স্কট এ্যান্ড কোম্পানিতে উচ্চপদে চাকুরি করতেন। ডিরোজিওর মা ছিলেন ইংরেজ। ধর্মে তাঁরা ছিলেন খ্রিষ্টান। কলকাতায় পরিবারটি পর্তুগিজ বা ফিরিঙ্গি পরিবার বলে পরিচিত ছিল। তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার কলকাতায় ব্রিটিশ ছাড়া অন্য ইউরোপীয়দের ভালো দৃষ্টিতে দেখত না। সরকারি আইন-কানুনগত অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণও ছিল তাদের উপর। ডিরোজিওর পরিবারও এই বৈষম্যের শিকার ছিল। ডিরোজিও অন্যদের সঙ্গে মিলে এই বৈষম্য দূর করার জন্য চেষ্টা করতেন।

হিন্দু কলেজে তখন তেরোটি শ্রেণি ছিল। ক্লাস থার্টিন ছিল বর্তমানে আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের তৃতীয় শ্রেণির সমান। ছাত্ররা হিন্দু কলেজে তেরো বছর পড়ার পর পরীক্ষা দিয়ে ক্লাস ওয়ান পাস করত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৮৫৭) পূর্ববর্তী চল্লিশ বছর হিন্দু কলেজই ছিল ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ওই পর্যায়ে হিন্দু কলেজে যাঁরা শিক্ষা নিতেন, পরে তাঁরাই দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হতেন। অবশ্য প্রশাসনিক ও পরিচালনামূলক সর্বোচ্চ অবস্থানগুলোতে সর্বত্রই শ্বেতকায় ইংরেজরা থাকত।

ডিরোজিও শিক্ষক হিসেবে (Third Master) হিন্দু কলেজে যোগদান করেন ১৮২৬ সালে। তাঁর শিক্ষার ফলে কলকাতায় হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণির বৃহত্তর অংশে যে অসন্তোষ দেখা দেয় তাঁর জন্য হিন্দু কলেজ থেকে তাঁকে অপসারিত করা হয় (অপসারণের আগে কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন) ১৮৩১ সালে। তার ছয় মাস পরে কলেরায় তিনি মারা যান। মাত্র তেইশ বছরের জীবন, তাতে মাত্র পাঁচ বছর হিন্দু কলেজে তাঁর অবিস্মরণীয় শিক্ষকতা।

ডিরোজিও কেবল পরীক্ষার ফল ভালো করাকে ছাত্রের শিক্ষার লক্ষ্য মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন, ছাত্রের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য হলো তার অন্তঃস্থিত সুপ্ত গুণাবলির বিকাশ যাতে সে পরবর্তী জীবনে সমাজে ভালো মানুষরূপে ভালো জীবনযাপন করতে পারে। নৈতিক বিষয়গুলোকে তিনি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচার-ভিত্তিক, বিজ্ঞানসম্মত– ধর্মীয় নয়। ছাত্রদের অন্তর্গত সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলতে ও বিকশিত করতে তিনি চেষ্টা করতেন। ছাত্রদের তিনি করে তুলতে চাইতেন জিজ্ঞাসাপরায়ণ, অনুসন্ধিৎসু, সত্যনিষ্ঠ– সব রকম সামাজিক ও মানবিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ। ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে একথা রটে গিয়েছিল যে, হিন্দুকলেজের ছাত্ররা কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারে না। ডিরোজিওর ছাত্র হিসেবে রামতনু লাহিড়ী উল্লেখ করেছেন : চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, ডিরোজিও তেমনি আমাদের আকর্ষণ করতেন। বৃষ্টি-বাদল, ঝড়-ঝাপটা, বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখ সবকিছু অতিক্রম করে

ছাত্রেরা ডিরোজিওর ক্লাস করতে চলে আসত। ডিরোজিও ক্লাসে ছাত্রদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করতেন। তিনি চাইতেন, কেবল শিক্ষক নয়, ছাত্রেরাও ক্লাসে কথা বলুক। ছাত্রদের কথা অবলম্বন করে তিনি ছাত্রদের মন বুঝতে চেষ্টা করতেন। ছাত্রদের তিনি বিতর্কে উৎসাহিত করতেন। ছাত্রদের তিনি বোঝাতেন যে জ্ঞানগত বিতর্কের উদ্দেশ্য জয়ী হওয়া নয়, সে বিতর্কের উদ্দেশ্য হলো সত্যের সন্ধানে এগিয়ে চলা; জ্ঞানগত বিতর্কে কোনো হার-জিত নেই; যখন কোনো সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় তখন বিতর্কে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণকারী সকলেই জয়ী হয়। শিক্ষার্থীদের বিতর্কে সত্যের কিংবা জ্ঞানের কিংবা ন্যায়ের সন্ধান করাই মূল ব্যাপার। জীবন ও সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুতর সব বিষয়ই ছিল ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের আলোচনার বিষয়। তর্কের জন্য তর্ক তাঁরা করতেন না। ভারতীয় সমাজের, হিন্দুসমাজের গুরুতর অনেক সমস্যাই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। ডিরোজিও আহার-নিদ্রা ইত্যাদি প্রাত্যহিক কৃত্যাদির সময় ছাড়া বাকি সবটা সময় ছাত্রদের নিয়েই থাকতেন। জ্ঞান অন্বেষণ ও ছাত্রদের নিয়ে চিন্তাচর্চায় সময় কাটানোই ছিল তাঁর নেশা। তৎকালীন বাংলার সমাজে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সম্ভাবনা তিনি অনুভব করতেন।

হিন্দু কলেজে যোগদান করার পরেই উচ্চশ্রেণির (ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত) উৎসাহী ছাত্রদের নিয়ে ডিরোজিও একাডেমিক এসোসিয়েশন নামক সমিতি গড়ে তোলেন। এতে সভাপতি ছিলেন ডিরোজিও, সম্পাদক ছিলেন উমাচরণ বসু, সদস্য ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, ঈষাণচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রমুখ। ডিরোজিওর অনুরাগী ও অনুসারী তরুণেরা– বিশেষ করে যাঁরা একাডেমিক এসোসিয়েশনের সভায় সক্রিয় ছিলেন তাঁরা– পরিচিত হয়েছিলেন ইয়ং বেঙ্গল ও ডিরোজিয়ান নামে। একাডেমিক এসোসিয়েশন ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত সৃষ্টিশীল সংগঠন। ডিরোজিও ছাত্রদের মনকে ভেঙে নতুন করে, উন্নত করে গঠন করতে জানতেন। একাডেমিক এসোসিয়েশন ছিল এমনি ছাত্র-তরুণদের জীবনের পুনর্গঠনের কেন্দ্র। তাতে নৈতিক বিষয় থেকে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, সমকালীন ও ঐতিহাসিক সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই আলোচিত হতো। অনুসন্ধান করলে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। একাডেমিক এসোসিয়েশনে ছাত্র-শিক্ষক অনেকে আসতেন, কলেজের বাইরে থেকেও অনেকে আসতেন, বাঙালি কিংবা ভারতীয়রা যেমন আসতেন, তেমনি আসতেন উচ্চ অবস্থানে আসীন অনেক ইংরেজও। একাডেমিক এসোসিয়েশনেব আলোচনা ও ছাত্রদের উৎসাহ-উদ্দীপনা কলেজের বাইরে কলকাতার হিন্দুসমাজে তুমুল আলোচনার ঝড় তুলেছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি কমিটিতেও একাডেমিক কমিটি আলোচনার বিষয় হয়েছিল।

এরই মধ্যে পত্র-পত্রিকায় ডিরোজিওর বিরুদ্ধে লেখা হতে থাকে যে, নাস্তিক ডিরোজিও হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ছাত্রদের নাস্তিক বানাবার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

ডিরোজিওর বাসভবনেও সব সময় ছাত্রদের আসা-যাওয়া ছিল। বাড়িতেও তিনি ছাত্রদের নিয়ে আলোচনায় বসতেন। হিন্দু কলেজের উচ্চশ্রেণির ছাত্রদের সঙ্গে ডিরোজিওর বয়সের ব্যবধান কম ছিল। তিনি তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন। কলকাতার হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল কর্তাব্যক্তিরা ডিরোজিওর এসব আচরণকে ভালো চোখে দেখতেন না। একাডেমিক এসোসিয়েশনের চিন্তাচর্চায় তাদের কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগত।

ডিরোজিও কবিতা লিখতেন এবং কবি হিসেবেও তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশে রচিত একটি কবিতা (১৮৩১) এখানে উদ্ধৃত করছি :

Expanding, like the petals of young flowers;
I watch the gantle opening of your minds,
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,
That stretch (like young bird in soft summer hours)
Their wings to try their strength. O how the winds
Of circumstances, and freshening April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shell their influence;
And how you worship Truth's Omnipotence !
What joyance rains upon me, when I see
Fame, in the mirror of futurity,
Weaving the chaplets you are yet to gain,
And then I feel I have not lived in vain.

The Fakir of Jangira নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা ছিল তাতে। আর ছিল সতীদাহের নিষ্ঠুরতার বিবরণ। কবিতা ছাড়াও জ্ঞানগত বিষয়ে, সামাজিক সমস্যা ও সমকালীন বিতর্কিত নানা বিষয়ে তাঁর লেখা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তরুণ বয়সের লেখার মধ্যে যে পরিপক্বতার, বিদ্যাবত্তার ও চিন্তাশীলতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তাতে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না।

হিন্দু কলেজ, একাডেমিক এসোসিয়েশন, লেখালেখি, সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ এবং কিছু সংগঠন নিয়ে তিনি ব্যস্ত সময় কাটাতেন। ডিরোজিওর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন ডেভিড হেয়ার। শিক্ষক ছিলেন না তিনি, তবে হিন্দু কলেজের পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন। কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক।

রেনেসাঁসের ভাবাদর্শ প্রচারে তিনি সক্রিয় ছিলেন।

ডিরোজিওর বৈশিষ্ট্যাবলি ও অবদান নানাভাবে কীর্তিত হচ্ছে গত প্রায় দুইশ বছর ধরে। একটু চেষ্টা করলেই পাঠক সেসবের বিবরণ সংগ্রহ করতে পারবেন। আমি অত্যন্ত দ্রুত, প্রধানত স্মৃতি থেকে যেসব বিষয় উল্লেখ করলাম, তাতে ডিরোজিওর প্রতিভা ও মহত্ত্বের পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না বলে অতৃপ্তি রইল। ব্রিটিশ শাসিত বাংলার ও উত্তরকালের বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ এবং গণজাগরণ নিয়ে নতুন কৌতূহল দেখা দিলে, জনগণের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন আশা দেখা দিলে, আমাদের এসব অপর্যাপ্ত আলোচনা সার্থকতা লাভ করতে পারে।

ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গলদের বুঝতে হলে তখনকার কলকাতার ও বাংলার সমাজকে বুঝতে হবে। যতই বাধা-বিপত্তি ঘটুক না কেন, সমাজে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এবং ওই সময়টা ডিরোজিওর মতো মহৎপ্রাণ মনীষীর আত্মপ্রকাশের অনুকূল ছিল। সমাজে প্রতিকূল শক্তি যেমন ছিল, তেমনি সহিষ্ণু অনুকূল শক্তিও বিকশিত হচ্ছিল। অনুকূল শক্তি ছোট ছিল, কিন্তু বর্ধিষ্ণু ছিল। যে কোনো সামাজিক অবস্থায় ডিরোজিওর মতো প্রতিভার আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়; ডিরোজিও জন্মেছিলেন এক মাহেন্দ্রক্ষণে– এক ঐতিহাসিক মহালগ্নে।

ডিরোজিওর প্রতি সমর্থন এবং তরুণসমাজে তাঁর শক্তি যখন দ্রুত বাড়ছিল, তখনই কলকাতার কায়েমি-স্বার্থবাদী রক্ষণশীল গোষ্ঠী ও হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে হিন্দু কলেজের শিক্ষকের পদ থেকে অপসারিত করার জন্য তৎপর হয়। কর্তৃপক্ষ তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়। ডিরোজিও সত্যনিষ্ঠ অবস্থানে থেকে নোটিশের উত্তর দেন, সেই সঙ্গে পদত্যাগপত্রও দেন। কর্তৃপক্ষ কমিটির সভায় সংখ্যাধিক্যের মত অনুযায়ী তাঁকে অপসারিত করে। অপসারণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত ছিল না।

ইয়ং বেঙ্গলদের কর্মকাণ্ডে ত্রুটির দিকও ছিল। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ চরমপন্থি হয়ে উঠেছিল। রক্ষণশীল শক্তির প্রবলতার দিকে না তাকিয়ে কেউ কেউ এমন কথাও প্রচার করেছেন যে, If we hate anything from the bottom of our heart, it is hinduism. তবে ত্রুটির দিক বড় নয়। সেটা সংযত হয়ে আসত।

বাঙালির ইতিহাসের ধারায় ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে ছিল যথার্থ রেনেসাঁসের স্পিরিট। ইয়ং বেঙ্গলদের একাডেমিক এসোসিয়েশন সোসাইটি ফর দ্যা একুইজিশন অব জেনারেল নলেজ, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ইত্যাদির কার্যবিবরণী অনুধাবন করলে, তাঁদের রচিত ও পরে প্রকাশিত রচনাবলি দেখলে, তাঁদের যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না।

রামমোহন-ডিরোজিও ও ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার, সুবিধাবাদ ও ধর্মব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে। স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নামে অনাচার এবং কথিত গণতন্ত্রীদের দৌরাত্ম্য জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। সমাজের উৎপাদনকর্ম কোনোক্রমে চললেও সৃষ্টিশীলতা স্তব্ধ। এ অবস্থায় পুনরুজ্জীবন ঘটেছে অতীতের পরাজিত সব শক্তির এবং অপসৃত সব সংস্কার-বিশ্বাসের। এর ফলে অত্যুন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও বিপুল বৈষয়িক সমৃদ্ধির এই যুগে আমরা নিপতিত হয়েছি সভ্যতা-সংস্কৃতির গভীরতর সঙ্কটে। অত্যুন্নত প্রযুক্তি আর পুরাতন মূল্যবোধ ও বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে গোটা মানবজাতিই আজ সঙ্কটাপন্ন। এ সঙ্কট থেকে মুক্তির ও নবসৃষ্টির জন্য আজ দরকার নতুন রেনেসাঁস, যার কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি।

ব্রিটিশ-শাসিত বাংলার রেনেসাঁসের প্রশ্নে মার্কসবাদীদের অনেকের থেকে যেসব কথা প্রচারিত হয়েছে সেগুলোর গুরুতর পুনর্বিচার দরকার। রেনেসাঁসকে নাকচ করে দিয়ে এই মার্কসবাদীরা আমাদের কোন গন্তব্যের দিকে নিয়ে চলছেন? আমার ধারণা এই মার্কসবাদীদের বক্তব্য মার্কসবাদসম্মতও নয়, সত্যানুসারীও নয়। বাংলায় এবং ইউরোপ-আমেরিকায় আধুনিকতাবাদীরা রেনেসাঁসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নৈরাশ্যবাদ ও কলাকৈবল্যবাদ প্রচার করেছেন। তাঁরা আমাদেরকে কোন গন্তব্যের দিকে নিতে চেয়েছেন? শিল্প-সাহিত্যে তাঁদের সৃষ্ট জগৎ নিয়ে কি আমরা তৃপ্ত থাকতে পারি?

আধুনিকতাবাদের সম্প্রসারণ হিসেবে গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বিকশিত হচ্ছে উত্তরাধুনিকতাবাদ। বলা হচ্ছে উত্তরাধুনিকতাবাদ এখনও স্পষ্ট রূপ নেয় নি– বিকাশমান আছে, ভবিষ্যতে স্পষ্ট রূপ নেবে। উত্তরাধুনিকতাবাদীরাই বা আমাদেরকে কোন গন্তব্যের দিকে নিয়ে চলছেন?

মার্কসবাদী, আধুনিকতাবাদী ও উত্তরাধুনিকতাবাদীদের সৃষ্টিতে ভালো যা কিছু আছে, সবই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তবে এর চেয়েও বড় কথা হলো, রেনেসাঁসে এসবের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকর প্রেরণার উৎস আছে। মার্কস-এঙ্গেলস ছিলেন রেনেসাঁসেরই সন্তান। রেনেসাঁস ও জনজীবনের সম্ভাবনা ছিল তাঁদের কর্ম-প্রেরণার উৎস।

বাংলাদেশের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য নতুন কালের নতুন রেনেসাঁস চাই। আজকের দিনের সকল অন্যায়-অবিচার, ভণ্ডামি-প্রতারণা, মিথ্যা আর নতুন নতুন কুসংস্কারের অবসান চাই। চাই চিন্তার স্বাধীনতা আর সমস্যাবলি থেকে মুক্তি। অতীতমুখী নয়, চাই ভবিষ্যৎমুখী নতুন সাহসী দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা।

ডিরোজিওর দ্বিশততম জন্মবর্ষে আমাদের সঙ্কল্প হোক– বাংলাদেশে আমরা নতুন রেনেসাঁস সৃষ্টি করব এবং বাংলাদেশ থেকে গোটা পৃথিবীতে রেনেসাঁসের নতুন স্পিরিটকে সঞ্চারিত করে দেবে।

কবি আবুল হোসেনের সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকারী : আবদুল মান্নান সৈয়দ

আলোকচিত্র : মুহম্মদ মোজাম্মেল হক

[আবুল হোসেন আমাদের জ্যেষ্ঠতম কবি ও লেখক। জন্ম ১৯২২-এ, খুলনায়। স্কুলের লেখাপড়া করেছেন কৃষ্ণনগরে ও কুষ্টিয়ায়, তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে এম.এ. পাস করেছিলেন।

প্রায় বাল্যকাল থেকে লেখেন, ১৯৩৭ সালে কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ, ১৯৪০ সালে কলকাতার বুলবুল পাবলিশিং হাউস থেকে *নববসন্ত* নামে প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম জীবনে রচিত 'ঘোড়সওয়ার', 'বাংলার মেয়ে' প্রভৃতি কবিতা তাঁকে খ্যাতিমান করে তোলে। *নববসন্ত* আলোচনা করেন সেকালের সুধী সমালোচকদের অনেকেই। *কবিতা*, *পূর্বাশা*, *নিরুক্ত*, *সওগাত*, *মাসিক মোহাম্মদী*, *বুলবুল*, *চতুরঙ্গ* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রথম থেকেই লিখেছেন তিনি। আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শওকত ওসমান, আবু রুশদ– এই 'সপ্তরথী' বাঙালি-মুসলমানের আধুনিক সাহিত্যের প্রথম পুরুষ : কবিতায় ও কথাসাহিত্যে। কবিতায় ও কথাসাহিত্যে এঁদের অনেকেরই লক্ষ্য ছিল স্বল্পকথন ও সংকেতময়তা। আবার এই বন্ধুবলয়ের মধ্যে কবি ও কথক হিসেবে ফররুখ আহমদ ও

শওকত ওসমান ছিলেন সৃষ্টিশীল হিসেবে উদ্দাম উতরোল বহুপ্রজ। সাহিত্যে এঁরা যত পরিণত হয়েছেন, তত এঁদের স্বরস্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জীবনভর উঁচু চাকরি করেছেন আবুল হোসেন, দেশে-বিদেশে সফর করেছেন ঢের– কিন্তু কেন্দ্রচ্যুত হন নি। পুরস্কার পেয়েছেন অনেক, অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন– তবে সাহিত্য থেকে তাঁর অভিনিবেশ সরে যায় নি। জীবনকে গ্রহণ করেছেন একটি সুশান্ত ঔদাস্যে। শরীর অশক্ত, নব্বইয়ের কাছাকাছি এসেও তাঁর স্মৃতি অটুট, জীবনবেদ স্বচ্ছ, সাহিত্যবিশ্বাস দৃঢ়।

১৯৪২ সালে প্রকাশিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ *পার্বত্যপথে* অপ্রাপ্য এখন। কবিতাগ্রন্থ *নববসন্ত*-এর পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে ১৯৭৭– এ– সে প্রায় নতুন বই। অন্যান্য কবিতাগ্রন্থ– *বিরস সংলাপ, হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস, দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে, এখনও সময় আছে, রাজরাজড়া* প্রভৃতি। প্রথম জীবনে ফোয়ারার মতো কবিতা লিখেছেন, পরে কবিতস্রোত কমে আসে– নির্মাণের দিকে নজর দেন, ফলে একটি কবিতা পরিশোধন-পুনঃশোধনের একটি অভ্যাস তৈরি হয়েছে। ডায়েরি লেখার মতো প্রতিদিন তিনি কবিতা লেখেন নি। তাঁর কবিতা অগণন নয়– আত্মচারিত্রিক। তারই মধ্যে চলেছে আঙ্গিকের বিরামহীন পরীক্ষা-সমীক্ষা। আবুল হোসেনের আপাত সহজ-সরল কবিতার অন্তরালে দীর্ঘ প্রযত্ন ও পরিশ্রম আছে– কিন্তু তাকে তিনি আড়ালেই রাখতে সমর্থ হয়েছেন। অতিপ্রজ কবি নন আবুল হোসেন, কিন্তু ব্যক্তিত্ববান কবি। আর হয়তো দীর্ঘ জীবনের ফলেই তিনি জীবনের বহুবিপ্রতীপ পথে পর্যটন করেছেন। ফলত ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা লিখেছেন যেমন, তেমনি সমাজজাগর ব্যঙ্গকবিতাও।

অনুবাদকর্মও করেছেন। বিভিন্ন কবির কবিতার তর্জমা করেছেন। *অন্যক্ষেতের ফসল* গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। এইচ.জি.ওয়েলসের *Country of the Blind* '*অন্ধের দেশ*' নামে, মার্ক টোয়েনের *Million Pound Note* '*দশ লাখ পাউন্ডের নামে*' (স্ত্রী সাহানা হোসেনের নাম ব্যবহার করেছিলেন), ইসমত চুঘতাইয়ের '*ছোটি মা*' গল্প (ইংরেজি থেকে),আন্তন চেখভের গল্প অনুবাদ করেছেন। এসব অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে *মাসিক মোহাম্মদী, নবযুগ, সংলাপ* প্রভৃতি পত্রিকায়। রাশিয়ার লেখক-কবি রসুল গামজাতফের বিমিশ্র গ্রন্থ আকবরউদ্দীনের অনুবাদে প্রকাশিত *আমার জন্মভূমি দাগেস্তান*-এর কবিতাংশ অনুবাদ করেছেন আবুল হোসেন। সম্প্রতি বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

ষাটের দশকে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের সঙ্গে *সংলাপ* নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন। সাতটি সংখ্যা। ছোট ছোট লেখা লিখতেন একসময় নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় পর্যায়ী *দৈনিক নবযুগ*-এ, তিনি ও রশীদ করীম।
গত কয়েক বছরের মধ্যে দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর– *বিবিধ গদ্য* এবং *ভারতবিভাগ ও অন্যান্য লেখা*। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি তাঁর জীবনস্মৃতি লিখে যাচ্ছেন– এ পর্যন্ত চারটি বিচ্ছিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে এই অমূল্য স্মৃতিকথা : একটি কালের ইতিহাস।
আমরা এই সুমনা লেখক-কবিকে অন্তত শতবর্ষজীবী দেখতে চাই। দেশ-কাল-সমাজ সম্পর্কে সতত জাগৃতি, নির্মোহ ব্যক্তিগত দৃকভঙ্গিমা, শান্ত সাহস, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ এবং আরও সব কৃতী লেখক ও মানুষের সংস্পর্শধন্য মানুষের সান্নিধ্য আবুল হোসেনকেই সমৃদ্ধ করে নি– যখনই তাঁর সংস্পর্শে গিয়েছি, ফিরেছি যেন একটি বড়ত্বের স্পর্শ নিয়ে। এই সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েও একই সানন্দ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে।]

প্রশ্ন : আবুল ভাই, আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন আমার : ছাপার অক্ষরে আপনার প্রথম কবিতা কবে প্রকাশিত হয়? প্রথম গদ্য?

উত্তর : প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় আমি যখন কুষ্টিয়া হাই স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি, আমাদের স্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিনে। কবিতার নাম '*আকবরের প্রতি রানা প্রতাপ*,' ১৪-মাত্রার অক্ষরবৃত্তে, মাইকেলের অনুসরণ ছিল।

স্কুলে থাকতে একটি একাঙ্কিকা লিখেছিলাম, অভিনীতও হয়েছিল আমাদের স্কুলে।

ম্যাট্রিক পাস করি কুষ্টিয়া স্কুল থেকে ১৯৩৭ সালে। কলকাতায় গিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হই ১৯৩৭ সালের ২রা জুনে। জুলাই মাসে শুরু হয়েছিল আই.এ.র ক্লাস। ওই ১৯৩৭-এ কলকাতার নামী কাগজে আমার কবিতা ও গদ্য প্রকাশিত হয়। প্রথম কবিতা– যদ্দূর মনে হচ্ছে– এস.ওয়াজেদ আলির *গুলিস্তাঁ* পত্রিকায় আর চৌধুরী শামসুর রহমান-সম্পাদিত *হানাফী* পত্রিকায়। নাম মনে নেই এসব কবিতার। এসব কবিতা আমার বইয়েও নেই।

ওই ১৯৩৭– এই প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নাম ছিল, '*গদ্যকবিতা ও রবীন্দ্রনাথ*'। সম্পাদকের নাম ছিল– যদ্দুর মনে পড়ছে– অমলেশ ত্রিপাঠী। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন– সুবোধ সেনগুপ্ত। ওই প্রবন্ধটিই পরে আরও শোধিত-বর্ধিত হয়ে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আর এগোনোর আগে আপনার ওই কুষ্টিয়ায় থাকতে আর-কোনো সাহিত্য-সংক্রান্ত বলবেন কিছু? আপনাদের পরিবারে আর-কেউ লেখালেখি করতেন?

উত্তর : না, আমিই লিখি। কুষ্টিয়া স্কুলে থাকতেই আমাকে একজন কবিতার ছন্দ শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তার নাম ছিল নিজামাতুল্লাহ। স্বল্পশিক্ষিত, সাহিত্যপ্রেমী মানুষ। তাঁর একটি লাইব্রেরি ছিল, 'আসমাতুল্লাহ লাইব্রেরি'।

কুষ্টিয়া স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়বার সময় '*হে ধরণীর কবি*' নামে রবীন্দ্রনাথকে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম। কবিতাটি অক্ষরবৃত্তে ২৬ মাত্রায় লেখা ছিল। লম্বা খামে এসেছিল ছোট্ট একটা চিরকুট। লেখা ছিল শুধু : 'আশীর্বাদ– শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

[*মাসিক মোহাম্মদী*-তে প্রকাশিত আবুল হোসেনের প্রবন্ধটির নাম ছিল 'গদ্যকবিতা ও তার ছন্দ', বেরিয়েছিল ১৯৩৮-এ। আবুল হোসেন ওই প্রবন্ধে গদ্যকবিতার বিরুদ্ধে বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'ছন্দ একেবারেই অপরিহার্য'– যদিও এর অল্পকাল পরেই তিনি নিজেই গদ্যকবিতা লেখা শুরু করেছিলেন এবং তা আজও অব্যাহত আছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯ সালে শান্তিনিকেতনের এক অভিভাষণে আবুল হোসেনের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন– যদিও তিনি তখন ফিরে গেছেন গদ্যকবিতা থেকে ছন্দোবদ্ধ কবিতায়। এসব হচ্ছে শিল্পীর শিল্পবিবেচনা থেকে শিল্পসৃজনের কী মজাদার বৈপরীত্য! পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আবুল হোসেনের দেখা, কথাবার্তাও হয়েছে। আবুল হোসেন তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ *নববসন্ত* (১৯৪০) উৎসর্গ করেন 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু'– লিখে একটি সনেটে। ওই কবিতায় আবুল হোসেন রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম আশীর্বাণীর কথা তুলেছিলেন– তবে বইটি রবীন্দ্রনাথের হাতে অর্পণের আগেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।]

প্রশ্ন : তারপর তো আপনি পুরোপুরি লেখায় নিবিষ্ট হয়ে গেলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এ. পড়লেন, বি.এ.অনার্স পড়লেন অর্থনীতিতে, এম.এ.ও পড়লেন। কিন্তু লেখালেখিতেও জড়িয়ে গেলেন। তাই না ?

উত্তর : হ্যাঁ। পুরোপুরি। প্রচুর লিখতাম। *কবিতা*, *চতুরঙ্গ*, *পূর্বাশা*, *সওগাত*, *মোহাম্মদী*, *বুলবুল*, *দেশ*, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, *যুগান্তর*, *অরণি*, *নিরুক্ত*, *নবশক্তি*– এরকম কাগজেই লিখতাম। ছোটদের জন্যেও অনেক লিখেছি *মাসপয়লা*, *পাঠশালা*, *শিশু সওগাত* প্রভৃতি পত্রিকায়। *নবযুগ*-এ লিখেছি। *ত্রিকাল* নামে একটি পত্রিকা বের করত আতোয়ার রহমান। লিখেছি ওখানে। জীবনানন্দও লিখতেন ওই পত্রিকায়।

প্রশ্ন : এসবের মধ্যে কোন্ পত্রিকার সঙ্গে আপনার বেশি সম্পৃক্ততা ছিল?

উত্তর : *সওগাত*, *মোহাম্মদী*, *বুলবুল* তো বটেই– বুলবুলে 'ফাউন্টেনপেন' নামে গল্পও লিখেছিলাম– না, উপন্যাস লিখিনি কখনো– *চতুরঙ্গ* আর *পূর্বাশা*-য় খুব লিখতাম। হবীবুল্লাহ বাহারের সঙ্গে আমরা– চল্লিশের দশকের লেখক-কবিরা যুক্ত ছিলাম। 'বুলবুল পাবলিশিং হাউস' থেকে আমার প্রথম কবিতাগ্রন্থ *নববসন্ত* আর আবু রুশদের প্রথম গল্পগ্রন্থ *রাজধানীতে ঝড়* বেরিয়েছিল। ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতাও তো *বুলবুলে*-ই বেরিয়েছিল। *পূর্বাশা*-য় খুব যেতাম।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনার কলকাতায় প্রকাশিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ তো এখন আর পাওয়া যায় না?

উত্তর : হ্যাঁ, *পার্বত্যপথে* বইটির নাম। একটি ভ্রমণকাহিনী। '*শিলংযাত্রী*' নামে *মাসিক মোহাম্মদী*-তে ধারাবাহিক প্রকাশিত

হয়েছিল। প্রকাশক ছিলেন এক লিটল ম্যাগাজিনের সংশ্লিষ্ট ভদ্রলোক– নাম ভুলে গেছি। আমার এক সহযাত্রী হিন্দু বন্ধু ছিল– নাম মনে নেই এখন। হ্যাঁ, *মাসিক মোহাম্মদী*-তে ছবিগুলো দেখেছ ওই লেখার সঙ্গে, সেসব আমারই তোলা। বই আকারে বের করবার সময় কিছু পরিমার্জনা করেছিলাম। *মাসিক মোহাম্মদী*-তে বেরিয়েছিল বোধ হয় ১৯৩৭-৩৮-এ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় সম্ভবত ১৯৪২ সালে।

প্রশ্ন : প্রথম কী লেখায় আপনি খ্যাতি অর্জন করেন?

উত্তর : ১৯৩৯ সালে শারদীয় *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় আমার 'সৈনিক' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এটাই আমাকে বিখ্যাত করে। পরে একাধিক পত্রিকায়, লিটল ম্যাগাজিনে আর কি, কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। তখন নাম বদলে করেছিলাম 'ঘোড়সওয়ার'। কবিতারম্ভে 'তারপর' শব্দটি তখন ছিল না। পরে 'ঘোড়সওয়ার' নামেই আমার বইয়ে যায়। আমার 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি দ্বিতীয় যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা– যুদ্ধবিরোধী কবিতা। বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' হচ্ছে প্রেমের কবিতা– ওর সঙ্গে মিল নেই আমার– কিন্তু একসঙ্গে উল্লিখিত হতো। তখন *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। অরুণ মিত্রও কাজ করতেন ওখানে। জহুর হোসেন চৌধুরীর খুব প্রিয় ছিল আমার 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি, যেখানে যেতেন আবৃত্তি করতেন।

একবার ঈদ-পুনর্মিলনী উৎসব হয়েছিল শামসুননাহার মাহমুদের বাড়িতে। ওঁর স্বামী ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ সিভিল সার্জন ছিলেন আলিপুরের। সেখানে হবীবুল্লাহ বাহার ওই 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি পড়ে শোনান। সেদিন নজরুল ইসলাম ছিলেন সেখানে– তিনি তাঁর কবিতা পড়েছিলেন। ছিলেন ওস্তাদ হোসেন মুহম্মদ খসরু– গান গেয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দি। সংস্কৃতিবান মানুষ ছিলেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতে একবার গেছি শহীদ সোহরাওয়ার্দির বাড়িতে। ভেতর থেকে শাহেদ সোহরাওয়ার্দি এসে বললেন, 'তুমি এখানে কেন?' ওঁর ভঙ্গি ছিল কবি এখানে থাকবে কেন?

প্রশ্ন : শেরে-বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হককে তো চিনতেন আপনি?

উত্তর : শেরে-বাংলাকে একবার আমি নিয়ে গিয়েছিলাম কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে। সম্ভবত, ১৯৪৩-৪৪ সালের দিকে। ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি। বিরাট একটি ক্লাসরুমে। সভাপতিত্ব করেছিলেন আবদুর রহমান সিদ্দিকী। দুজনই অসাধারণ বক্তৃতা করতেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও বেঙ্গল গভর্নমেন্ট দুইকেই ধুয়ে দিলেন। ব্যক্তিমানুষ হিসেবে খুবই ভালো ছিলেন শেরে-বাংলা।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আমাদের চল্লিশের কবিদের মধ্যে আপনার প্রথম কবিতাগ্রন্থ *নববসন্ত* তো প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, ১৯৪০ সালে, মানে আজ থেকে ৭০ বছর আগে। সাড়া পেয়েছিলেন কেমন?

উত্তর : তুমি তো জানোই, বইটি উৎসর্গ করেছিলাম রবীন্দ্রনাথকে, কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হয় নি আর। রামকিঙ্কর প্রচ্ছদ করেছিলেন। নজরুল ইসলামকে দিয়ে এসেছিলেন আমার তরফ থেকে মোতাহের হোসেন চৌধুরী। পরে নজরুলের সঙ্গে চৌধুরী সাহেব দেখা করলে বলেছিলেন, 'এ কি কবিতা? এ কি তরুণের লেখা?

তারুণ্যের সেই উত্তাল উচ্ছ্বাস কোথায়?' চৌধুরী সাহেব আমাকে একথা জানানোয় খুশিই হয়েছিলাম আমি। কেননা আমি চাচ্ছিলামই নিরাসক্ত কবিতা লিখতে। বইটির বেশ কিছু রিভিয়্যু প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন পত্রিকায়। শওকত ওসমান লিখেছিলেন *চতুরঙ্গে*, গোলাম কুদ্দুস *সওগাতে*, আবুল মনসুর আহমদ *কৃষকে*, সুবোধ সেনগুপ্ত *রূপায়ণে*, নীহাররঞ্জন রায় *কবিতা*-য়। *নিরুক্ত*, *পূর্বাশা*-তেও সমালোচনা বেরিয়েছিল যেন মনে হচ্ছে। বিনয়কুমার সরকার ছিলেন আমার অধ্যাপক। তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার বইটিরও বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন।

[বিনয়কুমার সরকারের লেখাটি পাওয়া যাবে *বিনয় সরকারের বৈঠকে* গ্রন্থে। কবি আবুল হোসেন একসময় নিয়মিত তাঁর বাড়ির মাননিক আড্ডায় যেতেন। অন্য রিভিয়্যুগুলি অধুনালুপ্ত আখ্যা না-দিয়ে উপায় নেই। আবুল হোসেন তাঁর *নববসন্ত* নিয়ে দীর্ঘ স্মৃতিচারণ করেছেন। আমাকে অনেকবার বলেছেন, কবি-সমালোচক অনেকে পরে প্রকাশিত *নববসন্ত*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়ে আপত্তি করেছিলেন। তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ, *নববসন্ত*-এর দ্বিতীয় সংস্করণটি নতুন বইয়ের মতো– অনেক পরিবর্তন-পরিশোধন করেছেন কবি। বর্তমান সাক্ষাৎকারী এই বই নিয়ে স্বতন্ত্র পর্যালোচনা করেছেন।]

প্রশ্ন : প্রেসিডেন্সি কলেজ তো ছিল তখনকার দিনের সেরা কলেজ। আপনি আপনার স্মৃতিকথায় প্রেসিডেন্সি কলেজের কথা বলেছেন। আরও কিছু বলবেন?

উত্তর : আমাদের সময়ে যে-বিষয়ই পড়ো ইংরেজি ও বাংলা, ছিল আবশ্যিক। আমাদের ইংরেজি পড়াতেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (পি.সি.ঘোষ নামে বিখ্যাত ডাকসাইটে অধ্যাপক), আর সংস্কৃত ও বাংলা পড়াতেন গৌরীনাথ শাস্ত্রী। পি.সি. ঘোষ আমাদের পড়াতেন *ওথেলো*। বাংলার আরেকজন অধ্যাপক ছিলেন শশাঙ্কশেখর বাগচী। তিনি *Model Essays* নামে একটি বই সম্পাদনা করেছিলেন– বইটি কিন্তু বাংলায় লেখা। তাতে আমাদের দুজন ছাত্রের লেখা রচনা ছিল– আমার আর খুবসম্ভবত উত্তরকালে বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা অমলেশ ত্রিপাঠীর। আমি লিখেছিলাম মোহররম সম্পর্কে। আমাদের নামেই বইয়ে আমাদের রচনা ছাপা হয়েছিল।

প্রশ্ন : সেকালের আর-কোনো ঘটনা মনে পড়ে?

উত্তর : আমাদের কুষ্টিয়া হাই স্কুলে ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দাহম পালিত হবে। আমাকে খবর দেওয়া হলো। হেডমাস্টার সাহেব বলেছিলেন। আমি কলকাতা থেকে নিয়ে গেলাম কবি বেনজীর আহমদ, সাংবাদিক নজির আহমদ চৌধুরী (তিনি তখন *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী*-র সম্পাদক) আর *বুলবুল*-সম্পাদক হবীবুল্লাহ বাহারকে। অনুষ্ঠান ভালোভাবে সম্পন্ন হলো। বিকেলে ওঁদের চা খেতে বলেছি আমাদের বাড়িতে। আব্বা তখন কুষ্টিয়ার পুলিশ অফিসার। কবি বেনজীর আহমদকে দেখে আব্বা আমাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে বললেন, 'জানো, উনি কত বড় বিপ্লবী?' পুলিশের খাতায় নাম তো ছিলই বেনজীর আহমদের। ছবিও ছিল। বেনজীর আহমদের চেহারা ও হাবভাব ছিল নিতান্ত নিরীহ ও গোবেচারা গোছের। দেখে কিচ্ছু বোঝার উপায় ছিল না। আসলেই বেনজীর আহমদ ভালোমানুষ ছিলেন। তবে দুঃসাহসী ছিলেন। হাতকড়া-পরা অবস্থায় পুলিশের হাত থেকে স্টিমার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভরা পদ্মা নদীর স্রোতে।

[হবীবুল্লাহ বাহারের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন আবুল হোসেন। *বুলবুল*-এ লিখেছেন তিনি, 'বুলবুল পাবলিশিং হাউজ' থেকে তাঁর *নববসন্ত* বেরিয়েছে, বুলবুল পাবলিশিং হাউজের পাঠ্যবইসমূহেও বাহার আবুল হোসেনকে কাজে লাগিয়েছিলেন। মওলানা নজির আহমদ চৌধুরী সেকালের রক্ষণশীল মানুষ ছিলেন, নজরুলের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছেন। বেনজীর আহমদ কেবল কবি ছিলেন না, সাংবাদিক ছিলেন না, গদ্যলেখকও ছিলেন। *নওরোজ* পত্রিকাও যার প্রধান লেখক ছিলেন নজরুল– তাঁরই অর্থায়নে প্রকাশিত হয়। তিনি বেশ কিছু গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন– বেগম সুফিয়া কামালের (তখন তিনি সুফিয়া এন. হোসেন) *সাঁঝের মায়া*, ফররুখ আহমদের *সাত সাগরের মাঝি*-র মতো অসামান্য কিছু গ্রন্থেরও ছিলেন প্রকাশক।]

প্রশ্ন : একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই এখন। এ বছর, ২০০৯-এ, চলছে কবি বিষ্ণু দে, কবি অরুণ মিত্র, সম্পাদক ও লেখক শামসুননাহার মাহমুদের জন্মশতবার্ষিকী। এঁদের সকলের সংস্পর্শে এসেছেন আপনি। এঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন, আবুল ভাই।

উত্তর : বিষ্ণু দে-কে আমি বলব 'আধুনিক ক্ল্যাসিকাল'। বলব, রবীন্দ্র-নজরুলের পরে বাংলা সাহিত্যের major একজন কবি। ব্যক্তিগতভাবে ওঁর লেখার ধরন আমি তেমন পছন্দ করি না– ভাষার জন্যে বিশেষ করে। তারপরও বড় কবি বলব

এজন্যে যে, কবিতা যা লিখেছেন উনি তার মধ্যে অনেক আছে অসাধারণ। ওঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশকে বলব সবার উপরে। সবচেয়ে সম্পূর্ণ কবিতা লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর দুর্বল কবিতা প্রায় নেইই। প্রসঙ্গত বলি তোমাকে, বিষ্ণু দে-সম্পাদিত *একসূত্রে* কবিতাসংগ্রহে মুসলমান কবিদের মধ্যে কেবল আছে আমাদের দুজনার কবিতা– আমার আর গোলাম কুদ্দুসের। আমার 'সন্ধিহীন' কবিতাটি আছে। তুমি জানো কিনা জানি না। গোপাল ভৌমিক-সম্পাদিত *পঞ্চাশে* নামে ১৩৫০এর মন্বন্তর সম্পর্কে একটি কবিতাসংকলন ছিল। তাতে ছিল আমার 'মেহেদির জন্যে' কবিতা। অরুণ মিত্র সম্পর্কে আমার ধারণা খুব উঁচু নয়। উনি ফরাসিদেশ থেকে ফিরে ফরাসি ধরনে যে-কবিতা লিখেছেন, তা ঠিক বাংলা কবিতার সঙ্গে খাপ খায় না। বড় কবি দূরের কথা ভালো কবিও মনে করি না তাঁকে। ফরাসি কাব্যের নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেন নি। সম্পূর্ণ কবিতা হয় নি। গভীরতাও নেই। শামসুননাহার মাহমুদকে ভালোভাবেই চিনতাম। একটু একটু করে এম.এ. পাস করেন। বি.এ.পাস করার পরেই লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন– পরে এম.এ. পাশ করেন। ওঁদের বাবা অল্প বয়সে মারা যান। বাহার-নাহার দুই ভাইকে মানুষ করেন ওঁদের নানা খানবাহাদুর আবদুল আজিজ। শামসুননাহার মাহমুদ অসাধারণ ভালো মানুষ ছিলেন। বেগম রোকেয়া সবসময় বোরখা পরতেন, শামসুননাহারকে কখনো বোরখা পরতে দেখি নি। *বুলবুল* সম্পাদনাতেও ভাইয়ের সঙ্গে সমান দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী মাহমুদ সাহেবও ভালোমানুষ ছিলেন। একবার আমার হাঁটুতে infection হয়েছিল। শুয়ে থাকতে হয়েছিল কয়েক মাস। উনি তখন কৃষ্ণনগরের সিভিল সার্জন। উনি তখন আমাকে দেখতে এসেছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকায় চলে এসেছিলেন। উনি ছিলেন এদেশের প্রথম সার্জন-জেনারেল।

প্রশ্ন : আপনি 'মেহেদির জন্য' কবিতার কথা বলেছিলেন একটু আগে। এর কিছু আমিও সেকালের পত্র-পত্রিকায় দেখেছি। দিয়েছিও আপনাকে মনে হয়, আপনার প্রেমকবিতায় আছেন কোনো এক অন্তরালবর্তিনী। এতদিন পরে একটু কি উন্মোচন করবেন?

উত্তর : হ্যাঁ, 'মেহেদির জন্যে' প্রেমের কবিতা। সংখ্যা ৩০/৩২ টি হবে– তার বেশি নয়। আলাদা বই করবার ইচ্ছা ছিল, দেশভাগের ফলে হয় নি আর; লেখাগুলোও হারিয়ে-ছড়িয়ে থাকল। পরে 'মেহেদির জন্যে' নামের কবিতা আমার বইয়ে ভিন্ন নামেও ছাপা হয়েছে। ছোট ছোট লিরিক কবিতা। প্রেমেন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত *প্রেম যুগে যুগে* কবিতায় এটি সংকলিত হয়েছে একটি।

অন্তরালবর্তিনীর কথা বলছিলেন? হ্যাঁ, কাল্পনিক নয়– আছে একজন। মানে ছিল। নাম বলছি না, আছে কলকাতায়। 'মেহেদির জন্যে' সব কবিতাই পড়েছে সে, মন্তব্যও করেছে। 'জন্মদিনে ফুল পেয়ে ভাবি' কবিতাটি পড়লেই বুঝতে পারবে। আমার বন্ধুরা জানত– বিশেষ করে *চতুরঙ্গ*-এর আতোয়ার রহমান আর আবু রুশদ। ওর বন্ধুবান্ধবও জানত। আমার বা ওর অভিভাবকরা জানতেন না, তবে আমার ভাইবোনেরা জানত। 'মেহেদির জন্যে' কবিতাগুচ্ছের বেশিরভাগই ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে লেখা। সম্পর্কটা অনেকদিন ধরে চলেছে। শেষে আমরা নিজেরাই ঠিক করলাম, এটা ঠিক হবে না। সামাজিক বাধা হতো। আমি দেখেছি, এই অসম সামাজিক বিবাহ সুখের হয় না সাধারণত।

প্রশ্ন : আপনার অগ্রজ কবিরা আপনাকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, আবদুল কাদির, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, বেনজীর আহমদ ('ডাইনামো' কবিতা পড়ে টেলিফোন করেছিলেন, 'তুমি দারুণ কবিতা লিখেছ!') হুমায়ুন কবির, বন্দে আলি মিয়া (আমার লেখা ছোটদের কবিতা পছন্দ ছিল তাঁর), জসীমউদ্‌দীন, গোলাম মোস্তফা, কাদের নওয়াজ (খুব পছন্দ করতেন আমাকে), হবীবুল্লাহ বাহার (আমার প্রধান পেট্রন), শামসুননাহার মাহমুদ, বেগম সুফিয়া কামাল– এঁদের সকলের কাছ থেকেই উৎসাহ পেয়েছি।

প্রসঙ্গত বলি তোমাকে– মুসলমান কবিদের মধ্যে হুমায়ুন কবির, বন্দে আলি মিয়া, জসীমউদ্‌দীন, আবদুল কাদির, নজরুল ইসলাম তো আছেনই, গোলাম মোস্তফাও–এঁরা উভয় সমাজে সুপরিচিত ছিলেন।

[প্রসঙ্গত বলি এখানে– কবি আবুল হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ বিংশ শতাব্দীর এবং চিরকালের এই তিন প্রধান কবির সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। এঁদের সম্পর্কে স্মৃতিকথায় বিস্তারিত লিখেছেন তিনি, স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছেন– যা পাওয়া যাবে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থদ্বয়ে। এঁদের কারও কারও সম্পর্কে আমি তাঁকে দিয়ে স্মৃতি-ও-সমীক্ষাধর্মী রচনা লেখাতে সক্ষম হয়েছি। সমুৎসুক পাঠক তাঁর গ্রন্থাবলি দেখে নেবেন বলে আশা করি।

তাঁর সঙ্গে দিনের-পর-দিন আলোচনায় প্রাঞ্জল সাহিত্য সম্পর্কে আমার অনেক অবুঝগ্রন্থি খুলে গেছে।]

প্রশ্ন : আপনার সমসাময়িক কবিদের সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

উত্তর : আমি মনে করি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বড় কবি। সমর সেনকে খুব বড় কবি মনে করি আমি। বাংলায় গদ্যকবিতাকে দাঁড় করিয়েছেন তিনিই। সমর সেন ১০/১২ বছর মাত্র লিখেছেন– অসাধারণ সব কবিতা– যখন দেখলেন আর নতুন কিছু লিখতে পারছেন না ছেড়ে দিলেন। ফররুখ আহমদকে বড় কবি মনে করি– আমার সঙ্গে কোনো মিল নেই– কিন্তু বড় কবি। দিনেশ দাস ভালো কবি। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মোটামুটি ভালোই লিখেছে। নরেশ গুহ ও অরুণকুমার সরকার ভালো লিখেছে, কিন্তু খুব কম। বড় কবি হতে পারত অরুণকুমার সরকার, ওর কিছু কবিতা পড়ে উল্লসিত হয়েছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না।

প্রশ্ন : অগ্রজ ও সমসাময়িক কার গদ্য আপনি ভালো বলবেন?

উত্তর : অবশ্যই বুদ্ধদেব বসু। কবিরা আর-কেউ তেমন ভালো গদ্য লিখলেন না। কিন্তু একটি ভালো বইয়ের কথা বলব– হুমায়ুন কবিরের *বাংলার কাব্য*।

প্রশ্ন : আপনারা নিজেরা গদ্য লেখেননি?

উত্তর : প্রচুর গদ্য লিখেছি একসময়, কলকাতায়, *মাসিক মোহাম্মদী*-তেই বেশি, *আজাদে*ও হতে পারে। আবু রুশদ আধুনিক মুসলমান কবিদের অর্থাৎ আমাদের কয়েকজন সম্পর্কে *সওগাতে* লিখেছিল। গোলাম কুদ্দুস আমার সম্পর্কে লিখেছে। 'আমাদের আধুনিক কবিতা' বিষয়ে প্রবন্ধ পড়েছে– সেখানে আমাদের তরুণ কবিদের প্রসঙ্গেই লিখেছিল বেশি– প্রবন্ধ পড়েছে বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতিতে।

বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির এক মাসিক সাহিত্যসভায় আমি প্রবন্ধ পড়েছিলাম 'আমাদের সাহিত্যসাধনা' নামে। ব-মু-সা-স-তে মুসলমান লেখকরা সবাই ছিলেন– দলমতনির্বিশেষে। কারমাইকেল হোস্টেলের একটি সভায় প্রবন্ধ পড়েছিলাম। সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। ১৯৩৯ সালে। আমার প্রবন্ধের বিষয় ছিল ওই একই : 'বাঙালি-মুসলমানের সাহিত্যসাধনা'। ওখানেই আমাদের শান্তি নিকেতনে যাবার আমন্ত্রণ করেন শামসুল হুদা চৌধুরী। ওঁদের 'সাহিত্যিকা' বলে একটি সংস্থা ছিল। সেক্রেটারি ছিল রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী। সভায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না– আলাদা করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির একটি সাহিত্যসম্মেলন হয়েছিল মুসলিম ইনস্টিটিউটে। কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন ওই মননশীল সভার সভাপতি। 'আমাদের মননশীল সাহিত্য' নামে প্রবন্ধ পড়েছিলাম আমি। কাজী মোতাহার হোসেন আমার প্রবন্ধ এত পছন্দ করেন যে আমাকে এসে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

আমার এসব প্রবন্ধ কোথায় যে হারিয়ে গেছে।

প্রশ্ন : কবিতার সমালোচনাকে গুরুত্ব দেন?

উত্তর : যখনই পাই সমালোচনা পড়ি। মূল্য দিই, কিন্তু প্রভাবিত হই না।

প্রশ্ন : আপনি কি প্রেরণায় বিশ্বাস করেন?

উত্তর : করি। প্রেরণা ছাড়া কবিতা লেখা যায় না। প্রেরণা তোমার কাজে আসে, প্রেরণা যা পাও তা থেকে তোমাকে কাজ করতে হয়। আমি যে একটি কবিতা বারবার লিখি, কাটাকুটি করি, কারণ আমি মনে করি : কাজ করবার সময় কবি শিল্পী থাকে না– স্থপতি হতে হয় তখন কবিকে। সঙ্গে সঙ্গে অদলবদল করি, আবার অনেক সময়ও নিই। কখনো কখনো কয়েক বছর পরে সংস্কৃত করেছি, এমনও হয়েছে।

প্রশ্ন : এতে কি কবিতার মূল inspiration হারিয়ে যায় না?

উত্তর : Inspiration তো idea-র। আবার, কবিতা অনেক অনেক সময় হয় তাৎক্ষণিক। 'অসময়ের কোকিল' নামে একটি কবিতা আছে আমার, এক-দেড় বছর পরে শেষ লাইনগুলো মনে এসে গেল।

প্রশ্ন : আপনি চল্লিশের দশকের কবি বলে চিহ্নিত। সেই বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এসে পৌঁছেছেন– বছর ৭০এর নিরবচ্ছিন্ন কবিতাচর্চা। আপনার কবিতাগ্রন্থগুলিই আপনার যাত্রাপথ নির্ণয় করে দিচ্ছে। আপনি কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছেছেন। তবু আপনি যদি বলেন একটু আমাদের জন্যে?

উত্তর : ইয়েটস বা রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার সারাৎসার প্রাজ্ঞতা। আমি মনে করি, এটা কবিতার একটি শেষ বিন্দু। কবিতার নানা আঙ্গিক নিয়ে কাজ করি, কিন্তু রুচি রসবোধ এবং প্রাজ্ঞতাই আসল। শুরু করেছিলাম রসবোধে, শেষে এসে পৌঁছেছি প্রাজ্ঞতায়। কিন্তু রসও বর্জন করি নি। সহজ হওয়ার চেষ্টা করেছি। কত অল্প কথায়, কত সহজ কথা বলে গভীরতায় পৌঁছে যাওয়া যায় এই আমরা চেষ্টা করেছি। 'সে চির-অধরা' নামে এ বছরে লেখা আমার একটা কবিতা শোনো–

[ডায়েরি থেকে পড়ে শোনালেন 'সে চির-অধরা' কবিতাটি। পরে বললেন হেসে–]

এই কবিতাটি লিখতে শুরু করেছিলাম এ বছর ২রা

ফেব্রুয়ারিতে, শেষ করেছি ৮ই এপ্রিলে।

[কবিতার রচনাকাল লিখে রাখা কাব্যপাঠক ও সমালোচকদের জন্যে খুব উপকারী– হয়তো কবির নিজের জন্যেও– কেননা সম্মুখবর্তিতার প্রতিটি পদচিহ্ন থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথে আনুপূর্ব : নজরুলে মাঝে মাঝে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী নিয়মিত। আমাদের কবিদের মধ্যে সিকান্দার আবু জাফরকে দেখেছি সতর্ক। আবুল হোসেন ডায়েরিতে লেখেন, কিন্তু গ্রন্থে নিরুল্লেখ থেকে যায়। অমিয় চক্রবর্তীর সততভ্রাম্যমাণ জীবনে কবিতা রচনায় ওই স্থান-কাল নানা কারণে গুরুত্ববহ বলেই মনে হয়– নরেশ গুহই বোধ হয় একথা বলেছিলেন একসময়। তবে আবুল হোসেন গ্রন্থে কবিতা রচনার তিথি তারিখ দেন না অবশ্য। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নরেশ গুহ-অরুণকুমার সরকারদের সাজতে-গুজতে বেলা পড়ে এসেছিল। পরবর্তীকালে আবুল হোসেনের কবিতা রচনায় একটুখানি ছেদ পড়েছিল মনে হয়, কিন্তু তাঁর দীর্ঘজীবিতা সহায়ক হয়েছে– গত বছর দশেক তিনি পরিপূর্ণ ঢেলে দিয়েছেন নিজেকে– কবিতায়, প্রবন্ধে, একটির পর একটি কালচিহ্নস্বরূপ তাঁর স্মৃতিকথার খণ্ডে খণ্ডে ।]

প্রশ্ন : আচ্ছা, আধুনিক বাংলা কবিতার জনয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে আপনার একটু মন্তব্য করুন-- এই তো গেল তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী সেদিন–

উত্তর : মাইকেল মধুসূদন দত্ত অসাধারণ কবি। বিরাট কবি। মাইকেলের আগে যে বাংলা কবিতা চলে আসছিল তাকে তিনি সম্পূর্ণ নতুন করে দিলেন। তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি ঢের, তারই বলে তিনি আশ্চর্য ধ্বনিময়তা সৃষ্টি করেছেন কবিতায়। মহাকাব্য মাইকেল ছাড়া হয় নি আর কারো। তরুণ কবিদের মাইকেল পড়তেই হবে। কেন?– ভাষা নিয়ে কত রকম কাজ করা যায় সেটা শিখতে হবে মাইকেল থেকে।

প্রশ্ন : জীবনানন্দ দাশ নিয়ে সেদিন বলছিলেন–

জীবনানন্দের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে একদিন দুই-আড়াই ঘণ্টা কেটেছিল আমাদের আলাপ-আলোচনায়। আমরা কে যেন কি প্রশ্ন করেছিলাম, জীবনানন্দ জবাব দিয়েছিলেন–'কবিকে তার কবিতার মানে জিজ্ঞাসা করবেন না।' বলি তোমাকে, হুমায়ুন কবির খুব বড় কবি মনে করতেন জীবনানন্দকে। আতাউর রহমানও। আবদুল কাদির জীবনানন্দকে পছন্দ করতেন, মোহিতলাল করতেন না। জানো, চল্লিশের দশকে জীবনানন্দের খুব একটা প্রতিপত্তি ছিল না। মৃত্যুর সময়েও। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন বিষ্ণু দে

উত্তর : হ্যাঁ। তোমাকে তো বলেছি, লিখেছিও বোধ হয়, জীবনানন্দের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে একদিন দুই-আড়াই ঘণ্টা কেটেছিল আমাদের আলাপ-আলোচনায়। আমরা কে যেন কি প্রশ্ন করেছিলাম, জীবনানন্দ জবাব দিয়েছিলেন– 'কবিকে তার কবিতার মানে জিজ্ঞাসা করবেন না।' বলি তোমাকে, হুমায়ুন কবির খুব বড় কবি মনে করতেন জীবনানন্দকে। আতাউর রহমানও। আবদুল কাদির জীবনানন্দকে পছন্দ করতেন, মোহিতলাল করতেন না। জানো, চল্লিশের দশকে জীবনানন্দের খুব একটা প্রতিপত্তি ছিল না। মৃত্যুর সময়েও। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন বিষ্ণু দে। 'বনলতা সেন' জীবনানন্দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিতা বলে মনে করি আমি। *রূপসী বাংলা*-য় আমার মনে হয়েছে, গভীরতার চেয়ে আবেগই বেশি।

প্রশ্ন : ১৯৫৪ সালে, জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে, ঢাকার একটি শোকসভায় আপনি ভাষণ দিয়েছিলেন।

উত্তর : হ্যাঁ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আয়োজনে হয়েছিল। উদ্যোক্তা ছিল আবদুল গাফফার চৌধুরী। অন্তত ও-ই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। একটা ফাঁকা ক্লাসে হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। ছাত্রছাত্রীরাই ছিল মূলত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন। সম্ভবত মুহম্মদ আবদুল হাইও ছিলেন। শহীদুল্লাহ সাহেব বলেছিলেন, জীবনানন্দ তাঁর ছাত্র ছিলেন– কোথায়, সে তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো। আমি বলেছিলাম, জীবনানন্দ ছিলেন খুব নিঃসঙ্গ, আর ঠিক কলকাতিয়া নাগরিকতার সঙ্গে মেলাতে পারেন নি নিজেকে। আমার বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি শামসুদ্দীন আবুল কালাম। তিনি সভাস্থল ত্যাগ করেন। হয়তো বলেছিলাম বা এখন বলতে চাই : বাঙালির প্রাণের যে-প্রাচীনতম ঐতিহ্য সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল, প্রবণতাও ছিল ওদিকে। আমি তো মনে করি অবচেতনার কবি জীবনানন্দ, চেতনারও বটে।

প্রশ্ন : লেখালেখির ক্ষেত্রে কার দ্বারা আপনি সবচেয়ে প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে করেন?

উত্তর : মনে হয়, আমার ওপরে ইয়েট্স্-এর প্রভাব আছে। রুচিবোধ জিনিসটা আমি পেয়েছি আবু সয়ীদ আইয়ুবের কাছ থেকে।

প্রশ্ন : আপনার জীবনে সেরা সম্পাদক পেয়েছেন কাদের?

উত্তর : বিশেষত তিনজনের কথা বলব। সঞ্জয় ভট্টাচার্য– যিনি কথা বলতেন না কিন্তু অবাধ প্রশ্রয় দিয়েছেন আমাকে, সে সময়ের অনেক তরুণ লেখক-কবিকেই। হবীবুল্লাহ বাহার ছিলেন আমার পেট্রন, তোমাদের সময়ে সিকান্দার আবু জাফর। সিকান্দার একবার কি কাণ্ড করেছিল জানো? –ঠিক করল আমাদের চল্লিশের কয়েকজন কবির কবিতা এক সংখ্যায় ছাপবে শুধু– কবিতাংশে। আমরা কবিতা দিলাম। আমার কবিতা দিয়েই ওই সংখ্যার কবিতাংশ শুরু হয়েছিল– আমার কবিতাই ওর সবচেয়ে ভালো লেগেছিল, তা-ই।

প্রশ্ন : আপনার একটি বিশেষ কাব্যাভ্যাসের বিষয় আমি জানি। পুনঃ পুনঃ পরিশোধন। কিভাবে এই অভ্যাস তৈরি হলো?

উত্তর : আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই এটা শুরু। আমার প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে।

প্রশ্ন : আপনার এই দীর্ঘ জীবনে অনেক কবির কবিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। শ্রেষ্ঠ কাকে বলবেন?

উত্তর : সব মিলিয়ে ডব্লিউ. বি. ইয়েটস।

প্রশ্ন : কেন?

উত্তর : ইয়েটসের কবিতায় যে-প্রজ্ঞা, জীবনের সারকথা বলতে পেরেছেন, আশ্চর্য রস, ছন্দ, মিল এবং বুদ্ধির প্রয়োগ– তা আর কোথাও পাই নি।

প্রশ্ন : আপনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ এবং অনুজ কবি কারো কারো সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছেন, সমসাময়িক কাউকে কাউকে কবিতা উৎসর্গ করেছেন। কেন করেছেন এসব?

উত্তর : যাঁদের সম্পর্কে লিখেছি, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করেছি অথবা ভালোবেসেছি। আসলে তাঁদের মধ্য দিয়ে আমার বলবার কথাটিই বলেছি।

প্রশ্ন : শেষ কবিতা কবে লিখেছেন? শেষ গদ্য?

উত্তর : শেষ কবিতাটি এ বছরই লিখেছি, 'চিরঅধরা'। শেষ গদ্য লিখেছি মাসখানেক আগে। স্ত্রীর কথা– তার মৃত্যু কিভাবে হলো এ সম্পর্কে। ছোট লেখা– পৃষ্ঠা চারেক।

প্রশ্ন : কী পড়ছেন আজকাল?

উত্তর : সম্প্রতি ওবামার আত্মজীবনী পড়ছি। জীবনী, আত্মজীবনী খুব পড়ি। কবিতা তো সবার আগে পড়ি। উপন্যাসও পড়ি।

প্রশ্ন : আপনি কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন খানদানি ভাষায়। দিনে দিনে সরল স্বচ্ছ হয়ে উঠেছেন। *নববসন্ত* থেকে *কালের খাতায়* ১৯৪১ থেকে ২০০৮ সাল অবধি– অনেকখানি পথ পরিভ্রমণ করেছেন। এত সহজ ভাষায় কেন লিখছেন?

উত্তর : একজন কবিকে তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে ভিন্ন হতে হয়। তাই আমার চেষ্টা কবিতা কত সহজ ভাষায় লেখা যায় এবং একই সঙ্গে কবিতাকে কত সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়– এই দুই চেষ্টা। আর আঙ্গিকের নতুনত্ব– যা আমি সারাজীবনই করেছি। আমার ধারণা, আঙ্গিক নিয়ে এত পরীক্ষা আমার চেয়ে বেশি করে নি কেউ।
একটা কথা বলি তোমাকে– 'বাংলার মেয়ে' *কবিতা* পত্রিকায় বেরিয়েছিল ১৯৩৯ সালে– লিখেছিলাম ১৯৩৭ সালে। *কবিতা* পত্রিকায় আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতা ছিল 'নবযুগ'। 'নবযুগে' বলতে চেয়েছি মুসলমানদের দিন বদল হচ্ছে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া আমি শুনিনি। গোলাম কুদ্দুস পড়ে বলেছে, 'তুমি একটা অসাধারণ কবিতা লিখেছ।' আবদুল

কাদির তখনই পড়েছেন– এবং তাঁর খুবই ভালো লেগেছে। তখনই বলেছেন, 'আপনি এই কবিতা কি করে লিখলেন? আপনার অন্য কবিতার সঙ্গে মিল নেই। মুখের কথার কাব্যরূপ।' একই সময়ে লেখা 'নবযুগে'র ভাষা ছিল অন্য– খানদানি চাল। আমার অন্তরঙ্গতম বন্ধু ছিল গোলাম কুদ্দুস। গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়। গোলাম কুদ্দুসকে তখনই এক চিঠিতে লিখেছিলাম, 'যাই লিখি, আর-কারো মতো লিখলে কিন্তু কবি হওয়া যাবে না।'

[আবুল হোসেনের "বাংলার মেয়ে" কবিতায় বিভিন্ন ছন্দের মিশেল ছিল। ১৯৭৯ সালে আবুল হোসেন *সওগাত*-সম্পাদক প্রদত্ত 'মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক' পেয়েছিলেন। ১৯৮০ সালের ৫ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের মিলনায়তনে কবি আবদুল কাদির একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই অভিভাষণের দুটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করব : 'পরবর্তীকালে কিংবা হয়তো প্রায় ঠিক সেই সময়ে দেখেছি, আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে আবুল হোসেনের অত্যন্ত বন্ধুত্ব। আমি তাদের রাস্তায় একসঙ্গে হাঁটতেও দেখেছি। আইয়ুবের একটা প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছে।' এবং 'বিনয় সরকারের সেই বৈঠকে আবদুল কাদিরের কবিতার কথা যেমন হয়েছে, তেমনি তিনি আবুল হোসেনের "বাংলার মেয়ে" কবিতাটির অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। আমার নিজের ধারণা যে 'বাংলার মেয়ে'র মতো মাত্র একটি কবিতা লিখে যদি কেউ লোকান্তরিত হন, তবু তিনি সাহিত্যের অমরতার দাবি রাখেন। রোমান্টিক কবিতা হিসেবে বাস্তবিকই কবিতাটি অপূর্ব। এই কবিতাটির বৈশিষ্ট্য এই যে, হঠাৎ পড়তে গেলে, যারা আমার ছন্দের বই পড়েন নি বা যারা আমার ছন্দের লেখা পড়ে না বা বোঝে না কিংবা মনে করে এইসব পড়ে কি হবে, তারা হয়তো হঠাৎ মনে করবে যে, এই কবিতাটি গদ্যে লেখা বা গদ্যকবিতা। তা নয়। এই কবিতাটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– এর অধিকাংশ লাইন মাত্রাবৃত্ত পর্বের, মধ্যে মধ্যে গদ্যবাক্যের পর্বও আছে এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু পয়ারের পঙক্তি এবং এই তিনটির মিশ্রণে কবিতাটি লেখা এবং তার মধ্যে যে music সৃষ্টি হয়েছে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।']

প্রশ্ন : আপনি সহজ সরল শব্দে-ভাষায় কবিতা বা গদ্য লেখার পক্ষপাতী এখন। কিন্তু তৎসম শব্দ ব্যবহার না-করলে কবিতা কি শিথিল হয়ে যাবে না?

উত্তর : বাকরীতি, চলতি ভাষা কবিতার বাহন হতে পারে– এটি আমি মনে করি। এতে কবিতা অন্য জায়গায় চলে যায়। কিন্তু ভেতরের আগুনকে ধরতে হবে। তৎসম শব্দ ব্যবহার না-করলে শিথিল হয়ে যেতে পারে বলছ– হ্যাঁ, এটা একটা দারুণ ভয়। বাকরীতি বা কথ্যরীতি যখন ব্যবহার করব, তখন যেন দুর্বল না-হয়ে যায়, এই সতর্কতা দরকার।

প্রশ্ন : চার খণ্ডে আপনার স্মৃতিকথা লিখেছেন– *আমার এই ছোট ভুবন* (২০০৩), *আর-এক ভুবন* (২০০৫), *দুঃস্বপ্নের কাল* (২০০৭), *স্বপ্নভঙ্গের পালা* (২০০৯)। আর কী লিখবেন? আপনার স্মৃতিকথায় জোর দিচ্ছেন কিসে?

উত্তর : ২০০২এ স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করেছি। দুবছর পর পর বই বেরোচ্ছে। মূলত ১৯৯০-এ সম্পূর্ণ করব স্মৃতিকথা– শুধু আমার স্ত্রী সাহানার (১৯৩৫-৯৪) কথা আসবে সময় পেরিয়ে অর্থাৎ ১৯৯৪এ।

স্মৃতিকথায় আমি আসলে আমাদের সময়ের কথা বলবার চেষ্টা করেছি। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতটা– সেটাই লিখেছি। আমি জানি না, এমন কোনো কথা লিখি নি।

প্রশ্ন : ও, একটি কথা জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছে ছিল আপনাকে, সেটা বলি। আপনার সমসাময়িক বন্ধু কথাসাহিত্যিকদের সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তর : বাঙালি-মুসলমান উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজ সম্পর্কে গল্প-উপন্যাস লিখেছে আবু রুশদ। আমার ধারণা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সবচেয়ে ভালো বই *লালসালু*। মুসলমান সমাজের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে– ধর্মকে অনেক সময় ব্যবহার করা হয় তা-ই নিয়ে। মজিদ চরিত্রটিকে ওয়ালীউল্লাহ কিন্তু ব্যঙ্গ করেনি, সহানুভূতির সঙ্গেই দেখেছে। শওকত ওসমান লিখেছে নিম্নবিত্তদের নিয়ে। *জননী* ভালো উপন্যাস। ওর চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে অনেক আঞ্চলিকতা খুঁজে পাই। আমার সবসময় ধারণা, ওর রুচি তত ভালো নয়। ফজলুল হকের গল্প ছিল খুবই ভালো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটু প্রভাব ছিল। নিজেও ছিল একটু বাম-ঘেঁষা, পুরোপুরি নয়, পরে তো আত্মহত্যা করে। এদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো গদ্য লিখেছে রশীদ করীম। স্বচ্ছ, স্পষ্ট, রুচিশীল। *উত্তমপুরুষ* আমাকে স্পর্শ করেছে।

প্রশ্ন : আমাদের জ্যেষ্ঠতম কবি হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের জন্যে আপনার উপদেশ বা পরামর্শ কি?

উত্তর : পড়তে হবে। কেউ যদি কবি হতে চায়, সমস্ত বাংলা কবিতার ঐতিহ্য জানতে হবে তাকে। পড়ে যা পাওয়া যায় তার অনুসরণ করে তাকে অপসারণ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের স্থপতি কাদম্বরী দেবী

আবদুশ শাকুর

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল-বিশেষজ্ঞ চিত্রা দেব 'ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের চোখে রবীন্দ্রনাথ' রচনায় লিখেছেন : "রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষ ছিলেন তাঁর দুই বউঠান– জ্ঞানদানন্দিনী ও কাদম্বরী। এঁরা দুজনে দুই মেরুর বাসিন্দা। ...কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দেখেছেন। প্রায় সময়বয়সি কাদম্বরীর সঙ্গেই ছিল প্রগাঢ় সখ্য। এই সখ্য তৎকালীন পরিবেশে কিছু নতুন। ...জীবনস্মৃতি-র পাতায় সে কথা স্পষ্ট না হলেও ছেলেবেলা-য় এবং পরবর্তীকালের আপনজনেদের কাছে এ কথা স্বীকার করতে কবি কুণ্ঠিত হন নি। ...কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনোগঠনে কাদম্বরীর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কিশোর দেবরটির জন্যে তিনি এক মায়াময় জগৎ রচনা করতে পেরেছিলেন। ...চেষ্টা করতেন তাঁর অন্তরের শক্তিকে জাগাবার। বউদিদির চোখে নিজেকে দামি করে তোলার জন্যে কিশোর কবি যত ব্যাকুল ততই মুখ টিপে দুষ্টুমির হাসি হাসতেন কাদম্বরী। বলতেন, 'কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো কবিতা লিখতে পারবে না।' বলতেন, 'গলা যেন কী রকম। ও কোনোদিন গাইতে পারবে না।' এভাবেই কিশোর কবির মনটিকে উঁচু তারে বেঁধে দিতেন কাদম্বরী, ভালোবাসায়, সখ্যে। তিনি নিজে কিছু লেখেন নি বলেই মনে হয়, অন্তত ভারতী-তে ছাপা হয় নি। একথা বলার কারণ হল, কাদম্বরীর মৃত্যুর পরে মহর্ষির নির্দেশে তাঁর কাগজপত্র, চিঠি, ছবি সব কিছু নষ্ট করে ফেলা হয়। তাঁর দু-তিনটি ছবি শুধু রয়ে যায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির চৌহদ্দির বাইরে। ...প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বোঝা যায়, রবীন্দ্র-কাদম্বরীর শিল্পসাধনা, সংগীতচর্চা, সাহিত্যপ্রীতি ছিল পরস্পরনির্ভর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অচিরেই শ্রোতা ও পাঠকের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেললেন। কাদম্বরীর

তাতেই সুখ। প্রতিভার প্রদীপে তেল-সলতে জোগানোই যেন তাঁর কাজ।" (সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ধ্রুবপদ', কৃষ্ণনগর, বার্ষিক সংকলন, ২০০৪, পৃ. ৭০-৭১)।

বয়ঃসন্ধিকালীন সংবেদনশীল মনে রবীন্দ্রনাথের শক্তির যখন পরিণতি হয় নি অথচ বেগ জন্মেছে, সেই বেগের আবেগকে কাদম্বরী দেবী এভাবে পরিণতির দিকে ধাবিত করেছেন। তাঁর হাতের সোনার কাঠির স্পর্শেই কবি-কিশোরের ঘুম ভেঙেছে। তাঁর জীবনের হ্লাদিনী-শক্তি ছিলেন নবৌদি কাদম্বরী দেবী। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ নারীর দুটি রূপের কথা বলেছেন, গৃহিণী আর হ্লাদিনী– 'মেয়েরা যেখানে গৃহিণী সেখানে বিশেষ গৃহেই তাদের অধিকারের সীমা, যেখানে তারা হ্লাদিনী, সেখানে তারা সমস্ত বিশ্বের'। হ্লাদিনীরাই গুণী মনের ভিতরে 'নারীলাবণ্যের কিরণ' বিকিরণের মাধ্যমে সফলতা সঞ্চার করেন। তাঁর মতে এই নারীলাবণ্যের কিরণ পুরুষের আত্মপ্রকাশে এবং তার মহত্তর সৃষ্টিকর্মে অত্যাবশ্যক। জৈবশরীরের সৃষ্টিক্রিয়ায় পুরুষ দাতা, নারী গ্রহীতা। কিন্তু মনঃশরীরের সৃষ্টিক্রিয়ায় তার বিপরীত লীলা, সে-ক্ষেত্রে নারী দাতা, পুরুষ গ্রহীতা। মানস-সৃষ্টিতে এই দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক ছিল বৌদি এবং দেওরের মধ্যে– একজনের নবযৌবনে, আরেকজনের বয়ঃসন্ধিক্ষণে।

শুভেন্দু দাশমুন্সী তাঁর "নষ্টনীড় থেকে চারুলতা/লেখার মধ্যে লেখা রহিল"-শীর্ষক রচনায় (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১২৫) লিখেছেন– সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' ছবির পোস্টারে 'চারুলতা'-কে "রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়"– বলা নিতান্ত আকস্মিক মনে হয় না!' অর্থাৎ তাঁর মতে, গল্পে কথিত 'নষ্টনীড়'টি কবির নিজেরই। বস্তুতই সত্যজিৎ রায় তাঁর 'চারুলতা' সিনেমায় কাদম্বরীকথাই শুনিয়েছেন। 'নষ্টনীড়'-কাহিনির জীবনীনির্ভর পাঠ-প্রকল্পে নিঃসন্দেহে অবদান রেখেছে, 'চারুলতা' মুক্তি পাওয়ার দু'বছর আগে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ কবিজীবনী– জগদীশ ভট্টাচার্যের লেখা 'কবিমানসী'। কবির ব্যক্তিগত জীবনের কিছু ইঙ্গিত শ্রীরায় গ্রহণ করেছেন এ বইটি থেকে, কিছু সরাসরি 'নষ্টনীড়' থেকে আর কিছু মিশিয়েছেন অন্যান্য তথ্যসূত্র এবং রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* ও *ছেলেবেলা*-বই দুটির সাক্ষ্যে।

চারুলতা সম্পর্কে দেয়া ইঙ্গিতগুলি নতুন বউঠানের স্মৃতিতে ভরে আছে, যেমন দেবরের সঙ্গে সাহিত্যচর্চার। *জীবনস্মৃতি*-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'সাহিত্যে বউঠাকুরানির প্রবল অনুরাগ ছিল, বাংলা তিনি যে পড়িতেন, কেবল সময় কাটাইবার জন্য তাহা নহে– তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম।' তেমনি আরেক ইঙ্গিত চারুলতার সূচীশিল্পের। বউঠানের সাহিত্যপ্রীতির সঙ্গে তাঁর সূচিশিল্পে নৈপুণ্যের প্রসঙ্গ *জীবনস্মৃতি*-তেই উল্লিখিত, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে বউঠান 'নিজে হাতে রচনা করিয়া...একখানি আসন দিয়াছিলেন।' এমনি খুঁটিনাটি আরো অনেককিছু।

'নষ্টনীড়'-এ উল্লিখিত ও 'চারুলতা'-য় গৃহীত দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, চারুর ঘরের লাগোয়া ছাদে তার বানানো বাগানের প্রসঙ্গ ও দ্বিতীয়ত, চারুর পাখি পোষার শখের কথা। প্রথম প্রসঙ্গটি কাহিনিতেও আছে, চিত্রনাট্যেও আছে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি কাহিনিতে নেই, যুক্ত হয়েছে চিত্রনাট্যে। বউঠানের নিজের হাতে তার ঘরের লাগোয়া ছাদকে বাগান বানিয়ে তোলার আর তাঁর পাখি পোষার শখের খবর পাওয়া যাবে ছেলেবেলা-র দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থের 'আসনদাত্রী দেবী' (কাদম্বরী)-শীর্ষক সর্গের 'সেই ছাদে তরুরাজি' 'সেই জালঘেরা পাখি' 'সেই প্রাণখোলা গান'-প্রসঙ্গ *জীবনস্মৃতি* ও *ছেলেবেলা*-র পাঠকের বেশ পরিচিত। এর প্রতিটিই রবীন্দ্রস্মৃতিতে কোনো-না-কোনো ভাবে কাদম্বরী দেবী সম্পর্কে উল্লিখিত।

'নষ্টনীড়' ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। কিন্তু, সত্যজিৎ 'চারুলতা'র চিত্রনাট্যে এর ঘটনাকাল হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন ১৮৭৯ সাল। উনিশ শতকের শেষ পাদের একটি চমৎকার বাস্তবতা 'চারুলতা' ছবিতে ধরা আছে। লক্ষণীয় যে ১৯০১ সালে লেখা কাহিনীর পটভূমি সত্যজিৎ পিছিয়ে দিয়েছেন ১৮৮৪-পূর্ববর্তী সময়ে, যেহেতু সে-বছরই কাদম্বরীর আত্মবিসর্জন ঘটে।

কাহিনির মধ্যে ঘটনাকাল যেমন অনুল্লিখিত তেমনই অনুল্লিখিত প্রধান তিনটি চরিত্রের বয়ঃক্রম। ছবির মধ্যে অমল এসেই চারুকে প্রণাম করে। বোঝা যায় শুধু সম্পর্কের বিচারে নয়, বয়সের দিক থেকেও চারু অমলের চেয়ে বড়। যেমন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় ছিলেন কাদম্বরী। কিন্তু সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়টি হল সত্যজিৎ-নির্ধারিত অমল-ভূপতির বয়স– অমলের ২৩ আর ভূপতির ৩৫। স্মরণীয় যে অমলের এই বয়সটিতেই রবীন্দ্রনাথ হারিয়েছিলেন তাঁর নতুন বউঠানকে, যে-মৃত্যুশোকের কথা রবীন্দ্ররচনায় বারবারই ফিরে এসেছে। আরো লক্ষণীয় যে কবির নবৌদির মৃত্যু-বৎসরে নদাদার বয়সও ছিল ভূপতির মতো পঁয়ত্রিশই।

অন্যমনস্ক ভূপতির স্ত্রী চারুর নিঃসঙ্গতা ও একান্ত মনোযোগী দেবর অমলের সান্নিধ্যের সূত্রটিকে বিষয়গতভাবে চিত্রনাট্যকার কাদম্বরী দেবীর একাকিত্ব এবং দেবর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের প্রসঙ্গটিকে মিলিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গটিকে মাঝখানে রেখেই 'চারুলতা'

ছবির অনুপুঙ্খ তৈরির প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করেছেন ঠাকুরবাড়ির বিবিধ প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ। অ্যান্ড্রু রবিনসনকে 'চারুলতা' সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেছেন, 'Tagore had known the pains, the tensions and the anguish that eat into a man's soul, the real nature of the emotional crisis one has to go through'।

সত্যজিতের এই মন্তব্যটি উল্লেখ করে রবিনসন লিখেছিলেন : He (সত্যজিৎ) has seen a very early manuscript of *Nashtanirh* with marginalia which refers many times to Hecate, Rabindranath's name for Kadambari. There is even a profile portrait sketch, 'the sort that one would do when one is groping for ideas and not actually writing' which is obviously of Kadambari. 'She was at the back of his mind, there's no doubt of that,' says Ray, 'And that I thought was significant'।

রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পালও একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'সিনেমার চারুলতা রবীন্দ্রনাথের বউঠান কাদম্বরীর সঙ্গে অনেকটা মেলানো। কারণ রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাদম্বরী বউঠানের মডেলটা অনেকটাই ব্যবহার করেছিলেন "নষ্টনীড়" গল্পে।'

কাদম্বরী দেবী কেবল রবীন্দ্র-গল্প নষ্টনীড়-এর নায়িকাই নন, এক অর্থে সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যেরই নায়িকা। এ-সত্য অনুধাবনের জন্য রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলির কয়েকটি উৎসর্গপত্রের সানুধ্যান পাঠই যথেষ্ট। কেননা সেগুলি দুর্জ্ঞেয় রবীন্দ্রমনের এক একটা খোলা জানালা। গবাক্ষগুলির ফাঁক দিয়ে সন্ধানী চোখে প্রথমাবধি দেখলে সে-মনটি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা তো যেতই– অনেক আড়ালে ঠেলে দেয়া তথ্যও আবিষ্কৃত হতো এবং অনাবৃত হতো কাদম্বরী সম্পর্কে চেপে রাখা অনেক সত্যও।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে প্রথম উৎসর্গপত্রটি ছিল বৌদি কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ভগ্নহৃদয়'-কাব্যে। এটি তাঁর অপর বৌদি জ্ঞানদানন্দিনীকে উৎসর্গ করাটাই স্বাভাবিক হতো– যেহেতু কাব্যটি রচিত হয়েছিল তাঁরই সান্নিধ্যে, ইংল্যান্ডে। কবির জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত ২০৮টি গ্রন্থের মধ্যে উৎসর্গিত মোট ৬৪টি, তাও মাত্র ৫১ জনের নামে। এর মানে তেরো জন ছিলেন একাধিক উৎসর্গলাভে ধন্য। তাঁদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রেই উৎসর্গপত্রের সংখ্যা দুয়ের বেশি নয়। একমাত্র কবির নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীই দুয়ের বেশি, বস্তুত দুয়ের পাঁচগুণেরও বেশি, উৎসর্গপত্রে স্মরিত।

নবৌদির উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গিত গ্রন্থের সংখ্যা সাধারণত ৭ লেখা হয় যথা– ভগ্নহৃদয়, সন্ধ্যাসংগীত, ছবি ও গান, বিবিধ প্রসঙ্গ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, শৈশব সংগীত, প্রকৃতির প্রতিশোধ (দ্র. সুব্রত রুদ্র, কাদম্বরী দেবী, পৃ. ৩১-৩৬, প্যাপিরাস, কলকাতা)। কিন্তু বিশিষ্ট রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ জগদীশ ভট্টাচার্যের গবেষণায় সংখ্যাটি ১১ যথা– উল্লিখিত ৭-যোগ ইউরোপ-প্রবাসীর পত্র, মানসী, চৈতালি ও কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)। শ্রীভট্টাচার্য আবার 'ভগ্নহৃদয়'-এর উৎসর্গ উদ্ধৃত করেছেন দুটি। একটি সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশকালের, আরেকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশকালের। 'চৈতালি'রও দুটি– একটি উৎসর্গপত্রে, আরেকটি কাব্যগ্রন্থটির সূচনায় কবির নিজের হস্তাক্ষরে মুদ্রিত (দ্র. কবিমানসী প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪১২-৪১৯, ভারবি, কলকাতা, ১৯৬২)।

মাত্র পৌনে ২৫ বছর বয়সে আত্মবিসর্জিতা বৌদির প্রতি মাত্র ১৭ বছরের সান্নিধ্যধন্য দেওরের বিস্ময়কর সংখ্যক উৎসর্গপত্রের বিশদ বিচার-বিশ্লেষণ করলে, কেবল উৎসর্গপত্রের আলোকেই কবির জীবন ও সৃষ্টির সর্বগুরুত্বপূর্ণ পরিচয়টি যথাসময়েই উদ্ঘাটিত হতো। সেই সঙ্গে তাঁর অন্যান্য কিছু তাৎপর্যপূর্ণ মানসবৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও চিন্তাভাবনার উপকরণ পাওয়া যেত। অথচ এ দিকটি মাড়াবার সাহস কবির জীবৎকালের বিরহবিধুর ৫৭ (১৮৮৪-১৯৪১) বছরে তো নয়ই, বিগত শতকের চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকেও গণ্যমান্য কেউই করেন নি– একমাত্র বিদগ্ধ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া।

পরকীয়া প্রেমে এমন কী অস্বাভাবিকতা, যা নিয়ে এত লুকোছাপা করতে হবে? রবীন্দ্রনাথ নিজে তো তা করেন নি। এলাকাটিকে নিষিদ্ধ করে রেখেছেন আভিজাত্যাভিমানী ঠাকুরবাড়ির স্বভাবসুলভ মুখোশধারীরা এবং যাঁরা কবিগুরুকে গুরুদেব বানানোকেও যথেষ্ট মনে না-করে অতিমানব বরং অ-মানব বানাতে চেয়েছেন তাঁরা। অথচ 'অভিজাত' হওয়ার নিন্দনীয় ধান্দার কারণে রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠাতাদের পূজারী তো ছিলেনই না, সমর্থকও ছিলেন না।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যেমন ঠাকুরপরিবারের ধনসম্পত্তি অর্জনের নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করে অন্ধকার অতীতের ওপর আলো ফেলেছেন (পৃ. ৪-৫, রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড), তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রেমোপাখ্যানের নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে ঠাকুরবাড়ির মুখোশ খোলার প্রথম দুঃসাহসী ও প্রত্যয়ী পদক্ষেপটি নিয়েছেন অধ্যাপক-সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'কবিমানসী' গ্রন্থটিতে (১ম খণ্ড, ১৯৬২, ২য় খণ্ড, ১৯৭১)। 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে ২৭. ১০. ১৯৫৮ তারিখে লেখককে চিঠি লিখে লেখাটির প্রতি সপ্রশংস সমর্থন

জানিয়েছিলেন রাজশেখর বসু। পত্রিকাটির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস লেখকের বক্তব্যে রবীন্দ্র-মহিমা ক্ষুণ্ণ হতে পারে ভেবে প্রথমদিকে আশঙ্কিত ছিলেন। একাদশ অধ্যায় প্রকাশিত হবার পর থেকে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত হয়ে লেখকের 'বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের রচনা থেকে অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কারেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন' (পৃ. ১০-১১, প্রাগুক্ত)।

অবশ্য তার প্রায় ছ'দশক আগেই, ১৯০০ সালে, স্বসম্পাদিত *সোফিয়া* পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, তাঁর বহুলখ্যাত 'দ্য ওয়ার্ল্ড পোয়েট অফ বেঙ্গল' প্রবন্ধে, লিখেছিলেন, রবীন্দ্র-কবিতায় যে spirit of sadness আর pain and anguish দেখা যায়, তার উৎসে আছে an excruciating pain of an unrequited love।

রবীন্দ্র-চর্চায় *কবিমানসী* এখন কার্যত নৈঃশব্দ্যের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিস্মৃত প্রায়, কিন্তু প্রকাশকালে এই বই-ই হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রচর্চার কেন্দ্রীয় বিষয় (এ বিষয়ে আগ্রহী পাঠক পড়তে পারেন, তপোব্রত ঘোষের লেখা '*কবিমানসী* : নৈঃশব্দ্যের রাজনীতি' প্রবন্ধটি। দ্র. রবীন্দ্রচর্চা, মার্চ ২০০১)। বস্তুত এই বইটি থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে রাখা হলেও, সেই বইয়ের প্রতিপাদ্য কিন্তু পরবর্তী রবীন্দ্রচর্চায় নানাভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং হচ্ছেও। কবিমানসীকার রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা হিসেবে মানসীদের মধ্যে নির্দিষ্ট করেছেন নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবীকে যাঁকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে স্থির করেছেন। কবির কাব্যসৃষ্টিতে এঁর প্রেরণা বহুবিচিত্র পথে পরিব্যাপ্ত। সেই ব্যাপ্তির নিপুণ ও সংবেদনশীল বিশ্লেষণ *কবিমানসী*। রবীন্দ্রজীবনের অনেক পরিচিত তথ্য নবীন দৃষ্টিতে আলোকিত এবং রবীন্দ্র-রচনার কিছু উপেক্ষিত রচনা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় বইটিতে ক্রমশ আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের সমান্তরালে কবি রবীন্দ্রনাথের বিরহী প্রেমিকসত্তার উন্মোচন ঘটেছে। এই পরিবেশেই আসন্ন রবীন্দ্র-শতবর্ষ উপলক্ষে কবি সুধীন দত্ত লিখেছিলেন :

> That in course of time he [রবীন্দ্রনাথ] and the wife of his brother Jyotirindranath fell desparately in love with each other did not mend matters at all; and when the family married him off presumably to prevent scandal, bad got worse and worse until his sister-in-law killed herself.

'কবিমানসী'র গ্রন্থকার তাঁর ভূমিকায় রবীন্দ্র-কাদম্বরীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সংশয়-সঙ্কোচ ও স্ববিরোধিতার উদাহরণ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খণ্ডে তিনি লিখেছেন কবিমাতা সারদা দেবীর মৃত্যুর (১৮৭৫) পর কাদম্বরী দেবী 'মাতৃহীন শিশুদের মাতৃস্থান' গ্রহণ করেছেন (পৃ. ১৫০-১৫১)। রবীন্দ্রপ্রয়াণের ৫ বছর পর প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে কিঞ্চিৎ শুধরে লিখেছেন, 'মাতৃস্থান, বন্ধুস্থান' (পৃ. ১৫১)। ১৫৩ পৃষ্ঠায় প্রভাতকুমারই আবার লিখেছেন 'আকাশপ্রদীপে'র শ্যামা, কাঁচা আম প্রভৃতি 'কবিতার মধ্যে তাঁহারই (কাদম্বরী দেবীরই) কথা নানা সুরে ধ্বনিয়াছে'। জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, এসব প্রেমের কবিতা মাতৃস্থানীয়া কোনো নারীকে অবলম্বন করে লেখা চলে না। বস্তুতই ১৪ বছর বয়সে মা-হারানো কিশোর রবির জন্য ষোড়শীও না-হওয়া কিশোরী বৌদিকে মা বানানোর একমাত্র উদ্দেশ্য বয়ঃসন্ধিক্ষণিক কিশোর-কিশোরীর সম্ভাব্য স্বাভাবিক সম্পর্কটা আড়াল করা (লুকোছাপার স্তরটা লক্ষণীয়)। অতঃপর 'কবিমানসী' রচয়িতার নির্দ্বিধ মন্তব্য :

'আমাদের পারিবারিক জীবনে সমবয়স্ক দেবর ও ভ্রাতৃবধূর যে-সম্পর্ক স্বভাবতই অতি মধুর, রবীন্দ্রনাথের জীবনে তা মধুরতম রূপ নিয়েই দেখা দিয়েছিল; এবং রবীন্দ্রনাথের সারস্বত সাধনায় তা নিগূঢ় প্রেরণারূপে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। বস্তুত, কাদম্বরী দেবীর প্রতি তরুণ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ানুরাগই তাঁর জীবনের গভীরতম উপলব্ধি এবং কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুই রবীন্দ্র-জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।' (পৃ. ৮, কবিমানসী)।

এ কথাগুলি রবীন্দ্র-কাদম্বরী সম্পর্কে অন্য ভাষায় বলেছেন কবি-নাতনি নন্দিতার স্বামী কৃষ্ণ কৃপালনীও, দিল্লির মালঞ্চ থেকে প্রকাশিত, তাঁর Tagore : A Life-নামক রবীন্দ্র-জীবনীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণে– "a playmate and guardian angel" (p. 25) "...no other loss had so profound an impact on his mind and his genius. It did not break him, it made him." (p. ৫৫).

১৯৭০ সালে 'কবিমানসী' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবার পরেও রবীন্দ্র-পাঠক-লেখকদের ওপর ঠাকুরবাড়ির কুশীলব ও রবীন্দ্র-পরিকরদের আরোপিত এবং বাংলা সাহিত্যামোদীদের আজীবন লালিত কুসংস্কারের কালো মেঘ সহজে কাটে নি। প্রথামতে সকলেই মুখে তালা মেরে

থাকলেন– যে পর্যন্ত না নতুন তথ্যের চাপে তাঁদের মুখের কুলুপ খুলে দিলেন রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল ১৯৮৪ সালে, তাঁর 'রবিজীবনী'র দ্বিতীয় খণ্ডে। তার পর থেকেই রবীন্দ্র-কাদম্বরী সম্পর্কে মুক্তমনে লিখেছেন রবীন্দ্র-গবেষক জ্যোতির্ময় ঘোষ, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র-পাঠক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। রবীন্দ্র-লেখকদের এই সুদীর্ঘ কালের সত্যচর্চার নামে সত্যের-অপলাপচর্চার কারণ– মুখ্যত, ঠাকুরবাড়ির নারীমহলের কূটনীতিজটিল শিথিলরসনার মেয়েলি কথাচালাচালি আর বিভ্রান্তিকর লেখালেখি এবং গৌণত, পুরুষমহলেরও রাখাঢাকা-কথাবার্তা আর উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াকলাপ।

একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে [যিনি ছিলেন 'অলীকবাবু'-নাটকের (১৮৭৭) নায়ক অলীকবাবু এবং 'উর্বশী' নাটকের নায়ক মদন ; দুটি নাটকেই যাঁর নায়িকা হেমাঙ্গিনী ও উর্বশী ছিলেন কাদম্বরী দেবী, যাঁর অভিনয় আর গান ছিল নজর-কাড়া]। তিনি বৌদির সঙ্গে তাঁর সত্য সম্পর্কটির প্রকৃতি প্রথমাবধি খোলামেলা লিখে গিয়েছেন– বিশেষত নতুন বৌঠানের উদ্দেশে রচিত তাঁর উৎসর্গপত্রগুলির পদ্যে এবং বিবিধ রচনার আবেগঘন গদ্যে। অন্য সকলে কেবল ছাই দিয়ে মাছ ঢেকে চলেছিলেন। কেন? পাছে দেবতা না অপবিত্র হয়ে যান। কিন্তু সেসব অতি-দরদিদের দরুন মহান কবি যে নিজের শিকড়টিই হারান এবং তাঁর মহতী স্থপতি যে নিজের মহত্তম সৃষ্টির স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয়ে ইতিহাস থেকেই মুছে যান? তাঁর মুছে যাওয়ার একটি ভৌত প্রমাণ : বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-রচনাবলী গৌণ চরিত্রাবলিরও একাধিক ছবিতে ভরে থাকে– অথচ ২৯টি খণ্ডে একটি ছবিও থাকে না শুধু রচনাবলির স্থপতির। থাকে না ঠাকুরবাড়ির চৌহদ্দিতেও। যার দরুন অন্তিম রোগশয্যায় কবি নতুন বৌঠানের একটি ছবি দেখানোর জন্য একে-ওকে বলার পরে, এঘর ওঘর এবাড়ি ওবাড়ি খুঁজে কেউ কোথাও একটি ছবিও পায় না।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টির প্রাইম-মুভার বা মূল চালিকাশক্তি বহু গুণে গুণান্বিতা কাদম্বরী দেবীর ছবি নিয়ে লুকোছাপার সেখানেই শেষ নয়। এই অনর্পিত দায়িত্ব পরিজনদের মতো পরিকরগণও ধর্মীয় কর্তব্যরূপেই পালন করে গেছেন সারাজীবন। শুধু একটি উদাহরণই দেব এখানে। ১৩২১ সালের ৫ কার্তিক এলাহাবাদে কবির নাতনি (ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের কন্যা) শান্তার বৈঠকখানার দেয়ালে কাদম্বরী দেবীর একটি ছবি দেখেন রবীন্দ্রনাথ এবং রচনা করেন বলাকার অমর কবিতা 'ছবি' যার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি অবিস্মরণীয় সংগীতরূপে গীত হয়। কবিতাটি থেকে কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হল :

এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে।
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মূরতি।
সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ-বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।
....
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে।
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
...
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

জীবন্ত এই সুচিহ্নিত ছবিটি সম্পর্কেও রথী-মহারথীদের চিরাচরিত সেই রাখ-ঢাক, সত্যের সেই সুপরিচিত অপলাপ। 'রবিরশ্মি' প্রণেতা চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'বলাকা কাব্য পরিক্রমা'-কার আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের মতে কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর ছবি দেখেই কবি এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন। অথচ কবিতাটিতেই কবি লিখেছেন, 'সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে/ এ-বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।' এ-বিশ্বও জানে যে কবিজায়া কবিজীবনের প্রভাতলগ্ন উত্তীর্ণ হবার অনেক পরেই তাঁর জীবনে এসেছিলেন। এ ছাড়া কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যধন্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ লিখেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছেই শুনেছেন যে কবি এলাহাবাদে নাতিন-জামাইবাড়িতে নতুন বৌঠানের একখানা পুরানো ফোটো দেখেই এই 'ছবি'

কবিতাটি লেখেন। (কবিকথা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩, পৃ. ১৪৭-১৪৮)। তবু বিতর্ক চালু রেখেছিলেন স্বেচ্ছাসেবী শুদ্ধি-সৈনিকবৃন্দ। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসিত হয়ে, কৃষ্ণ কৃপালনি কানাই সামন্তকে এক পত্রে জানিয়েছেন : I had once asked Gurudev directly as to whether the poem `Chhabi' in Balaka was inspired by Mrinalini Devi's portrait. He replied, No. The poem was addressd to Natun Bouthan's photograph.

(কানাই সামন্ত, 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' গ্রন্থ, পৃ. ৩৯৬)।

বস্তুত নাট্যাভিনয়ের সূত্র ধরেই নতুন মোড় নিয়েছিল দেওর-বৌদির বাস্তব সম্পর্ক। এ সম্পর্কেও অকপটে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথই :

তার পর একদিন
জানাশোনা হল বাধাহীন।
একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়,
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা বিনিময়।

ক্রমশই নিবিড় হল তাঁদের পারস্পরিকতা। পারস্পরিক মুগ্ধতার কথা গোপন থাকতে পারে। কিন্তু তা প্রেমে গড়ালে আর গোপন থাকে না। সে প্রেম বেগ পায় সামনে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা থাকলে, দাউ দাউ করে চাউর হয়ে যায় 'অনৈতিকতা'র উপাদানে পুষ্ট হলে। রবীন্দ্রনাথের এ বয়ঃসন্ধিকালীন প্রেমে সে-মুখরোচক উপাদানগুলিও ছিল। সুতরাং উঠল গুঞ্জন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের বার্তা বাইরে বেরত না চট করে। সে এক আশ্চর্য আবৃত অন্তঃপুর। তবু ভেতরের ঘোলাটে পরিবেশ প্রথমে শ্বাসরুদ্ধকর এবং পরে বিষাক্ত হয়ে উঠল। বিষের প্রাথমিক উৎস কবির মেজদা দেশের প্রথম আইসিএস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর পত্নী ঠাকুরবাড়ির প্রথম বিলেতফেরত 'লেডি' জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ইনি কবির নতুনদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাঁদের বিশেষ বন্ধু ডা. সূর্যকুমার চক্রবর্তীর বিলেতফেরত মেয়ের সঙ্গে। সে-বিয়ে হল না বলেই আইসিএস-পত্নীর অহং-এ লেগেছিল প্রথম আঘাত।

তার পরে তাঁর নির্বাচিতা বিলাতফেরতের বদলে ঠাকুরবাড়ির 'বাজার-সরকারে'র মেয়ে কাদম্বরীর বৌ হয়ে বাহিরবাড়ির নীচতলা থেকে অন্দরমহলে ঢুকে মহলটির পাটরানী হয়ে ওঠা এবং– কবি বিহারীলাল, স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং দেবর রবীন্দ্রনাথের 'ত্রিমুণ্ড'-খেকো– ত্রিমুণ্ডী দেবী 'হেকেটি' হয়ে ওঠায় লেগেছিল চূড়ান্ত আঘাত। পনেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ করার সময় ডাকিনি 'হেকেটি'র সঙ্গে পরিচিত হন এবং সতেরো বছর বয়েসের বউদির অপার রহস্যময়তার মধ্যে এক অমোঘ আকর্ষণী শক্তির আভাস পেয়ে তাঁর কবিতা লেখার 'মালতীপুঁথি'-শীর্ষক খাতায় তিনবার 'বউঠাকরুণ' না লিখে তিনবারই লেখেন Hecate Thakrun! পরের বছর 'অলীকবাবু' নাটকের নায়িকা 'হেমাঙ্গিনী' সাজার পর কাদম্বরী দেবী পুরুষমহলে জনপ্রিয় ডাকনাম পেয়ে যান হেকেটি। হেকেটি এবং হেমাঙ্গিনীর 'হে' রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে 'শ্রীমতী হে– ' নামে অমর হয়ে যায়। কিন্তু বাহিরবাড়ির মেয়েটির কর্তামহলে এই জনপ্রিয়তায় ঈর্ষাকাতর নারীমহল কালো মেয়েটিকে অজ্ঞেয়

আত্মহত্যার পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমি জানি, আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞেস করলে কী সে কহিত, কী তাকে দহিত!' কী বলতেন কাদম্বরী? মনের কথা নিশ্চয় কিছু জানিয়ে গিয়েছেন প্রতিভার আকর, তাঁর অপ্রতিরোধ্য দেবরটিকে। কেননা তিনি নিজেকে তো জানতেনই, আরো জানতেন যে কবিও তাঁর প্রেমে পড়েছেন বেপরোয়াভাবেই। তবে বেচারি এ সত্যও অসহায়ভাবে মানতে বাধ্য হয়েছিলেন যে তাঁদের এই প্রণয় কোথাও পৌছাবে না, শেষ হবে কেবল অশেষ যন্ত্রণাতে

শক্তিধারিণী সত্যিকারের ডাইনির মতো ঘৃণাভরে একঘরে করে ফেলে। সে-ঘরটির কর্তা অর্থাৎ স্বামীটি তো ছিলেন অভাগিনী নারীটি থেকে আলোকবর্ষ দূরের এক ভিন্ন গ্রহের মানুষ।

জায়ের প্রতি পারিবারিক এই বিদ্বেষাভিযানেও আগাগোড়া নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রথম 'আধুনিকা' বাঙালিনী জ্ঞানদানন্দিনীই। তাঁর স্বামী তাঁকে রবির বিয়ের আগেই চিঠিতে লিখেছিলেন এবং মহর্ষিকেও জানিয়েছিলেন যে শ্যামলালের মেয়ে বলেই একে ঠাকুরবাড়ির বউ বানানো ভালো হবে না। কিন্তু মহর্ষি নিজের যুক্তি দিয়ে মেজো ছেলের মত উপেক্ষা করেছিলেন। তাই উচ্চপদস্থ ভাসুর তাঁর বিদগ্ধ সুদর্শন ভাইটির অযোগ্যা স্ত্রী কাদম্বরীকে করুণার চোখেই দেখতেন। স্বামীর সে-করুণাকে অবজ্ঞারূপে ঠাকুরবাড়ি জুড়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্যা স্ত্রী। কন্যা ইন্দিরার ভাষায় তাঁর মা ছিলেন চড়া মেজাজের কড়া বুলির 'জবরদস্ত' মহিলা। তাই কাদম্বরীর বিরুদ্ধে, বিলেতী কেতায় ছড়ি-ঘোরানো, অহঙ্কারী জ্ঞানদা দেবীর কটাক্ষ ও টিপ্পুনি-পুষ্ট সমালোচনা বাড়ির অন্য সকলকে সহজেই প্রভাবিত করেছিল।

সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল জ্ঞানদার সমবয়স্ক দেওর জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। বৌদি তাঁকে স্ত্রী থেকে ছুটিয়ে নিয়ে নিজের বির্জিতলার ১০ নম্বর উড স্ট্রিটের বাসায় সঙ্গীত-নাটকের নতুন আড্ডা জমালেন। এর পর থেকে দেওরটি বৌদির বাড়িতেই পড়ে থাকেন, নিজের বাড়ি ফেরার কথা ভুলে যান। ফলে কাদম্বরীর আসরটি ভেঙে গেল এবং শ্মশান হয়ে গেল তাঁর এবং রবির যৌথ হস্তে গড়ে তোলা তেতলার ছাদের সাধের 'নন্দনকানন'। কবিপ্রিয়াকে পারিবারিক পীড়ন, অপমান, অবজ্ঞা, ও হন্তারক একাকিত্ব প্রয়োগে আত্মহত্যায় বাধ্য করার পর (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড) তাঁর বিপত্নীক স্বামীটি হয়ে রইলেন বৌদির সম্পত্তি, ১৯১০ সালে রাঁচীর মোরাবাদী পাহাড়ে নিজের বাড়ি 'শান্তিধাম'-এ গিয়ে ওঠা পর্যন্তই। এমনি সম্পত্তি যে বেচারির স্ত্রীর মৃত্যুর মাসখানেক পরেই তাঁর 'সরোজিনী' জাহাজের নৌবিহারে হাসিখুশি সফরসঙ্গিনী হলেন মেজবৌদি (দ্র. রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সরোজিনী প্রয়াণ')। তার পরপরই তিনি তড়িঘড়ি বির্জিতলার ভাড়া বাসা ছেড়ে ঠাকুরবাড়িতে উঠে এলেন– রবীন্দ্রনাথের বালিকাবধূ মৃণালিনীকে 'মানুষ' করার মহৎ উদ্দেশ্য ঘোষণা করে। আসলে 'বড়লোক' জ্ঞানদাদেবী ভদ্রাসন ছেড়ে ভাড়া বাসায় গিয়ে উঠেছিলেন কেবল 'ছোটলোক' কাদম্বরীর অবাঞ্ছিত নৈকট্য থেকে দূরে থাকার জন্য।

কাদম্বরী-বিদ্বেষের এই সংক্রামক ব্যাধি পরিবারের মধ্যে ছুঁতে পারে নি কেবল রবীন্দ্রনাথকে। তিনি তাঁর কাব্যমানসীর এই অসহনীয় নিঃসঙ্গতায় তাঁকে আরো বেশি করে সঙ্গ দিয়ে গেলেন। নিরপরাধ বৌদিকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রদত্ত এই কঠোর দণ্ড কবিকে বরং ক্ষেপিয়েই তুলল। কাদম্বরীর সঙ্গে লুকোচুরির প্রণয়কে এবার খোলাখুলি রূপ দিয়ে চললেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যে-পদ্যে, বিশেষত উৎসর্গপত্রে– যেন নির্দোষ বৌদির প্রতি পারিবারিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য প্রতিশোধই নিচ্ছিলেন তিনি। নিঃসঙ্গতা-তাড়িতা নিরালম্ব বৌদিটিও তাঁর একমাত্র-অবলম্বন সৃজনপ্রবণ দেবরটির ডাকে সাড়া দিচ্ছিলেন। এই পর্বেই, বলতে গেলে, তাঁদের পারস্পরিক প্রণয়-সম্পর্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। এমতাবস্থায় ১৮৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবরের দ্বিতীয়বার বিলেত যাবার সম্ভাবনায় আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন বৌদি। এ নিয়েই কবি লিখেছিলেন 'তারকার আত্মহত্যা', যাতে তাঁর অসংবৃত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল।

১৮৮১ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথকে ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য আরো একবার বিলাত পাঠানো হয়। কিন্তু জাহাজ মাদ্রাজ পর্যন্ত যেতেই সহযাত্রী ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের গৃহাকুলতার মতো তুচ্ছ অজুহাত দেখিয়ে বৌদির জন্য একরাশ মনকেমন নিয়ে ফিরে আসে দেবরটি। ফিরে আসাতে মহর্ষিও অখুশি হন নি, পুত্রটি প্রথমবার বিলেত গিয়ে 'প্রগল্ভ' হয়ে উঠেছিল বলে। রবি কিন্তু সোজা তেলেনিপাড়ায় বাঁড়ুজ্যেদের বাগানবাড়িতে অবস্থানরত জ্যোতিদা ও বৌদির কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলেন এবং বাড়ির অপ্রিয় প্রতিক্রিয়াও এড়ালেন। কিছুদিন পরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জ্যোতিদারা বাঁড়ুজ্যেদের বাগানবাড়ি ছেড়ে মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গঙ্গাতীরের এই অবস্থানেই নতুন বৌঠানের সঙ্গে কবির সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল ঘনিষ্ঠতম। সে-সত্যের সাক্ষ্য হয়ে আছে তাঁর অনেক রচনা। তখনো গঙ্গাই রবির কবিধাত্রী। কবিও নিজেকে বলেছেন গাঙ্গেয়। (পদ্মার ডাক তাঁর কবিজীবনে তখনো আসে নি)। এজন্যই 'কবিমানসী'র লেখক সেই 'একবিংশবর্ষ'টিকে কবিজীবনের স্মরণীয়তম বলেছেন। সম্ভবত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এবারের বাইরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল বাড়ির বিষাক্ত পরিবেশ থেকে দূরে নিয়ে স্ত্রীর দেহমনের স্বাস্থ্য ফেরানো।

মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির সেই ঐতিহাসিক অবস্থান থেকে দুর্ভাগ্যপীড়িত ত্রয়ী– জ্যোতিরিন্দ্রি-কাদম্বরী-রবীন্দ্র– উঠে এলেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের ১০ নম্বর সদর স্ট্রিটের বাড়িটি ভাড়া করে– যেখানে লেখা হল কবির অন্যরকম জাগরণের অবিস্মরণীয় কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। পরের বছর দুর্গাপূজাতে দার্জিলিঙে আরেক স্মরণীয় সময় কাটে রবীন্দ্র-কাদম্বরীর। কিছুকাল পরে ১৮৮৩ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয় কবির হৃদয়-সংবাদবাহী 'প্রভাতসংগীত'। তার এক মাস

পরেই 'ভারতী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

'সেই জানলার ধারটি মনে পড়ে, সেই বাগানের গাছগুলি মনে পড়ে, সেই অশ্রুজলে সিক্ত আমার প্রাণের ভাবগুলিকে মনে পড়ে। আর একজন যে আমার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে মনে পড়ে, সে যে আমার খাতায় আমার কবিতার পার্শ্বে হিজিবিজি কাটিয়া দিয়াছিল, সেইটে দেখিয়া আমার চোখে জল আসে। সেই ত যথার্থ কবিতা লিখিয়াছিল। তাহার সে অর্থপূর্ণ হিজিবিজি ছাপা হইল না, আর আমার রচিত গোটা কতক অর্থহীন হিজিবিজি ছাপা হইয়া গেল।'

দৃশ্যত এই লেখা দেখার পরেই ঠাকুরপরিবারের অন্দরমহল চমকে উঠল জলোচ্ছ্বাসের অশনিসঙ্কেত পেয়ে। প্লাবন ঠেকানোর বাঁধ দিতে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে ঠিক করতে লেগে পড়লেন সকলে। সবাই যশোর গেলেন ১৮৮৩ সালের জুন মাসে, রবি ও কাদম্বরীকে নিয়েই, এবং রবির বউ ঠিক করে ফিরে এলেন। সেই প্রচণ্ড মানসিক চাপ সহ্য করতে পারেন নি কাদম্বরী, কলকাতায় ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ইতোমধ্যে ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩-তে প্রকাশিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে কবি, গ্রন্থটির জন্য লিখিত এবং পত্রিকায় অপ্রকাশিত, সূচিপত্রে উল্লিখিত 'সমাপন ও উৎসর্গ'-রচনার শেষ স্তবকটি তুলে দেন :

'আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে! সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুই জনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গম্ভীর স্বরে গভীর আলোচনা? সেই দুই জনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা? সেই প্রভাতের বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া! একদিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমার এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছু দিনের গোটাকতক সুখদুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক একদিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।'

আর কথা কি, দু মাসের মধ্যেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা হল রবীন্দ্রনাথকে ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩। বিয়ের ভাঁড় খেলতে গিয়ে ভাঁড়গুলোকে ইচ্ছে করে উল্টে দিল বর। "এ কী করছিস রবি!"– ছোটো কাকিমা ত্রিপুরাসুন্দরীর আর্তপ্রশ্নের উত্তরে রবি বললেন, "সবই তো আজ থেকে ওলোটপালোট হয়ে গেল কাকিমা।" আর-যাঁর সবই আরো বেশি ওলোটপালোট হয়ে গেল, একমাত্র আশ্রয়টিও নববধূর দখলে চলে গেল– তিনি আর কী করবেন, আত্মহত্যা ছাড়া? তাই করলেন কাদম্বরী ১৮৮৩ সালের ২১শে এপ্রিল প্রভাতে, জীবনের ২৫টি বছরও না-পুরতে– কিছুদিন অসুখ বিসুখে ভুগতে ভুগতে এবং বিষ খেয়ে দুই দিন দুই রাত ধুঁকতে ধুঁকতে। অস্বাভাবিকভাবে প্রয়াত কাদম্বরীর মরদেহ নিয়মানুযায়ী মর্গে পাঠানো হয় নি। স্ক্যান্ডেল এড়ানোর উদ্দেশ্যে ৫১ টাকা ১২ আনা খরচ করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই বসানো হয়েছিল করোনার কোর্ট। স্বয়ং মহর্ষির উদ্যোগে করোনার রিপোর্ট লোপ করা হল, লোপাট করা হল 'সুইসাইড নোট', ৫২ টাকা ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করা হল সংবাদপত্রের। সে-কারণে কোনো খবরকাগজেই ছাপা হয়নি অভাগিনীর করুণ মৃত্যুসংবাদটি। চিরতরে চলে গেলেন কাদম্বরী দেবী– নীরবে, নিঃশব্দে।

আত্মহত্যার পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমি জানি, আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞেস করলে কী সে কহিত, কী তাকে দহিত!' কী বলতেন কাদম্বরী? মনের কথা নিশ্চয় কিছু জানিয়ে গিয়েছেন প্রতিভার আকর, তাঁর অপ্রতিরোধ্য দেবরটিকে। কেননা তিনি নিজেকে তো জানতেনই, আরো জানতেন যে কবিও তাঁর প্রেমে পড়েছেন বেপরোয়াভাবেই। তবে বেচারি এ সত্যও অসহায়ভাবে মানতে বাধ্য হয়েছিলেন যে তাঁদের এই প্রণয় কোথাও পৌছাবে না, শেষ হবে কেবল অশেষ যন্ত্রণাতে। প্রণয়িনী কাদম্বরী তাই তাঁর অনন্ত যন্ত্রণা প্রণয়ীর কাছে গচ্ছিত রেখে ভারমুক্ত হয়ে লোকান্তরে চলে যাওয়াটা দুজনের জন্যেই শ্রেয় জ্ঞান করলেন। বস্তুত তাঁর সমস্ত জীবন এবং অকাল মরণ ছিল অমেয় প্রতিভাধর দেবরটির কাছে রেখে যাওয়া অসমাপ্ত একটি নিগূঢ় পত্র– আমরণ প্রেরণার উৎসস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু জানতেন, কাদম্বরীর প্রতি তাঁর গভীর প্রণয় কোথায় পৌছাবে– পৌছাবে তাঁর বাকি জীবনের কালজয়ী কথা আর কবিতায়, গল্পে আর গানে। তাই পরবর্তীকালে তাঁর লেখাতে কবি বৌঠানের স্বহননের প্রতি নিজের নৈতিক সমর্থনও খুঁজে পেয়েছিলেন। একদিন কথাচ্ছলে নির্মলকুমারী মহলানবীশকে বলেওছিলেন যে বৌদিটি আত্মহত্যা করার কারণেই আজো তাঁকে নিয়ে কবিতা আর গান লিখছি, বেঁচে থাকলে হয়তো বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মামলা করতুম।

যন্ত্রণাজনিত স্বেচ্ছামৃত্যু পর্যন্ত তো স্বর্ণকুমারী দেবীর তৃতীয়া কন্যা ঊর্মিলার দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জন্যও দায়ী করা হতো 'অপয়া' কাদম্বরীর বন্ধ্যাত্বকে। তাঁর অপরাধ, তিনি নিজের শূন্য বুক পূরণ করার জন্য মেয়েটিকে প্রায় পোষ্যকন্যার মতো লালনপালন করতেন। (১৮৭৯ সালে একদিন তিনতলার লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে একা-একা

নামবার সময়ে পড়ে গিয়ে পাঁচ বছরের শিশুটির করুণ মৃত্যু ঘটে)। ভাগ্যবিড়ম্বিতার মৃত্যুর পরেও কিন্তু শেষ হয় নি তাঁর প্রতি 'বন্ধ্যা' 'ব্রাত্য' 'গরিবের মেয়ে' ইত্যাদি বলে 'অভিজাত' ঠাকুরবাড়ির ঘৃণা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অবজ্ঞা আর নানারকম অপমানকর কথাবার্তার চর্চা। নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তার জন্য কি নারীই দায়ী? দায়ী হলেও ঠাকুরবংশে তো তেমন নারীর এমন ছড়াছড়ি যে সকলে সমকালীন হলে তাঁদের নিয়ে একটা মিছিল কিংবা প্যারেডও হতে পারত। তবে ঠাকুরবাড়ির আত্মীয়া হয়েও কাদম্বরী অনভিজাত বা ব্রাত্য কেন সে এক দীর্ঘ অধ্যায় হলেও, পাঠকের মনে প্রশ্ন থেকে যাবে বলে সারকথাটা বলা দরকার। চিত্রা দেব লিখেছেন :

'কাদম্বরী শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বলে এবং ধনে মানে কিছু খাটো বলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অনেকেরই মনে হয়েছিল তিনি ঠাকুরবাড়ির উপযুক্ত বধূ নন।...কিন্তু বংশপরম্পরায় গঙ্গোপাধ্যায়-পরিবারের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগ ছিল তিন পুরুষেরও বেশি এবং বিভিন্ন বৈবাহিক সম্পর্কের গাঁটছড়ায় আগাগোড়া বন্দি। জগন্মোহনের সঙ্গে দ্বারকানাথের মাতুলকন্যার বিবাহের খবর সবাই জানেন কিন্তু তাঁর দুই পুত্র রামলাল ও শ্যামলালও বিবাহ করেছিলেন এই ঠাকুর-পরিবারেই। শ্যামলাল বিবাহ করেন রাধানাথ ঠাকুরের পুত্র মথুরানাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে। অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে কাদম্বরীও ঠাকুরবাড়ির মেয়ে। কাদম্বরীর মাতামহ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন চোরবাগান ঠাকুরবাড়ির দৌহিত্র। কাজেই ঠাকুরবাড়ির আভিজাত্যের সঙ্গে, দোষ-গুণ-বিশিষ্টতার সঙ্গে, কাদম্বরীর যোগ কম ছিল না, বরং কবির অপর বউঠাকুরানিরা অন্যান্য পরিবারের কন্যা ছিলেন' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২)।

আরও নির্দিষ্ট করেই বলা যাক। বয়সে দেবর রবির এক বছর দশ মাস বড়, শ্যামলী কাদম্বরীর জন্ম ১৮৫৯ সালের ৫ জুলাই। পিতা শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়ির বাজারসরকার। দাদা জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়ির দারোয়ান। দারোয়ান না-বলে কেয়ার-টেকার বলাই সঙ্গত। বস্তুত দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'অড জব ম্যান' এ মানুষটি ছিলেন গৃহস্থালী যাবতীয় কর্মে পারঙ্গম, অতি উত্তম শেফ, সঙ্গীতশিল্পে পারদর্শী এবং শিল্পটির একজন গুণগ্রাহী। পিতার মতো সর্বকর্মে পারদর্শী ছিলেন পুত্র শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ও। সে সূত্রেই ঠাকুরবাড়ির কেয়ারটেকারের পুত্রের বাজারসরকারি করা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

তবু সত্য তো এই যে শতবর্ষ ধরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে ঘনিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও কাদম্বরীর পরিবার ছিল ঠাকুরবাড়ির বাহিরবাড়ির লোক। তাঁদেরই একজন ভিতরবাড়িতে ঢুকে বাড়িটির পাটরানী হয়ে যাওয়ায় সকলের গায়েই যেন আঁচ লেগেছিল। কিন্তু তাঁরা মহর্ষির যুক্তিটি মনে রাখলেন না। জ্যোতির বধূরূপে কাদম্বরীকে সত্যেন্দ্রনাথের অপছন্দ হওয়ার কথা পিতাকে জানালে প্রত্যুত্তরে পুত্রকে তিনি লিখেছিলেন– 'জ্যোতির বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়া গিয়াছে এইই ভাগ্য। একে ত পিরালী বলিয়া ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে বিবাহেতে যোগ দিতে চাহে না, তাহাতে আবার ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য পিরালীরা আমারদিগকে ভয় করে। ভবিষ্যৎ তোমাদের হস্তে– তোমাদের সময় এ সঙ্কীর্ণতা থাকিবে না'। পরে অবশ্য পুত্র রবির বউ করেও দেবেন্দ্রনাথ তাঁর অত্যন্ত নিম্ন মানের এক কর্মচারীর মেয়েই এনেছিলেন।

এবার নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গপত্রগুলি থেকে কিছু উদ্ধৃতি। উৎসর্গপত্র প্রথম দেখা দিল 'ভগ্নহৃদয়' - কাব্যে, ভারতী পত্রিকায় প্রকাশকালে :

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা। ...
ও মু'খানি সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে
আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা।...
চরণে দিনু গো আনি– এ ভগ্ন-হৃদয়খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিতধারা।

বোধগম্য কারণে অচিরেই 'প্রয়োজনীয় সংশোধন'ক্রমে এই প্রেমের গানটি ব্রহ্মসংগীতরূপে গীত হয়েছে ব্রাহ্মসমাজে। সে-নাম এবং সে-পাঠ নিয়েই গানটি গীতবিতানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তবে পরিবেশিত হয়েছে, কেন জানি, প্রেম-পর্বেই। এ আরেক দৃষ্টান্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর লুকোছাপার– কেবল কবির একটি মানবিক প্রেমকে আড়াল করে মানুষটিকে অহেতুক দেবতা বানানোর জন্য। 'ও মু'খানি'র স্থলে 'তব মুখ' এবং 'আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা'-পঙ্‌ক্তিটির বদলে 'তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা' লেখানো হয়েছে। চমৎকার অন্তিম চরণ দুটি তো পুরোপুরি বর্জিতই হয়েছে এবং গীতবিতানেও।

'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১) গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে উৎসর্গপত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে ত্রিশ চরণের একটি কবিতা, পাঁচটি স্তবকে। নির্বাচিত উদ্ধৃতি :

উপহার
শ্রীমতী হে...
জীবন-সমুদ্রে তব জীবন-তটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর,
সন্ধ্যার বাতাস লাগি ঊর্মি যত উঠে জাগি,

অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া,
জানে বা না জানে কেউ জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে– বিরাম পাবে– তোমার চরণে গিয়া।

'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২) গ্রন্থের উৎসর্গপত্রের উপহারটি হল গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা। দীর্ঘ কবিতাটি থেকে নির্বাচিত উদ্ধৃতি :

একবার শুধু চেয়েছিলে,
স্তরে স্তরে এ হৃদয় হয়ে গেল অনাবৃত,
হৃদয়ের দিশি দিশি হয়ে গেল উদঘাটিত,
একে একে শত শত ফুটিতে লাগিল তারা,
... ...
আগে কে জানিত বল কত কি লুকান' ছিল
হৃদয়-নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে!

'বিবিধ প্রসঙ্গ'-গ্রন্থের উৎসর্গ পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। 'ছবি ও গান'-গ্রন্থের উৎসর্গপত্রের উদ্ধৃতি : 'গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর উৎসর্গপত্র সবচেয়ে আবেগঘন– তোমাকে দিলাম। কাদম্বরী-প্রয়াণের ছয় বৎসর পরেও 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ তাঁকেই উৎসর্গিত (১২৯৭)। উৎসর্গপত্রের উপহার :

...
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।
সেই আনন্দ-মুহূর্তগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।'

নবৌদির মৃত্যুর ১১ বছর পরেও তাঁকেই উৎসর্গিত 'চৈতালি' কাব্য (১৩০২)। সূচনায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত ছিল এ-কবিতাটি :

'তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি,
তোমার আনন্দমূর্ত্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর,– পরাণ-বল্লভ,
তোমার কোমলকান্ত চরণপল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবনতরীতে,–
কোনো ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।'

তাঁর আত্মবিসর্জনের ১৯ বছর পরেও মোহিতচন্দ্র সেন কর্তৃক ঐতিহাসিক ক্রম ভঙ্গ করে ভাবগতভাবে পুনর্বিন্যস্ত 'কাব্যগ্রন্থ'ও (১৩১০) তাঁরই স্মরণে উৎসর্গিত। উদ্ধৃত হচ্ছে মাত্র একটি স্তবক :

আমারে কর তোমার বীণা,
লহ গো লহ তুলে!
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি
মোহন অঙ্গুলে!

গ্রন্থাবলীর উৎসর্গপত্র ছাড়াও কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুপরবর্তী কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বেই রবীন্দ্রমনে আকস্মিকভাবে তাঁর আবির্ভাব লক্ষ করা যায়। যেমন 'ক্ষণিকা'-কাব্যগ্রন্থের (১৩০৭) শেষ দুটি কবিতা 'অন্তরতম' এবং 'সমাপ্তি'-তে।

'অন্তরতম' কবিতায় কবি তাঁর অন্তরতম মানস-প্রতিমাকে জানাচ্ছেন কিছু অন্তরঙ্গ সংবাদ :

আমি যে তোমায় জানি, সে তো কেউ
জানে না।
তুমি মোর পানে চাও, সে তো কেউ
মানে না।
মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস,
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়,–
কেহ কিছু নারে কহিতে।

এই কবিতাটিরই শেষ স্তবকে রবীন্দ্রনাথ কবিমানসীকে বলেছেন অন্তরঙ্গতম কথাটি :

বলি নে তো কারে, সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে,
বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি
বেড়াই ছদ্ম-সাজেতে।
যাহা মুখে আসে গাই সেই গান,
নানা রাগিণীতে দিয়ে নানা তান,
এক গান রাখি গোপনে।
নানা মুখপানে আঁখি মেলি চাই,
তোমা পানে চাই স্বপনে।

এই অন্তরতম কবিমানসীর উদ্দেশেই 'সমাপ্তি' কবিতাটি উৎসর্গিত। রবীন্দ্রনাথ ছদ্মবেশে কবিমানসীর পথে পথে সকাল বিকাল গান গেয়ে গেয়ে পথপ্রান্তে পৌঁছে তাঁকে প্রাণের শেষ কথাটি বলছেন :

পথে যতদিন ছিনু ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।

রবীন্দ্রনাথের গায়কখ্যাতি

করুণাময় গোস্বামী

গীতবিতানে পূজাপর্যায় গানের সংখ্যা ৬১৭। এই ৬১৭টি গানকে রবীন্দ্রনাথ ২১টি পর্বে বিভক্ত করেছেন। ২১ পর্বের প্রথম পর্বের নাম 'গান'। গান পর্বে রবীন্দ্রনাথ মোট ৩২টি গান (১-৩২) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সে পর্ব থেকে কয়েকটি গানের উল্লেখ করতে চাই।

১। কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা।

২। সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা।

৩। আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান
তার বদলে আমি চাইনে কোনো দান ॥

৪। তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে ॥

৫। তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
বলেছে গান গাহিবারে।
ফুলে ফুলে তারায় তারায়

৬—

বলেছে সে কোন ইশারায়
দিবস-রাতির মাঝ কিনারায়
ধূসর আলোর অন্ধকারে ॥

৬। গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে
রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাঁদন জেগে ওঠে ॥

৭। আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥

৮। তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে ॥

৯। দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ,
আমি পাইনে তোমারে ॥

১০। হেথা যে গান গাইতে আসা আমার হয়নি সে গান গাওয়া
আজও কেবলি সুর সাধা, আমার কেবল গাইতে চাওয়া ॥

১১। আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান
দিয়ো আমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান ॥

১২। গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে
ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে ॥

১৩। গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি ॥

১৪। কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি
একলা ঘাটে রইব না গো পড়ি ॥

মোট ১৪টি গানের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করলাম। ৩২টিই করা যেতো। সবগুলো গানেই গান ও গান গাওয়া দু'টি বিষয়েরই উল্লেখ আছে। এই গান পর্বের বাইরেও শত শত পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, আনুষ্ঠানিক, বিচিত্র পর্যায়ের গানে গান ও গান গাওয়ার কথা আছে। আমরা ধরে নিই সাধারণভাবে যে, এখানে গান বা গান গাওয়ার কথা আছে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গান বা রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার কথা আছে। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজের গান গাওয়ার ব্যাপার আছে, তেমন আমরা ধরে নিই না। যেমন পূজা পর্যায়ের পঞ্চম গান 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান' চরণটি যখন আমরা পড়ি বা শুনি, তখন আমরা কোনো গায়কের কথা ভাবি নিশ্চয়ই, তবে তিনি নির্বিশেষ গায়ক। রবীন্দ্রনাথ নিজে গেয়ে শোনাচ্ছেন তেমন ভাবতে আমরা অভ্যস্ত নই। অবশ্য তেমন ভাবা স্বাভাবিকও নয়। কেননা এ সব উচ্চারণ কোনো ব্যক্তির সীমায় বদ্ধ নয়। এসব গানে গান বলতে চিরকালের গান, গায়ক বলতে চিরকালের গায়ক, শ্রোতা বলতে চিরকালের শ্রোতাকে বুঝি। রবীন্দ্রনাথকে কখনো এর মধ্যে টেনে আনা হয় না। তবে রচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনি আমরা, নানাভাবে গীতসমূহ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। রবীন্দ্রসংগীত বলতে আমরা রবীন্দ্রনাথের রচিত গান বুঝি। গায়ক হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে কখনো আমরা এর সঙ্গে যুক্ত করি না। তবে অনেক স্থানে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, তাতে মনে হয়, শুধু রচয়িতা হিসেবে নয়, গায়ক হিসেবেও তাঁর একটা স্থান থাকুক তেমন একটা ইচ্ছে তিনি পোষণ করতেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কথাচ্ছলে বলেছিলেন, "গলা এককালে ছিল বটে! গাইতেও পারতুম গর্ব করবার মতন। তখন কোথাও কোনো মিটিঙে গেলে সবাই চিৎকার করত, 'রবিঠাকুরের গান, রবিঠাকুরের গান' বলে। আজকাল রবিঠাকুরের গান বলতে বোঝায় তার রচিত গান, গীত নয়। তোমরা আমায় এখন একবার গাইতে বলেও সম্মান দাও না। যখন গাইতুম তখন গান লিখতে শুরু করিনি তেমন, আর যখন লিখলুম তখন গলা নেই।" এমন কথা তিনি জীবনে বহুবার বলেছেন। তাঁর এমন আরও কিছু স্মৃতিচারণমূলক বিবৃতি আমি উদ্ধৃত করব, তবে এই সঙ্গে আমার এমন ভাবা ভুল হবে না যে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর গানে গান গাওয়ার প্রসঙ্গটি আনেন তখন নিজের কথাও ভাবেন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁর গায়ক সত্তা এর সঙ্গে মিশে যায়। বিস্ময়করভাবে দীর্ঘকাল গায়ক হিসেবে তিনি যে প্রশংসা পেয়েছেন, নিজের গান গাওয়াকে তিনি নিজে যেভাবে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, তাতে তেমন ভাবা অস্বাভাবিক নয় মোটেও। ওপরে যে উদ্ধৃতিটুকু ব্যবহার করলাম এবং জানালাম যে, এমন করে নিজের কথা তিনি অনেকবার বলেছেন, তাতে এই উদ্ধৃতির সামগ্রিক সত্যাসত্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। "গলা এককালে ছিল বটে! গাইতেও পারতুম গর্ব করবার মতন"—এমন কথা তিনি বলতেই পারেন। তাঁর গান গাওয়ার যথেষ্ট প্রশংসার প্রামাণ্য বিবরণ যা-কিছু সংগৃহীত হয়েছে সেখান থেকে বাছাই করা কিছু বিবরণ উপস্থাপন করা যাবে। কোথাও কোনো মিটিঙে গেলে সবাই চিৎকার করত রবিবাবুর গান, রবিঠাকুরের গান, এ কথাও সত্য। স্মৃতিকথায়, পত্রিকার রিপোর্টে শ্রোতা-দর্শকদের এমন আবদারের বিবরণ পাওয়া যায়। আজকাল রবিঠাকুরের গান বলতে বোঝায় তার রচিত গান, গীত নয়, এ কথাও অতীব সত্যি। তবে যতটা

রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন: "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে বাল্যকালে গাঁদা ফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর-আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমার সেই অতুলপ্রেম-আননে' গান গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে।"

সত্যি এই ২০০৯ সালে এসে বা আরও ২০/৩০ বছর আগেকার জন্যে, ১৯৩৮ সালের জন্যে এ পর্যবেক্ষণ ততটা সত্যি নয়। তখনো এমন শত শত মানুষ ছিলেন কলকাতায় যাঁরা রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে নানা আসরে গান শুনেছেন, তখন রবীন্দ্রনাথের গাওয়া গানের সঙ্গে প্রৌঢ় বা প্রায় বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের গাওয়া গানের তুলনা করতে পারতেন। আমাদের শৈশবে ১৯৫০ সালের দিকে, বা তারও পরে আমাদের গ্রামে এমন কয়েকজন লোকের মুখে আমরা শুনেছি, তাঁরা কলকাতায় নানা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গান শুনেছেন, রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে পাওয়া যাবে বলেই তাঁরা সেসব অনুষ্ঠানে গেছেন, রবিবাবুর গান শোনার জন্যে অনেকের সঙ্গে দাবি তুলেছেন। নানা প্রতিষ্ঠিত মানুষের স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের গায়নশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁরাও ঠিক তেমনি বলতেন। তবে রবিবাবুর গান বলাটা উঠে গেছে বহু আগে, রবীন্দ্রনাথ যখন থেকে সভায় গান করছেন না, তখন থেকেই। রবিঠাকুরের গান, এভাবে দীর্ঘকাল ধরেই বলা হয় না। বলা হয় রবীন্দ্রসংগীত। এ গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত। রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার প্রসঙ্গটি এখন একেবারেই অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া সম্পর্কে এখন একটা নেতিবাচক ধারণা কাজ করে শ্রোতৃচিত্তে। যে কয়েকটি গান রেকর্ড করা এখন শুনতে পাওয়া যায়, সেগুলো এতই দুর্বল ও ভঙ্গুর যে, কাউকে বিশ্বাস করানো কঠিন যে, রবীন্দ্রনাথ চমৎকার গান গাইতেন, শত শত মানুষের সমাগমে মাইক ছাড়া গান করতেন, সবাই মুগ্ধচিত্তে তাঁর গান শুনতেন, রবীন্দ্রনাথ গান রেকর্ড করতে যাবেন একটি বাড়িতে সেজন্যে বহু ঘণ্টা আগে থেকেই সে বাড়ির চারপাশ মানুষে ভরে গেছে, বাড়িটা অ্যাভিনিউ থেকে বেরিয়ে আসা সরু রাস্তার ওপর, যারা বাড়ির চারপাশ পর্যন্ত যেতে পারেন নি তারা সরু রাস্তার মুখ থেকে লাইন দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছেন গায়ক রবীন্দ্রনাথকে দেখবেন বলে। সারা কলকাতা রবিবাবুর গান শোনার আনন্দে মাতোয়ারা। "তোমরা আমায় এখন একবার গাইতে বলেও সম্মান দাও না", এমন একটা কথা শুনলে যে-কারোর কষ্ট লাগতে পারে, একদিন যার গান শোনার জন্যে সভায় মানুষ ভেঙে পড়তো, এখন কেউ তাঁকে গান গাইতে বলে না। কী ভাবে বলবে, গান গাইবার শক্তিতো অবশিষ্ট নেই কণ্ঠে। তবু ডাক্তারের বারণ উপেক্ষা করেও রবীন্দ্রনাথ লুকিয়ে অনুষ্ঠানে চলে এসেছেন। ১৯৩৮ সালে এসে কে তাঁকে বলবে গান করতে, তখনতো তিনি গুরুদেব, গুরুঘাতী হতে যাবে কে? তবে রবীন্দ্রনাথের শেষ কথাটি একেবারেই সত্যি নয়: যখন গান গাইতুম তখন গান লিখতে শুরু করি নি তেমন, আর যখন লিখলুম তখন গলা নেই। একেবারেই সত্যি নয়। রবীন্দ্রনাথ বেমালুম ভুলে গেছেন কখন থেকে তাঁর গলা নেই। এ শুধু বেদনা প্রকাশের জন্যে বলা। এমন বেদনা প্রকাশ করাও অস্বাভাবিক নয়। সারা পৃথিবী আলোকিত করা জীবনমঞ্চ থেকে প্রস্থানের আগে এমন বেদনাতো মনকে আচ্ছন্ন করে দিতেই পারে।

সফল, সক্ষম, শ্রোতাদের কাছ থেকে আরও গান গাওয়ার দাবিতে উৎফুল্ল—গায়ক রবীন্দ্রনাথ এবং গলা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, জনসমাগমে গান গাইতে যে কুণ্ঠিত গায়ক রবীন্দ্রনাথ, এর ভেতরকার যে সীমান্তরেখা সে হচ্ছে ১৯২০। অনেকেই মনে করেন একে আরও কয়েক বছর টেনে নামিয়ে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সময়ে নিয়ে আসা যায়। অর্থাৎ ১৯১৩। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি বেড়ে যায় বিপুলভাবে, তিনি নানা সাংগঠনিক, সামাজিক রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হতে থাকেন যে,

আগেকার মতো গায়ক হিসেবে কোনো ভূমিকা পালন তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সময়ের সংকট সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরেও বহু অনুষ্ঠানে গান করেছেন ও প্রশংসা পেয়েছেন। ১৯২০ সালে এসে তো রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না, যখন লিখলুম তখন গলা নেই, ১৯১৩ সালে এসে বলতে পারেন না, এমন কি ১৯১০ সালে এসেও বলতে পারেন না, যদি আমরা সেই সীমান্তরেখাকে ১৯১০ সালে টেনে নামাই। ১৯১০ সালের উল্লেখ করছি বিশেষ কারণে। সে বছর গীতাঞ্জলি বা রাজা প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতনে রাজার অভিনয় হয় পর পর দু' রাত। অভিনয় করা ছাড়াও সব দিক সামলে ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ। তৃতীয় দিন বিকেলের গাড়িতে কলকাতা থেকে আগত অতিথিরা শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবেন। সকাল বেলা তাঁরা খবর পাঠালেন, রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে চান। রবীন্দ্রনাথ সংবাদদাতাকে বললেন, পর পর দু' রাতের খাটুনিতে কাহিল, গান গাইতে পারব কি? দ্বিতীয় চিন্তায় বললেন, ঠিক আছে ব্যবস্থা করো–গাইব গান। গান ধরলেন তো ধরলেনই, এক বসায় ৫০টি গান গেয়ে ফেললেন। ১৯১০ সালে এসে তো আর বলতে পারেন না, যখন লিখলুম তখন আর গানের গলা নেই।

এবার দেখা যেতে পারে ১৯১০ সাল নাগাদ যত গান তিনি লিখলেন, রচনাগত উৎকর্ষে সে সব রচনার উজ্জ্বলতার স্বরূপ কী। ১৯১০ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ প্রায় ১০০০ গান রচনা করেছেন। এরই মধ্যে গীতি রচয়িতা ও সংগীত রচয়িতা হিসেবে তাঁর বিস্ময়কর অর্জনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। শুভ গুহঠাকুরতা ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন। প্রতি স্তরের স্থায়িত্ব বিশ বছর। প্রথম স্তরকে বলা হয়েছে শিক্ষানবিশির স্তর, দ্বিতীয় স্তরকে বলা হয়েছে পরীক্ষার স্তর এবং তৃতীয় স্তরকে বলা হয়েছে পরিণতির স্তর। যে ধরনের রচনাকে আমরা পরিণত রবীন্দ্রসংগীত রচনা বলে জানি, সে সব-তাঁদের ধারণায় শেষের বিশ বছরের অর্থাৎ ১৯২১-১৯৪১ কালপর্বের রচনা। এ ধারণা সত্যি নয়। আগের ৪০ বছরেও রবীন্দ্রনাথ অসামান্য কাজ করেছেন। প্রথম বিশ বছরেও রবীন্দ্রনাথ অসামান্য সব কাজ করেছেন; যাদের ভেতর দিয়ে রচয়িতা হিসেবে তাঁর পরিপূর্ণশক্তিকে অনুভব করা যায়। স্তরবিভাজনের ভালোমন্দ আমার বর্তমান বিবেচনার বিষয় নয়। কথাটা আসলো এজন্যে যে, রবীন্দ্রনাথের বেলায় 'যখন লিখলুম' বলে কোনো কথা নেই। তাঁর ভানুসিংহের যে কয়েকটি পদ গান হিসেবে গাওয়া হয়, সে সব অতি উল্লেখযোগ্য রচনা। কীর্তন-টপ্পা-খেয়াল মিলিয়ে তিনি যে কয়েকটি সংগীতভঙ্গি গড়ে তুললেন ভানুসিংহের পদের জন্যে, সে এক বিস্ময়কর কাণ্ড। ১৬ বছর বয়সে ১৮৭৭ সালে তিনি ভানুসিংহের বৈষ্ণবপদ রচনা শুরু করেন, ১৮৮৪ সালে গিয়ে তেমন পদ রচনায় তিনি ইতি টানেন। আনুমানিক ১৮৯০ সালের দিকে গিয়ে তিনি নয়টি ভানুসিংহপদে সংগীত যোজনা করেন। এর বছর দুয়েক আগে

১৮৮৮ সালে তিনি রচনা করেছেন গীতিনাট্য *মায়ার খেলা*। কী অসাধারণ সব গান সে নাটকে, আধুনিক বাংলা গানের কী বিস্ময়কর সমারোহ *মায়ার খেলার* দৃশ্যক্রমে। একটা প্রচলিত ধারণা এবং আমি নিজেও এর আগে অনেক জায়গায় লিখেছি যে, আধুনিক বাংলা গান ১৯৩০-এর দশকের একটি ঘটনা। এর সঙ্গে রেকর্ড কোম্পানি, ফিল্ম কোম্পানির ব্যবসায়ী উদ্যোগের সম্পর্ক আছে। কিন্তু আসলে তা নয়, আধুনিক গান বলতে সংগীত রচনার যে মুক্তপদ্ধতিটি বুঝি তার প্রবর্তনা রবীন্দ্রনাথে। ত্রিশের দশকে এসে এর সঙ্গে বাজার-ব্যবসার প্রসঙ্গটি যুক্ত হয়, শ্রমবিভাজনের ধারণা স্থান পায়। কিন্তু প্রধান যে কাজ, আধুনিক গানের মুক্তরীতির সংগীতকলা নির্মাণ, সেতো রবীন্দ্রনাথ করেছেন আরও ৫০ বছর আগে। ১৯১০

সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্রুপদের ধারণাটি স্পষ্ট রূপায়িত করেন, তাঁর খেয়ালের, টপ্পার ধারণাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তিনি বাউলের নানামাত্রিক ব্যবহার গড়ে তোলেন, কীর্তন সংগীতকে নিজের মতো করে নিজের গানে যুক্ত করেন। অর্থাৎ সমগ্র সংগীত রচয়িতা রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়ে যাই। তাই 'যখন লিখলুম তখন গলা নেই' বলার কোনো অবকাশ নেই। গাইছেন আর লিখছেন, লিখছেন আর গাইছেন সেটিই যথার্থ কথা। এক সময় গিয়ে আর গাইতে পারছেন না, দম থাকে না, আওয়াজ আসছে না, এই যা। সেতো হতেই পারে, সবার বেলাতেই হয়।

তবু কেন এই গানের আকুলতা? ৩৪ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঋতুপরিবর্তনে প্রকৃতিতে যে আকুলতা জাগে তাতে বিস্ময় প্রকাশ করে একটি গান লিখেছিলেন: একি আকুলতা ভুবনে! একি চঞ্চলতা পবনে। রবীন্দ্রনাথের গানব্যাকুলতাও বিস্ময়কর। ১৯৪১ সালের মে মাসে তিনি রাণী চন্দকে বলেছেন অবনীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার কথা। বলছেন, "লোকের সৃষ্টিশক্তির ধারা কত প্রকারে প্রবাহিত হয় দেখ। ছবি আঁকত, তার পরে এটা থেকে ওটা থেকে, এখন খেলনা করতে শুরু করেছে। তবু থামতে পারছে না। আমার লেখার মতো। না অবনের সৃষ্টিশক্তি অদ্ভুত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিৎ আমারি। অবন আর যাই করুক, গান গাইতে পারে না– সেখানে ওকে হার মানতেই হবে।" এর পরে আর কী থাকতে পারে বলার, শুধু বিস্ময় প্রকাশ করা যেতে পারে যে গান গাওয়ার ব্যাপারটা কিছুতেই রবীন্দ্রনাথকে রেহাই দিচ্ছে না। সারাক্ষণ শুধু গান গাইতে ইচ্ছে করছে, যেন শুনতে পাচ্ছেন 'রবিবাবুর গান, রবিঠাকুরের গান' বলে চারদিক থেকে শ্রোতার দল চিৎকার করছে, উৎফুল্ল-মেজাজে তিনি একের পর এক গান গেয়ে যাচ্ছেন। আমার এই গান গাওয়াতেই আনন্দ, এ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতম কথা।

জীবনস্মৃতিতে জানাচ্ছেন যে, গান গাইতে পারেন না এমন কোনো সময়ের কথা তাঁর মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন: "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে বাল্যকালে গাঁদা ফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর-আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমার সেই অতুলপ্রেম-আননে' গান গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে।"

চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্বচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকর্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে এক মুহূর্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়। এই সমস্ত চোখে দেখার রাজ্য গানে শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা কী নতুন অর্থ লাভ করে। হঠাৎ মনে হয়, আমরা যে জগতে আছি বিশেষ করিয়া কেবল তাহার একটা তলার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখিয়াছি, এই আলোকের তলা, বস্তুর তলা– কিন্তু এইটেই সমস্তটা নয়। যখন এই বিপুল রহস্যময় প্রাসাদে সুর আর একটা মহলের একটা জানলা ক্ষণিকের জন্য খুলিয়া দেয় তখন আমরা কী দেখিতে পাই! সেখানকার কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের নাই, সেই জন্য ভাষায় বলিতে পারি না কী পাইলাম– কিন্তু বুঝিতে পারি সে দিকেও অপরিসীম সত্য পদার্থ আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দিত জাগ্রত শক্তি আজ প্রধানত বস্তু ও আলোক–রূপেই প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া আজ আমরা এই সূর্যের আলোকে বস্তুর অক্ষর দিয়াই বিশ্বকে অহরহ পাঠ করিতেছি, আর কোনো অবস্থা কল্পনা করিতে পারি না– কিন্তু এই অসীম স্পন্দন যদি আমাদের কাছে আর কিছু না হইয়া কেবল গগনব্যাপী অতি বিচিত্র সংগীত রূপেই প্রকাশ পাইত, তবে অক্ষর রূপে নহে, বাণী রূপেই আমরা সমস্ত পাইতাম। গানের সুরে যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠে, তখন অনেক সময় আমার কাছে এই দৃশ্যমান জগৎ যেন আকার-আয়তনহীন বাণীর ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে-তখন যেন বুঝিতে পারি, জগৎটাকে যেভাবে জানিতেছি তাহা ছাড়া কত রকম ভাবেই যে তাহাকে জানা যাইতে পারিত তাহা আমরা কিছুই জানি না।

বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভর্তি হতে হলো। বিষ্ণু যে গানে হাতে খড়ি দিলেন, এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলায়। দুই একটা নমুনা দিই–

এক যে ছিল বেদের মেয়ে- এলো পাড়াতে

সাধের উল্কি পরাতে।

আবার উল্কি পরা যেমন তেমন,

লাগিয়ে দিল ভেল্কি-

ঠাকুর ঝি!

উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি

ঠাকুর ঝি!

আরও কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে, যেমন-

চন্দ্র-সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জ্বালে বাতি।
মোঘল পাঠান হদ্দ হলো, ফার্সী পড়ে তাঁতি
গণেশের মা, কলা বৌকে জ্বালা দিও না,
তার একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানাপোনা।

অতি পুরানো কালের ভুলে যাওয়া খবরের আমেজ আসে এমন লাইনও পাওয়া যায়, যেমন-

এক যে ছিল কুকুর চাটা শেয়াল কাঁটার বন
কেটে করলে সিংহাসন।

এখনকার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে হারমোনিয়ামে সুর লাগিয়ে সারেগামা সাধানো, তারপরে হালকা গোছের হিন্দি গান ধরিয়ে দেওয়া। তখন আমাদের পড়াশোনার যিনি তদারক করতেন তিনি বুঝেছিলেন- ছেলেমানুষি ছেলেদের মনের আপন জিনিস, আর ওই হালকা বাংলা ভাষা হিন্দি বুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে জায়গা করে নেয়। তা ছাড়া এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া-তবলার বোলের তোয়াক্কা রাখে না, আপনা আপনি নাড়িতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মনভোলানোর গান শোনানোর শুরু সেই ছড়ায়- এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।

তখন হারমোনিয়াম আসে নি এদেশের গানের জাত মারতে। কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যেস করেছি। কলটেপা সুরের গোলামি করি নি।

আমার দোষ হচ্ছে–শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশিদিন চালাতে পারে নি। ইচ্ছেমতো কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছি, ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকতো তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারতো না। কেননা সুযোগ ছিল বিস্তর। যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা, ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনা ভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি। কখনো কখনো যখন মন আপনা থেকে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বিহাগের আওড়াচ্ছেন 'অতিগজগামিনীরে', আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি। সন্ধ্যে বেলায় সেই গান শুনিয়ে অবাক করা খুব সহজ কাজ ছিল।

আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠ বাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলীর তেল মেখে স্নান করতেন; হাতে থাকতো গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে; গুন্ গুন্-গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চারদিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন; নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড় বড় চোখ জ্বল জ্বল করতো, গান ধরতেন- 'ম্যায় ছোড়ো ব্রজকি বাঁশরী'। সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।...

তার পরে যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড় ওস্তাদ এসে বসলেন, যদুভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই- সেই জন্যে গান শেখাই হলো না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে চুরিয়ে। ভালো লাগলো কাফী সুরে 'রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া'; রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে।

গান সম্বন্ধে শ্রীকণ্ঠ বাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল- 'ম্যায় ছোড়ো ব্রজকি বাঁশরী'। ওই গানটি আমার মুখে সকলকেই শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝঙ্কার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক, 'ম্যায় ছোড়ো', সেইখানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালো লাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।

ইনি আমার পিতার ভক্ত বন্ধু ছিলেন। ইহারই দেওয়া হিন্দি গান হইতে ভাঙা একটি ব্রহ্মসঙ্গীত আছে-
'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলো না রে তাঁয়'। এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝঙ্কার দিয়া একবার বলিতেন 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে', আবার পাল্টাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে'।

ক্রমশ

আবুবকর সিদ্দিক

অশনিধ্বনি

প্রণয় ও কাম   এতদিন কবিতায় মিশে ছিল
নদী ও বাতাস   দারুছায়া   মেঘের নিক্কণ।
খর্‌র্‌র্‌   করাতচেরাই হচ্ছে অস্তিত্ব   জন্মধন
নিজেই নিজের গলায় ফাঁস নিচ্ছে সুকুমারী বনলতা
চারুলতা
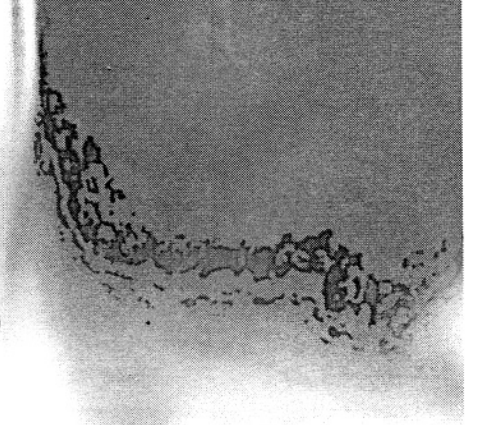
বৈতালিক দোয়েলশ্যামা আর কবিতালাপে
মুখর করবে না বাংলাসকাল। লোলুপ উজান
গ্রাস মেলে শুষে নিচ্ছে নিখিল জলধারা। যদি নদীই
না থাকে, যদি অমোঘ মরুকরণ, প্রাণধর্ম উহ্য হয়ে যাবে।
পড়ে রইবে পাঁজরের পরিত্যক্ত খোল। লুপ্ত হয়ে যাবে
ভালোবাসাবাসি। রক্তচক্ষু চণ্ডালেরা টুঁটিমূলে ছুরি ধরবে।
দিগম্বর ঘরদোর   কতিপয় প্রেতশূন্য সানকি মেলে ধরে
কপাল চাপড়াবে। হে আমার প্রপৌত্রগণ!
দুর্বলের অধিকার নেই বাস্তুভিটে ধরে রাখবার। চোরাবালি আর
ক্যাকটাসে ভরে যাবে মরা পদ্মা বিধবা যমুনা।

আমি এখুনি শুনতে পাচ্ছি মরুনরকের
পদধ্বনি। বেহুঁশ সমাজ উৎসবমত্ত এদিকে। খেউড়বিলাসী।
নেভার আগে আখেরি জ্বলন প্রদীপের। এদিকে বেহুঁশেরা
শরাব ঢেলেই চলে। ওদিকে পায়ের তলায়
খটখটে শুকনো খাঁড়ি কঁকায়।

শ্যামলিমা! ধাত্রীমা আমার! আমি তোমায়
ধরে রাখতে পারি নি। কানে এখনো আছাড় খাচ্ছে
তোমার বিদায়আর্তনাদ : শেষ হয়ে যাচ্ছি আমি
লুট হয়ে যাচ্ছি আমি

চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছ?

পিয়াস মজিদ

ফুলবন থেকে

নক্ষত্রফুল ঝরে। অন্ধকার। কারণ সকল
ফুলের মাঝে রাত্রিই শাশ্বত। রাত থেকে
আমি মুছে গেলে শুধু সমুদ্র থাকে, আমি-
হীন জলভূমির দোসর তুমি। তখন দিগন্তে
উড্ডীন পাতাল-ছায়ারা। আর জলদাসের
কবর খুঁড়ে পেয়ে যাও আমারই সব
আঁতুড়কালীন ধ্বনি।

দিলওয়ার

কালের চারণ কণ্ঠে শ্রুত হয়

কী লিখবো কবিতা ? বড়ো ম্লান সবিতার মুখ
হাঁটু গেড়ে তার দিকে নিষ্পলক সূর্যমুখী,
সূর্যমুখী সর্বাঙ্গে তার ধরে আছে সামুদ্রিক ঘ্রাণ
ফুসফুসের সঞ্জীবনী সুখ !

অক্সিজেন এসেছিল পুষ্পবৃক্ষ হয়ে
সাগরের লোনা জলে,
সেই কবে ? পুরাতত্ত্ববিদ !

জেলিফিস ধীরে কাছে আসে
লক্ষ কোটি বৎসরের আয়ু-র দলিল !

স্পার্টা-র বীরত্বের গাঁথা
কালের চারণ কণ্ঠে শ্রুত হয়–
পশু-র বিবর থেকে বহির্গত হও
যৌবনের পুত্রকন্যাগণ,
চৌদ্দ কোটি বসন্তের ধ্রুপদী সংগীত
তোমাদের দুরন্ত জীবন্ত বিস্ফোরণ চায়
শ্বাপদসংকুল জনারণ্যে, নুহের বন্যা চায়,
দুর্নিবার দৌড় চায় ফেডিপাইডিসের–
তোমাদের যূথবদ্ধ চরণে চরণে !

নিধনের অস্ত্র শস্ত্র দু' পক্ষেই বিদ্যমান থাকে–
শুক্লপক্ষে আদি ও অকৃত্রিম মানবতা ...
কৃষ্ণপক্ষে মিত্রঘ্ন বৈরিতা !
মানুষের প্রামাণ্য ইতিহাস–
জনতার বর্ণশিক্ষা হোক ... ।

আফরোজা সোমা

শ্রাবণে মাটির নয়ন

ঝরঝর বরষায় কেঁদে ওঠে রক্তের ফুল
কোথায় সোনালু লতায় মেঘ ভেঙে
জেগেছে চাঁদ–
ভেঁজা হাওয়া তার কোনো রাখে নি খোঁজ–

খোঁজ তার ছিল না বলেই
ঘর ছেড়ে নেমেছে পথে মাটির নয়ন
নয়নে বিরতি টেনে
সোনামুখি একটি সাঁকো
পুষছে হীরামাখা অন্ধকার–

ঘোরলাগা গান তাই শ্রাবণে
একা একা গালিচায় ঝরছে–

বেলাল চৌধুরী

নীরবতা সোনালি

আমাদের এই পুরোনো পাঁচিলে বড় বেশি রোদ,
মনকে যে দু'দণ্ড জিরোতে দিই তাও প্রায় অসম্ভব–
এত বেশি শূন্যগর্ভ অকেজো হাওয়া–
বাসনা ও নিষ্ফলতার মাঝে কতোটা হৃদয়বত্তা
কবিতা ও অশ্লীলতার মাঝে কতটা সারবত্তা
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট আঁধার কেবল;
এমন কি কার্তিকের চাঁদও ঐ
রতিসুখে কেমন পড়ছে ঢলে মেঘের রেশমে।

ক্ষুধা
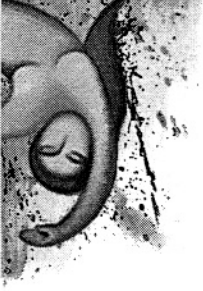
নিমীলিত নয়নে নিরখি
শিয়রে দাঁড়িয়ে অমন অনড়– কে ও?
কী চাও কতটা চাও বল-বল শত বেণু বীণা রবে
– অবসন্ন ক্ষীণ কণ্ঠ নিরুত্তর।
কে তুমি, সুধোই ফের
দুরু দুরু বক্ষ, অন্তরাত্মা কম্পিত, নির্বাক
হাসির বদলে মুখে তার প্রহেলিকা
ঠুলি আঁটা চোখ, বুলিহীন মুখ
– যেন পেটে বেঁধেছে পাথর!

ওবায়েদ আকাশ

ম্যাজিক

সুমসৃণ ফুটবলগুলো হাতের ভেতর উঠছে আর নামছে। নামছে আর উঠছে খুব দ্রুত : এই খেলা প্রথমত ম্যাজিক বলে পরিচিত– জানি। আসলে ম্যাজিক ব্যাপারটিই আমাদের কাছে একপ্রকার ম্যাজিকের মতো। যেমন শরীর থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে আবার তা কবন্ধ শরীরে জুড়ে দেবার পদ্ধতিকে জাদুকর তো ম্যাজিক বলেই গিলিয়ে দেন আমাদের। আবার বাহু থেকে কব্জি বিচ্ছিন্ন করে আবার তা জুড়ে দেবার ব্যাপারটি ঐ একই রকম-তো! অথবা হঠাৎ ফুঁসে-ওঠা সমুদ্র-তরঙ্গে অবারিত জনপদ মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হবার এ-প্রকার প্রাকৃতিক পদ্ধতিকে ম্যাজিক বৈ কী-ই-বা বলা যায়! বলবে কী তাকে– পদ্মার বিক্ষিপ্ত গ্রাসে বা তুমুল বর্ষণের রাতে যে পাহাড়ের চাঙড়ের নিচে অগণিত প্রাণ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল! অথবা ম্যাজিক কি তাই– যা তোমার অস্তিত্বের শেকড়ে শুয়ে দীর্ঘকাল বট-পাকুড়ের স্নেহে প্রলম্বিত হলো, আর একদিন তা অনিবার্য যুদ্ধের বাহানা তুলে গ্রেনেড বা বোমার অবয়ব পেয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরে ঘরে ঘুমন্ত শিশুদের ওপর? আর এ-ও এক ম্যাজিক্যাল ব্যাপার যে, পৃথিবীতে তাবৎ আলোর উৎস– প্রকাণ্ড সূর্যের শরীর যখন ঢেকে যায় ক্ষুদ্রাতি মেঘের আড়ালে আর তার শরীরের অবারিত ক্ষতে নেমে আসে রক্তের অজস্র প্রস্রবণ শুধু...আর তাকেই বর্ষণ ভেবে আমরাই যখন আমোদিত হই! অথবা আজ কিংবা আরও আরও উত্তরকালের প্রভাবিত অনিবার্য সাহিত্য-প্রকরণ বলো– যা আমরাই রচনা করি, ধরো সেই ম্যাজিক রিয়্যালিটি– যাকে আমরা যাদুবাস্তব প্রবণতা বলে কতিপয় পুচ্ছধারী ময়ূরীর পায়ে ঘোড়ার পা জুড়ে-গেঁথে আকাশে উড়িয়ে দিয়ে বলি : পৃথিবীতে রণক্লান্ত মানুষের মুখে ফুটে-ওঠা চিন্তার রেখায় যে সভ্যতা বিভাজিত হলো, আজ কিংবা কাল ভূরাজ্যের শান্তির জাদুকর দেখো বিভাজিত বলিরেখা ফুঁড়ে আকাশে উড়িয়ে দেবে ঝাঁকে ঝাঁকে শ্বেত পারাবতগুলি! এইভাবে, আরও এক ম্যাজিকের কথা বলি– পৃথিবীতে শ্রেণিগত সম্বন্ধগুলি যেভাবে নির্মিত হতে থাকে, পরস্পর–
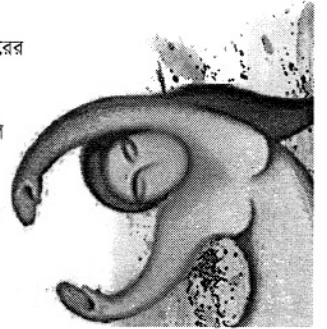
মহাদেব সাহা
একুশ শতকে মানুষ যেভাবে বেঁচে আছে

মনে আছে ভাপা পিঠার গন্ধে ম-ম করা শীতকাল ?
ইস্টিশন থেকে যে লোকটি ফিরে যেত
সে টিকিট ঘর চিনতো না
রেলগাড়ির বাতি দেখে ভাবতো অগ্নিকাণ্ড
আমাদের সেইসব দিন এখন টিভির সিরিয়াল,
ববকাট চুলের মেয়েরা দেখে খিলখিলকরে হাসে
এই নিয়ে মেতে আছে একুশ শতকের মানুষ।

সেই জলাশয়, পদ্মপুকুর ভরাট হয়ে গেছে
ঘুঘু পাখির সেই বিষণ্ন দুপুরগুলো নেই,
আজ সৌন্দর্যের বদলে মানুষ দেখে পণ্য, শস্যের
বদলে শোকের
আমাদের বুকজুড়ে ছিল বর্ষা, এখন খাঁ খাঁ চৈত্র,
সৌরভ ও সৌন্দর্য থেকে মানুষ আজ কত দূরে ;
তার চোখে এখন কাগজের নোট, শপিংমল,
ফ্লাটবাড়ি

ফুলের গন্ধ, পাখির ডাক, ঝমঝম বর্ষা
চোখের সেই একবিন্দু অশ্রু,
এসব কিছুই আর নেই, সিঁড়ি, শব্দ, শ্যালোমেশিন,
জেনারেটর
একুশ শতকে মানুষ এভাবে বেঁচে আছে।

আলফ্রেড খোকন
নগর

জানালা দিয়ে একটি হাত উপুর হয়েছে বাইরে
কাঁঠাল গাছের পাতারা তখন এক একটি তালু
জানালার অর্ধেক হাতটি তখন মায়ায় জমেছে
বাইরে দারুণ শ্রাবণ
আমার দেশে শ্রাবণ লিখলে বৃষ্টি লিখতে হয় না

জানালার হাতটি আমরা আসলে কখনো দেখি নি
কারণ মুখ দেখতে পেলে হাতের ধারণা সহজ হয়
হাত দেখে মুখ চেনা যায় না;

আমাদের দেশে
কৃষকেরা সকাল দেখে বলে দেন দিনের আভাস
মেঘ দেখে বলেন দেন বৃষ্টি ও বাতাস
আবহাওয়া অফিস শুধু সম্ভাবনা বলে!
যেমন করে বৃষ্টির জানালায় অর্ধেক হাত দেখে
বলা যায় যেকোনো নগরের নাম।

হাবীবুল্লাহ সিরাজী
যমজ প্রণালী ২৩/৫০

(৪)
তলপেটে তপ্ত আড়, খাটা রঙে ভরা পুষ্করিণী
মালিনী বোঝে না বেলা ; সূক্ষ্ম ঘামে তৃষ্ণার্ত চুচুক
টাল খেলে গুপ্ত মন্ত্রে এলোমেলো কাঁপে ছায়ামুখ–
জলের সংসারে মজা সবুজের কামিনী-কৌশল
ধীরে শ্বাস নেয় ; ভেতরে যে কোলাহল তার ঘাই
শিরায়-শিকড়ে বেড়ে পূর্ণ করে ভৌত ফলাফল ।

গরমে ঢোঁড়াও কাবু, বাবু হয়ে বসে থাকা মাগ
রাতে যে মাতাল ছিল তার জেরে আঙুল নাচায়–
শুয়োর বেরিয়ে গেছে, কচুক্ষেতে ধাঙরের লাশ
দেখা মানে জলে মেশা, মেশা জলে ডুবিতেছে পোকা
মালিনীর কলস উপুড়– এ্যাম্বুলেন্স ফিরে গেলে
তক্কে-তক্কে বৃক্ষও বাগান হবে দুই পক্ষ পরে !

জুনান নাশিত
বিরোধ

সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তের মলাটটা ছিঁড়ে গেছে
লাগাতে পারো নি
আজ কাল না হয় পরশু....
চুপসানো সময়ের পিঠে চড়ে
ধারালো ছুরির গতিস্নিগ্ধতায় জীবনের বাঁকগুলো শুধু বদলালো
চোখের কোটরে স্থিত হলো মৌলিক বিরোধ
ভৌতিক প্রচ্ছদ জুড়ে পরস্পরে সঙ্গচাতুর্যের যে খোলস
এতদিন দিগন্তবিস্তারী ছিল
তা-ই আজ গভীরতাকামী; ভূমির অতল খাঁজে অন্ধকারমুখী ।

অশ্রুতকান্নার মেঘে কী ভীষণ ভারী আমাদের ইচ্ছেমায়া
ছেঁড়া মলাটের মতো নির্বীর্য নিরন্ন
বুকশেলফের কোণে পড়ে থাকে স্পর্শহীন
জমে থাকা বেখেয়ালী ধুলোর মতন ।
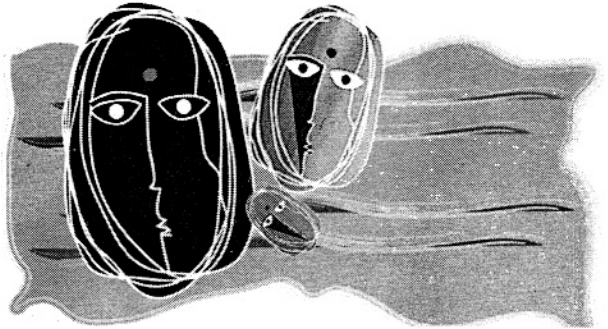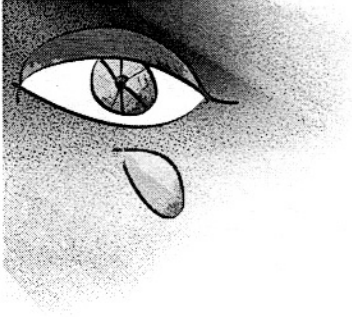
মুহম্মদ নূরুল হুদা

বউদি মলিনা

সাদা ডানা, কোথায় যে উড়ে গেছো
আমাদের সুহাসিনী বউদি মলিনা!

তোমাকে দেখিনি আমি হোম্‌সের
বিদ্যাপীঠে সেবাশীলা নিয়মবালিকা,
সূর্যঘড়ি দেখে দেখে শিখেছিলে
কর্মধর্ম; কৈশোরের বাড়ন্ত আঙিনা
পার হয়ে তপনরশ্মির ঘরে সাতপাকে
বাধা; হাতে হোমাগ্নির শিখা;
তাপিত জীবনে তুমি যখন শিক্ষিকা
হলে, কোনো ঘর নয় আর পর;
পতির সংসারে সতী, পেলে পুত্র
'স্বাগত', 'সম্রাট; পেলে জোড়া বর;
তোমারও তো জানা ছিল যৌথযাত্রা,
জন্মমৃত্যু, সহগমনের সঠিক ঠিকানা,
সজ্ঞযাত্রা সুখযাত্রা, পতিবস্ত্রে বাধা ছিল
তোমারও তো সারসের ডানা;

সেই তুমি উড়ে গেলে দিনান্তের শয্যা
ছেড়ে সদর দরোজা ছেড়ে বেদী ছেড়ে
চিতার চন্দন জানে বিরুদ্ধ বাতাস পেলে
গঙ্গাপাড়ে মুখাগ্নির শিখা যায় বেড়ে

কাজী রোজী

ভিতর বাহির

ঘর থেকে বেরিয়েই সূর্যের মুখোমুখি তোমরা
ঝলসানো রোদের তুমুল আমন্ত্রণ সেখানে কিম্বা মেঘ বৃষ্টির।
কুষ্ঠরোগীর মতো, বেদনার কাঁটা নিয়ে
আমি অন্তঃপুরে; যেন মাদকতা দিয়ে ঘেরা
সমস্ত শরীরটা আমার কালো নেকাবে মোড়া
আমার কোন উপায় নেই–
তোমাদের সাথী হয়ে যেতে পারিনে।

এই কি তবে মৃত্যু-ধ্বংসের পরিণত ছায়াঘর!
আমার নিশ্চিন্ত আবাস!

বাইরের চারিদিক বললো আমায়,
না
　　　না
　　　　　　না
ধ্বংস-মৃত্যু নেই তোমার সাথে।
আমাদের সাথে তার বসবাস।
এই যে বিশাল ব্যাপ্তি...
নদী, বন কোটি কোটি মানুষের সাজানো চিত্রণ
এখানেই সমুদয় নিঃশ্বাস থাকে।
নদী শুকায় মৃত্যু নামে
বন উজাড় হয় ধ্বংস নামে
মানুষের নিঃশ্বাস নিঃশেষ হয়ে যায়
　　　　　　ধ্বংস-মৃত্যুর ছায়াঘরে

বন্ধু তুমি কোথায় ভেতরে না বাইরে।

রেজাউদ্দিন স্টালিন

প্রশ্ন ওঠে

প্রশ্ন ওঠে দ্বিগ্বিদিকে প্রশ্ন ওঠে অন্তরিক্ষ জলে
কেন এই অপূর্ণ যাপন, অপূর্ণ বেঁচে থাকা কেন
পূর্ণাঙ্গ স্বপ্নবীজ বপন করতে গেলে প্রশ্ন ওঠে
নাম কি বৃক্ষের গোত্র পরিচয় পাতা ও কাণ্ডের কি কি শ্রেণীভেদ
কে পিতা মাতা মাতামহী কোথায় নিবাস

আমি যে মানুষ এটাই যথেষ্ট নয় সুসভ্য সমাজে
আমি যে স্বাধীন, ঔরসের চেয়ে আভিজাত্যবান
বাক ও বিবেক দিয়ে মানুষকে মাপি
তবু প্রশ্ন ওঠে, প্রশ্ন ওঠে ঈশানে নৈঋতে
প্রশ্ন ওঠে উত্তর অগ্নিতে, প্রশ্ন ওঠে অধঃ উর্ধ্বে
নিঃসঙ্গ আরশির দাঁড়ে
প্রশ্নবিদ্ধ রক্তাক্ত হৃদয় মেলে ধরিঃ
তখন আর আমাকে দেখি না
দেখি অসংখ্য অজস্র ক্ষতমুখ নেকড়ের বাড়ি
দম দেয়া দৈত্যের হৃত সংসার, কথা নেই
নিকথা নীরব তারা ক্রীতদাস ফারাউ রাজার

শুধু এই মূকদেশে প্রশ্নহীন প্রাণীদের রবোট স্বভাব
আগেই জানান দিই মূকদেশে আমার কর্ম শুধু
ঘরে ঘরে উচ্চারণ আলিঙ্গন উত্তেজনা দেয়া
প্রশ্ন ওঠে এও কি আমার দেশ
বামুনের আস্ফালন আর
দিকে দিকে জিঘাংসার জিহ্বা প্রবাহিত

হ্যাঁ, এইতো আমার দেশ আকাশের অস্থি যার পূর্বপুরুষ
চাঁদের ভ্রূর মধ্যে হেসে ওঠে রাত
দিন পেকে ওঠে ক্ষুধা-প্রার্থনায়
আর সাম্রাজ্যের সৈন্য এসে আজো
খোঁজ করে কথার কম্পাস

প্রশ্ন ওঠে কথা কার আমি বা কাহার
প্রশ্ন ওঠে দিকচক্রবালে নক্ষত্রে তারায়
বাক যুদ্ধে প্রশ্ন আরো তীব্র হয় প্রতিধ্বনি হয়
আমি কি প্লবমান প্রশ্ন কোনো স্বদেশ স্বজাতি
জন্মাবধি আমার হৃদয় তীক্ষ্ণ ছুরির নিচে দণ্ডিত কেন

হারিসুল হক

ঢেউয়ের সাকিন

চর কী কালের সাক্ষী নীল অই মেঘনাজলে
নিয়েছে স্মৃতিকে টেনে তার বুকে অতল গহনে?
ভেসেছে বর্ণমালা মতিহারা মায়ের মতো
সকরুণ আবেগ উচ্ছ্বাসে ? চর কী কালের সাক্ষী
গাঙে ভাসা আর্ত বয়া?

আমার স্বপ্ন মাঝে কাতর একটি চর নোয়া

আঁধিচ্ছন্ন ঘুম ছেড়ে হঠাৎ কখনো
জেগে উঠি আমি, জেগে ওঠে ঘোড়া
আশ্চর্য নীলিমাতলে। অসহ শরীর ভেজে
অতীন্দ্রিয় ঘামের প-াবণে

মানুষ কী দেখতে পায় বর্ণচোরা ঘাসের আবাদ
নাকি দেখে চোরা ঢেউ চরের মাটিতে তুমুল আছড়ায়
–যেভাবে আকাঙ্ক্ষার মাছ শোণিতে লোটায়

মানুষ কী ভাঙতে পারে মেঘ আর বৃষ্টির দুঃসহ সীমা
মানুষ কী ছিঁড়তে পারে নুড়ি ও নদীর প্রেমবন্ধন?
মানুষ কী পায় খুঁজে সান্ত্বনার আরাধ্য চাবি
আর কোনোদিন
ভেসে যায় হাঁস বয়ে যায় পানা
গোত্রহীন সাগরের অবুঝ টানে

এ বইটি পড়বেন না

মনজুরে মওলা
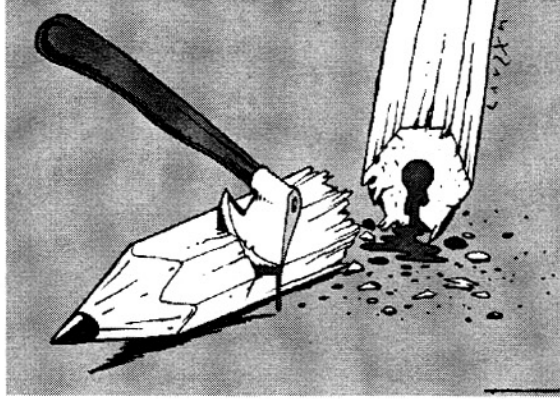
এ বইটি পড়বেন না ? কেন পড়বেন না ?

কোথাকার কোন এক লোক, তার আবার মন জুড়ে ময়লা, সে বইয়ের মলাটে লিখে দিলো, এই বইটি পড়বেন না, আর আপনি তা মেনে নিলেন ? এটি কেমন করে হয় ? আপনি, পাঠক, খুবই বুদ্ধিমান, আর আপনি, পাঠিকা, শুধু বুদ্ধিমতীই নন, অপরূপ সুন্দরী, শুধু সুন্দরীই নন, পাঠককে চালান, একজনকে তো নিশ্চয়ই, একের বেশিও হতে পারে, পাঠক আপনার কথায় ওঠেন আর বসেন, এমন দারুণ লোক আপনারা, সেই আপনারা একজন লোকের কথা শুনে এই বইটি না পড়ে থাকবেন ? এমনটি হতেই পারে না। আপনাদের আত্মসম্মানবোধ আছে, শুধু যে আছেই তা নয়, সে-আত্মসম্মানবোধ খুবই প্রখর, আপনারা কারও কথায় চলেন না, নিজেরাই সব দেখেশুনে নেন, যাচাই করে নেন, এ বই তো আপনাদের পড়তেই হবে। যদি লোকের কথা শুনে বইটি না পড়েন, আপনাদের আত্মসম্মানবোধ কোথায় থাকবে ? যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, 'অমুক বইটি পড়েছেন ?', কী জবাব দেবেন ?

যে-লোকটি আপনাদের এ বইটি পড়তে মানা করছে, তাকে আপনারা চেনেন? আমার ধারণা এ লোকটি পাজির পা-ঝাড়া। তার নিশ্চয়ই কোনও গোপন উদ্দেশ্য আছে। যদি তেমন উদ্দেশ্য না-ই থেকে থাকে, তাহলে সে কেন চাইবে না যে, এ বইটি আপনি পড়ুন ? তার মানে, সে শুধু পাজির পা-ঝাড়াই নয়, মহাষড়যন্ত্রকারী। কোনও কোনও দেশে এখন তো ষড়যন্ত্রের যুগই চলছে। বলা যায়, ষড়যন্ত্রতন্ত্র সে-সব দেশে পাকাপোক্ত আসন গেড়ে বসেছে– আঙুল ফুলে কলাগাছ হবার মতো ফুলে-ফেঁপে চারদিক জাঁকিয়ে বসেছে, কবির ভাষায়

পত্রেপুষ্পে পল্লবিত হয়ে চলেছে। এক মন্ত্রীর কথা বলি, তিনি তখন মাত্র মন্ত্রী হয়েছেন। মন্ত্রী হলে প্রথম যে কাজটি করতে হয় তা হলো, মন্ত্রণালয়ের এবং মন্ত্রণালয়ের নিচে যে-সব বিভাগ কিংবা সংস্থা থাকে সেগুলোর হোমড়া-চোমড়া লোকজনকে ডাকা, তাঁদের ডাঁটানো, সদুপদেশ দেয়া, এই প্রথম রাতে বেড়াল মারার মতো ব্যাপার আর কি ! এই মন্ত্রী কদিন আগে কি করে যেন আঙুলে ব্যথা পেয়েছিলেন, আঙুলে মোটা ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়েছে, আঙুলটা ফুলে আছে। সে-আঙুল নাড়িয়ে-নাড়িয়ে মন্ত্রী বক্তৃতা করছিলেন, নরম-গরম কথা বলছিলেন, লোকজনকে শাসাচ্ছিলেন। তাই না দেখে পেছনের সারি থেকে একজন বলেই বসলেন, আঙুল ফুলে কলাগাছ হবার কথা এতদিন শুধু বইয়েই পড়েছি, এবার চোখেও দেখলাম। যে-লোকটি আপনাকে এই বইটি না পড়ার কথা বলছে, সে-ও আপনাদের দিকে অমনি ব্যান্ডেজ বাঁধা আঙুল নাড়ছে না তো ? সুধী পাঠক-পাঠিকা, ব্যাপারটি ভালো করে ভেবে দেখুন, এই লাফাঙ্গা ধরনের লোকটির কথায় ভুলবেন না।

এ লোকটির এতো বাড় বাড়লো কী করে ? বাড়বে না-ই বা কেন ? বলেছি না, এটি ষড়যন্ত্রের যুগ, আর এ লোকটি মহাষড়যন্ত্রকারী ? এটি এমন এক সময় যে, কেউ যদি নির্বাচনে জেতেন, তাহলে বলা হয় তিনি ষড়যন্ত্র করে নির্বাচনে জিতেছেন। কেউ যদি নির্বাচনে হারেন, তাহলে বলা হয় ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হারানো হয়েছে। মুশকিল হলো, নির্বাচনে তো হার কিংবা জিত ছাড়া আর কিছু নেই। জিতলেও ষড়যন্ত্র, হারলেও ষড়যন্ত্র। প্রার্থী হারুন বা জিতুন, ষড়যন্ত্র জিতবেই। না, না, ভুল হলো। নির্বাচনে হার-জিত ছাড়া আরও একটা জিনিস আছে – বসে পড়া, প্রার্থী হয়েও শেষ অব্দি টিকে না থাকা। এখানেও বিপদ। কেউ যদি বসে পড়েন, তাহলে বলা হবে তাঁকে জোর করে– তার মানে, ষড়যন্ত্র করে– বসিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রার্থী যদি বলেন, না, তেমন কিছু ঘটে নি, তিনি নিজেই এবং নিজের ইচ্ছেতেই বসে পড়েছেন, তাহলে বলা হবে, তিনি নিজেই ষড়যন্ত্র করেছেন, ষড়যন্ত্র করে বসে পড়েছেন। ষড়যন্ত্রই যদি না হবে, তাহলে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন কেন ? তিনি কিছু লোকজনকে তাঁর পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য রাজি করিয়েছেন, এখন তিনি চান ওই ভোটগুলো অন্য একজন পাক। তিনি প্রথম থেকেই ষড়যন্ত্র করে এসেছেন। শুধু ষড়যন্ত্র করেনই নি, এমনভাবে করেছেন যেন কেউ টের না পায়। তাঁর অপরাধ ভীষণ– সবাইকে ফাঁকি দিয়েছেন, বোকা বানিয়েছেন।

যে-দেশে ষড়যন্ত্র হয়, তেমন দেশে যদি কখনও যান, পুরু নীল কাগজ সঙ্গে নিতে ভুলবেন না। এ জিনিসটির সেখানে ভীষণ চাহিদা। সরকার রেশন করে দিয়েছে, কেউ এক সঙ্গে দুটোর বেশি কিনতে পারবে না। যদি বেশ কয়েকটি এমন কাগজ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন, আপনার থাকা-খাওয়ার, আসা-যাওয়ার সব খরচ উঠে আসবে। সে দেশে ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট বানানো প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ একটিই– বাড়িঘরের, রাস্তাঘাটের নক্শা তৈরির জন্য নীল কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই সে রকম কাগজ যোগাড় করে রাতদিন নীল নক্শা বানিয়ে চলেছে। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নীল নক্শা, ক্ষমতায় থাকার জন্য নীল নক্শা, ক্ষমতা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য নীল নক্শা, স্কুলে ভর্তি হবার জন্য নীল নক্শা, হাসপাতালে বিছানা পাবার জন্য নীল নক্শা, জেল থেকে হাসপাতালে আসার জন্য নীল নক্শা, বাসের টিকিট পাওয়ার জন্য নীল নক্শা, বিমানবন্দরে মাল ছাড়ানোর জন্য নীল নক্শা, এমন-কি ঠিক সময়মতো ঠিক জায়গায় মরার জন্যও নীল নক্শা। ঠিক সময়মতো ঠিক জায়গায় ঠিকমতো মারা না গেলে খবরের কাগজে ছবি উঠবে কী করে, টেলিভিশনের পর্দায় জায়গা পাওয়া যাবে কী করে, শোকসভায় লোক হবে কী করে ? এই দেশে নীল কাগজ পাচার করে অনেকেই লাল হয়ে গেছেন– খবরটা গোপন, গোপনই রাখবেন।

ভাগ্য ভালো, বাংলাদেশে এমনটি কখনও হয় না। এখানে স্কুলে ভর্তি হবার জন্য লম্বা লাইন লাগে, কিন্তু তা তো লাগবেই – কত লোক তাদের বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাতে চায়, ভেবে দেখুন। অত লোক যদি তেমনটি না চাইতো, তাহলে কি আর অমন লাইন লাগতো ? সবার মধ্যে লেখাপড়ার ইচ্ছে জেগেছে, এটি শুভ লক্ষণ নয় ? যে-স্কুলে বাচ্চা ভর্তি হবে, সে-স্কুলের মাস্টার সাহেবদের কাছে কেউ-কেউ নাকি বাচ্চাকে আগে-ভাগেই পড়তে পাঠিয়ে দেন– ভালোই তো, যাঁর কাছে বাচ্চা ক দিন পরেই পড়বে, তাঁর সঙ্গে আগে থেকেই চেনাজানা হয়ে থাকা ভালো নয় ? কেউ-কেউ নাকি স্কুলকে পাখা, টেবিল-চেয়ার, অন্য অনেক কিছু কিনে দেন। দেবেন না ? না দিলে শিক্ষার প্রসার হবে কী করে ? ভুলেও ভাববেন না যে, এগুলো নীল নক্শা। এই সব সাধু, মহৎ, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী কাজের সঙ্গে নীল নক্শার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে ? অবশ্যই না।

নির্বাচনের কথায় ফিরে আসা যাক। এই দেশে, এই বাংলাদেশে, সব নির্বাচন ঠিক-ঠিকমতো অনুষ্ঠিত হয়, তা-ই না ? কোনওদিন শুনেছেন, এ দেশের স্বাধীন, নিরপেক্ষ, নির্ভীক, মহাপরাক্রমশালী নির্বাচন কমিশন বলেছে যে, নির্বাচন ঠিকমতো অনুষ্ঠিত হয় নি ? দু-একটি কেন্দ্রে গন্ডগোল হওয়ায় কখনও-কখনও সেখানে আবার নির্বাচন করতে হয়েছে ঠিকই। তাতে কী ? এমন তো হতেই পারে। হ্যাঁ, কোনও-কোনও নির্বাচনে প্রতি মিনিটে একটি করে ভোট পড়েছে, এমনও শোনা

যায়। এ তো ভোটদাতাদের আগ্রহের প্রমাণ, তাঁদের উৎসাহের প্রমাণ, যাঁরা ভোট নিচ্ছেন, তাঁদের দক্ষতার প্রমাণ। একবার নাকি টেলিভিশন নিজের ইচ্ছেমতো নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেছে। কথা হলো, টেলিভিশনের কথা যদি আমরা ঠিক বলে না মানি, তাহলে কার কথা ঠিক বলে মানবো ? তাহলে তো টেলিভিশনে অন্য যে-সব খবর শোনা যায়, সেগুলো ঠিক কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে হয়। তওবা, তওবা, টেলিভিশনে-রেডিওতে যা শোনা যায়, খবরের কাগজে যা ছাপা হয়, তা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি ? একবার নাকি প্রায় কেউই ভোট দিতে যান নি, কিন্তু এক খবর-কাগজে বেরিয়েছে, 'অমুক দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও তমুক দলের পক্ষে গণজোয়ার'। আমরা কোন মহাপুরুষ যে, এই সব নিয়ে কথা বলবো ? আমরা কি নিজের চোখে দেখেছি, কোথায় কে ভোট দিতে গেছে, বা, যায় নি ? আরেকবার নাকি এক উপ-নির্বাচনের সময় প্রায় সব মন্ত্রী এবং নানা রকমের হাজার হাজার লোক এক প্রার্থীকে জেতানোর জন্য ছোট্ট এক জায়গায় জমায়েত হয়েছিলেন। তা তো তাঁরা হতেই পারেন, এ তো তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার। এ নিয়ে কথা বলার কী আছে ? যদি কোনও নির্বাচনে নব্বই শতাংশের বেশি ভোটদাতা ভোট দেন, তাহলে কী প্রমাণ হয় ? প্রমাণ হয় যে, এ দেশের মানুষ – তাঁদের অনেকেই যদিও, দুর্ভাগ্যবশত, লেখাপড়া জানেন না – দেশ নিয়ে, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, দেশের ভালো করতে চান। ঠিক তো ? সোজা কথায়, বাংলাদেশে নীল নক্‌শার কোনও জায়গা নেই, ষড়যন্ত্রের তো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা সবাই এখানে সাধু ও বিবেকবান পুরুষ, থুড়ি, সাধু ও বিবেকবান পুরুষ ও নারী।

এ সব আবোল-তাবোল বকতে-বকতে সে-লোকটির কথা কিন্তু আমরা প্রায় ভুলেই যাচ্ছি, যে আপনাদের বলেছে, এ বইটি পড়বেন না। লোকটি মহা চালাক। সে-ই হয়তো ষড়যন্ত্র করে আপনাকে-আমাকে ভুলিয়ে দিতে চাইছে যে, এ বইটি পড়তে সে মানা করেছে। লোকটির নাকি পয়সার অভাব নেই। কত জায়গা থেকে কত লোককে ঠকিয়ে কত পয়সা যে মেরেছে, তার হিসেব নেই। অন্তত লোকে তো তা-ই বলে। তার বিরুদ্ধে নাকি দুর্নীতি দমন কমিশন দু দুবার মামলা করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি। পারবে কী করে ? বলেছি না, লোকটি মহা চালাক ? কেমন চালাক জানেন ? সে তার কাঁড়ি-কাঁড়ি পয়সা খরচ করার পথ না পেয়ে নিয়ম করে সপ্তাহে দু বার ডাক্তারের কাছে যায়। তার অসুখের কথা বলে, কষ্টের কথা বলে, ডাক্তার তাকে ব্যবস্থাপত্র দেন। লোকটি ডাক্তারের পাওনা কড়ায়-গন্ডায় মিটিয়ে দেয়। তার পর আসে অষুধের দোকানে। ব্যবস্থাপত্র দেখায়, অষুধ কেনে, অষুধের দাম কড়ায়-গন্ডায় মিটিয়ে দেয়। অষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে সোজা চলে যায় ময়লা ফেলার জায়গায়, অষুধগুলো সেখানে ফেলে দেয়। তার পর শিস দিতে-দিতে বাড়ি চলে যায়। একদিন একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এমন কর কেন ? ডাক্তারের কাছে যাও, ডাক্তারকে পয়সা দাও, অষুধের দোকানে যাও, অষুধ কেনো, অষুধের পয়সা দাও, তার পর সেগুলো ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে মহানন্দে বাড়ি ফিরে যাও, কেন ? লোকটি বললো, এ-ও বুঝলে না ? ডাক্তারের কাছে না গেলে, ডাক্তারকে পয়সা না দিলে, ডাক্তার বেঁচে থাকবেন কী করে ? ডাক্তারকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে না ? অষুধ না কিনলে, অষুধের দাম না দিলে, অষুধের দোকানদার বাঁচবেন কী করে ? তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে না ? আর শুধু ডাক্তারকে আর অষুধের দোকানদারকে বাঁচিয়ে রাখলেই চলবে ? আমার নিজের বেঁচে থাকতে হবে না ? আপনারা যা-ই বলুন না বলুন, লোকটির যে দয়ার শরীর, এ কথার পর তা তো মানতেই হয়।

একদিন এ লোকটি বাড়ি ফিরে দেখে তার স্কুলে-পড়া মেয়ে হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কী ব্যাপার, অমন হাসির কী হলো ? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, লোকটির স্ত্রীর সঙ্গে তার মা-র ঝগড়া বেধেছে। শাশুড়ি-বউয়ে তো ঝগড়া বাধতেই পারে। শুধু বাধতেই পারে না, বাধবেই – পানি যেমন নিচের দিকে গড়াবেই, সূর্য যেমন পুব দিকে উঠবেই, ফাল্গুন মাসে বাতাস যেমন গায়ে সুড়সুড়ি দেবেই, এ-ও তেমনি, প্রকৃতির প্রায় এক অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। এ নিয়ে অতো হাসির কী আছে ? না, শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়াটি হাসির কারণ নয়, হাসির কারণ ঝগড়ার ফলাফল। বউয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় শাশুড়ি পেরে উঠবেন কেন ? শাশুড়ি পুরনো দিনের মানুষ, বউ আধুনিকা। শাশুড়ির লেখাপড়া অল্প-স্বল্প বাংলা বই পর্যন্ত, বউ এম-এ পাস। বউ হাইহিল জুতো পরে, ঠোঁটে রঙ মেখে চুল ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে গট্‌গট্ করে চাকরি করতে চলে যায়, শাশুড়ি হেঁসেলে পড়ে থাকেন। বউয়ের কাছে হেরে গিয়ে শাশুড়ি তাঁর স্বামীর কাছে – মানে, লোকটির বাবার কাছে– নালিশ করতে গেলেন। বললেন, 'বিয়ের আগে ছেলে কত ভালো ছিল, আমাদের সব কথা শুনত, টু শব্দটি করত না, আর এখন আমাদের কোনও কথাই শোনে না, বউয়ের কথায় ওঠে আর বসে।' বাবা শুনে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন, তার পর বললেন, 'তাতে কী হয়েছে ? আমিও তো তোমার কথায় উঠি আর বসি।' এই সব গোপন দাম্পত্য কথাবার্তা মেয়েটি যেন কী করে শুনে ফেলেছিল। সেই থেকে তার দমফাটা হাসি।

এখানে একটি ভাববার বিষয় আছে। লোকটির বউটাই কি তাকে বলে দিয়েছে, তুমি সবাইকে বলবে, এই বইটি পড়বেন

না ? লোকটি তার বউকে ডেঙ্গু জ্বরের মতো ভয় পায় – কে-ই বা না পায়, বা, না পেয়েছে, সেই আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত ? মা হাওয়া বাবা আদমকে বললেন, যাও, ফলটা পেড়ে নিয়ে এসো, খেয়ে দেখি। আর অমনি বাবা আদম সুড়সুড় করে ফলটি পেড়ে নিয়ে এলেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক। প্রশ্ন হল, এই-যে লোকটি আপনাদের বলছে, এ বইটি পড়বেন না, এটি কি সে নিজে থেকে বলছে, নাকি, বউয়ের কথায় বলছে ? যদি সে বউয়ের কথায় বলে থাকে, তাহলে তার সাত খুন মাফ, তার মতো লোকই আর হয় না, স্ত্রীর প্রতি ভক্তির জন্য তাকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেয়া উচিত। (সরকার এখনও কেন এমন একটি পুরস্কার প্রবর্তন করলো না, তা ভেবে আমার ভারি দুঃখ হয়। আশা করি, সরকার বিষয়টি ভেবে দেখবে এবং অচিরেই যাকে সরকারি ভাষায় বলে 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া', তেমনি ব্যবস্থা নেবে।) আর যদি লোকটা বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ না করে এমনি কথা বলে থাকে, তাহলে এক্ষুণি তার শাস্তি হওয়া উচিত– আদালত, সাক্ষ্য-প্রমাণ কোনও কিছুর দরকার নেই, আমরা তার ফাঁসি চাই। আরও একটি ব্যাপার হতে পারে। লোকটি হয়তো বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেছে, বউ তাকে বলেছে সবাইকে এ বইটি পড়তে বলতে, আর সে এসে উল্টো বলেছে যে, এই বইটি পড়বেন না। এমনটি যদি হয়, তাহলে জামাকাপড় খুলে, প্রায় দিগম্বর করে, এক্ষুণি, এই ভীষণ শীতের, বা, গরমের মাসে, লোকটিকে সাইবেরিয়া পাঠিয়ে দেয়া উচিত – ফাঁসির চাইতেও কঠিন শাস্তি তার পাওনা, এ বিষয়ে আপনারা সবাই নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

কথা হলো, আসলে ব্যাপারটি কি ঘটেছিল, তা জানা যাবে কী করে ? প্রিয় পাঠক, আপনি এ লোকটির বউকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন, তিনি তাকে কী বলেছিলেন, কিংবা, আদৌ কিছু বলেছিলেন কিনা। তবে প্রিয় পাঠক, সাবধান, আপনাকে তিনি হয়তো কোনও পাত্তাই দেবেন না, আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়া তো দূরের কথা। প্রিয়া পাঠিকা– সরি, প্রিয় পাঠিকা– (সরিই বা হবো কেন ? আকারটি জুড়ে না দিলে অন্তত একজন পাঠিকা তো ক্ষুব্ধ হতে পারেন) – প্রিয়/ প্রিয়া পাঠিকা, আপনিও চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আপনি হয়তো সফল হবেন, আমরা চাইও যে, আপনি সফল হোন, কিন্তু তার সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল বলে মনে হয় না। তার কারণ, আমার বিবেচনায়, একটিই। প্রায় প্রত্যেক মহিলাই মনে করেন যে, যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে, বিয়ের আগে প্রেম করেই হোক, কিংবা না করেই হোক, তিনি ছাড়া অন্য যে-কারও সঙ্গে বিয়ে হলে তাঁর জীবন অনেক বেশি সুখের হতো। একই সঙ্গে প্রায় সব মহিলাই মনে করেন, এই যে তার অপদার্থ স্বামীটি, বোকার হদ্দ, কোনও কাজের নয়, তাঁকে কেড়ে নেয়ার জন্য পৃথিবীর তাবৎ মহিলা উঠে-পড়ে লেগে গেছেন, ষড়যন্ত্র করেই চলেছেন। প্রিয়/ প্রিয়া পাঠিকা, সত্য আবিষ্কার করতে গিয়ে যদি আপনি লাঞ্ছিত হন, তাহলে অবাক হবেন না, দুঃখিত তো হবেনই না। পৃথিবীতে যাঁরাই সত্য আবিষ্কার ও প্রচার করতে চেয়েছেন, তাঁদের সবার ভাগ্যেই একই ঘটনা ঘটেছে। আপনি সান্ত্বনা পেতে পারেন এই ভেবে যে, পৃথিবীর মহৎ ব্যক্তিদের তালিকায় আপনার নামও সংযোজিত হলো। এটি কি কম বড় ভাগ্য ?

এই ঘটনায় এ লোকটির, কিংবা, তার বউয়ের ভূমিকা কী ছিল, তা যখন জানার কোনও উপায়ই নেই, তখন এ বুনো হাঁসের পেছনে ছুটে লাভ কী ? তার চাইতে এ লোকটি সম্পর্কে আরেকটি খবর আপনাদের জানিয়ে দিই। এ লোকটি পদ্য লেখে– গোপনে-গোপনে নয়, প্রকাশ্যে। লিখবে না-ই বা কেন ? হুমায়ুন কবীর বলেছেন না, এই দেশ কবিতার দেশ ? এ দেশের এক সময়ের রাষ্ট্রপতি ও কোনও-কোনও মন্ত্রী কবিতা লেখেননি ? এ দেশের এক পত্রিকার সম্পাদক তাঁর নির্বাচিত কবিতায় তখনকার রাষ্ট্রপতির কবিতা ছাপেননি? এ দেশের কোনও-কোনও আমলা হঠাৎ করে কবি হয়ে যাননি ? সত্যি বলতে কি, কবিতা না লিখলে এ দেশে কারও উন্নতির কোনও সম্ভাবনাই নেই। শুধু কবিতা লিখলেই চলবে না, পত্রিকায় ক দিন পর-পর বিবৃতি দিতে হবে, সভায়-মিছিলে যোগ দিতে হবে, রাষ্ট্রীয় কবিতার আসরে কবিতা পড়তে হবে। তবেই না কবি ! এ লোকটি যদি কবিতা লিখেই থাকে, নিজেই নিজের উন্নতির সিঁড়ি তৈরি করতে চায়, তরতর করে ওপরে উঠে যেতে চায়, তাহলে তাকে কি দোষ দেয়া যায় ? এ লোকটি যদি কবিতা লিখেই ক্ষান্ত থাকতো, কারও কিছু বলার থাকতো না। কিন্তু সে তা করেনি। সে-সব কবিতা পত্রিকায় ছাপিয়েছে (ঘুষ দিয়ে ?), এমন-কি কবিতার বইও ছাপিয়েছে (আবারও ঘুষ দিয়ে ?)। তার কবিতার বইয়ের নাম, আমি শুনেছি, 'আনগ্ন, কি করে পারো'। ছি ছি ছি ! এ লোকটির কবিতা পড়ে একজনের মন্তব্য এ রকম :

মনজুরে মওলার কবিতা পড়ে

'লেখাটা মদ্দার, না, মাদীর ?' :
শুধোলেন সাযযাদ কাদির।

সাযযাদ কাদির সত্যি-সত্যি এমন প্রশ্ন করেছিলেন কিনা, তা আমার জানা নেই। যদি (সৌজন্যবশত ?) করে না-ও থাকেন, করাটা তাঁর নিশ্চয়ই উচিত ছিল।

লোকটি কবিতা লেখে, কি, লেখে না, তাতে আমাদের কী এসে যায় ? লোকটি একটি বই বিষয়ে কি বললো, বা, বললো না,

তাতেই বা আমাদের কী এসে যায় ? সুধী পাঠক/ পাঠিকা, আসুন, আমরা নিরাসক্ত মনে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে, কোনও ভয়ে ভীত না হয়ে, কোনও প্ররোচনায় প্ররোচিত না হয়ে, বিবেচনা করে দেখি, এ বইটি পড়ার পক্ষে ও বিপক্ষে কী-কী যুক্তি আছে, বা, থাকতে পারে।

এ বইটি না পড়ার পক্ষে তিনটি বড়ো ধরনের যুক্তি আছে। এক, বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। দুই, বইটি অপাঠ্য। তিন, বইটি পড়ে কোনও লাভ নেই।

এক, বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। আমরা বহু দিক থেকে পৃথিবীর অন্য অনেক দেশ থেকে পিছিয়ে আছি, কিন্তু একেবারে কোনও দিক থেকেই কি পৃথিবীর অন্যদের চাইতে এগিয়ে নেই ? নিশ্চয়ই আছি। পৃথিবীর বহু দেশে যা নেই, আমাদের দেশে তা আছে। এই যেমন, বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। আমাদের দেশের সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, উপ-সচিব, যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত (ফালতু ?) সচিব এবং সচিব সবাই ভীষণ লেখাপড়া-জানা, ভীষণ বুদ্ধিমান, বা, বুদ্ধিমতী এবং সবাই দেশের মানুষকে ভীষণ ভালোবাসেন। (সে-ভালোবাসা অবশ্য শুরু হয় নিজেকে ভালোবাসা দিয়ে। তা তো হবেই। নিজেকে প্রথমে ভালো না বাসলে অন্যকে কী করে ভালোবাসা যাবে ?) এঁরা ভীষণ ব্যস্ত মানুষ, দেশের উন্নতি করার উপায় ভাবতে-ভাবতেই প্রায় সমস্ত সময় চলে যায়, বই-টই পড়ার খুব একটা সময় পান না, তারপরও হঠাৎ-হঠাৎ করে এক-আধটা বই পড়েই ফেলেন। তা-ও পড়েন কর্তব্যের তাড়নায়। দেখতে হবে না, যে-সব বই বেরুচ্ছে, সেগুলো পড়ে কারও কোনও ক্ষতি হয়ে গেল কিনা, বড় ধরনের না হোক, অন্তত ছোট ধরনের ? কেউ যাতে অধঃপাতে না যায়, তা দেখার একটি পবিত্র দায়িত্ব রয়েছে না ? এঁরা সবাই রাষ্ট্রপতির হয়ে কাজ করেন – এঁরা যে-সব হুকুম-টুকুম দেন, তা রাষ্ট্রপতির নামেই দেয়া হয় (যদিও বেশিরভাগ সময় রাষ্ট্রপতি জানেনই না, কী হুকুম দেয়া হচ্ছে)। রাষ্ট্রপতি কি শপথ নেন নি যে, তিনি দেশের ও দেশের মানুষের ভালোর জন্য কাজ করবেন ? সে-শপথের অংশী তো এঁরাও, এই সব সচিব, সহকারী সচিব সবাই। সুতরাং, তাঁদের চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। কোনও বই পড়ে যদি তাঁদের মনে হয় যে, এই বইটি পড়লে পাঠকের সর্বনাশ হবে, পাঠক অধঃপাতে যাবেন, খারাপ কাজ কাকে বলে, তা জেনে ফেলবেন, এমন-কি খারাপ কাজ কী করে করতে হয়, তা-ও শিখে ফেলতে পারেন, তখন বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া তাঁদের আর কী-ই বা করার থাকে ? অবশ্য সে বই পড়ে সচিব, সহকারী সচিবদের সর্বনাশ হয় না, তাঁরা অধঃপাতে যান না, খারাপ কাজ কাকে বলে, তা তাঁরা জেনে ফেলেন না, খারাপ কাজ কী করে করতে হয়, তা শিখে ফেলার প্রশ্ন তো ওঠেই না। তার কারণ, তাঁরা তো সাধারণ মানুষ নন, সাধারণ মানুষের মতোও নন, তাঁদের চিত্ত দুর্বল নয়, চোখের চাউনি ঘোলাটে নয়, যে যা বলে তা-ই তাঁরা বিশ্বাস করেন না, শক্ত মাপকাঠিতে সব কিছু যাচাই করে নেন, আর সে-মাপকাঠি নিজেরাই তৈরি করেন। সচিব, সহকারী সচিবরা যে উর্ধ্বলোকের মানুষ, তার আরেকটি প্রমাণ হলো, যে-বইটি পড়ে তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পান যে, সে-বইটি পড়লে লোকের ক্ষতি হবে, অন্য অনেকেই সে-বইটি পড়ে কিন্তু টের পান না যে তেমনটি হবে। বাঘা-বাঘা পণ্ডিতেরা টের পান না, বাঘা-বাঘা সাংবাদিকেরা টের পান না, সুন্দরী মহিলারা টের পান না, ছেলে-ছোকড়ারা তো পায়ই না। সহকারী সচিব একবার নথিতে লিখে ফেললেই হল, অমুক বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক, তার পর তাঁর সইয়ের পাশাপাশি সইয়ের পর সই পড়তেই থাকবে, তার পর একসময় – সত্যি বলতে কি, খুবই তাড়াতাড়ি – বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে যাবে। সহকারী সচিবের পর যাঁরা সই করবেন, তাঁরা কিন্তু বইটি পড়ে সময় নষ্ট করবেন না। হোন না সহকারী সচিব সে-দিনের ছেলে, দুধের শিশু, সহকর্মীর বিচার-বুদ্ধির ওপর তাঁদের কি আস্থা নেই ? অবশ্যই আছে। থাকতেই হবে। বই পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে জনগণকে বাঁচানোর এমন সুব্যবস্থা আর কটি দেশে আছে ?

কিন্তু ফল হয় উল্টো। জনগণ তো আর সচিবদের মতো জ্ঞানী নয়, তাদের ভালো কিসে হবে, মন্দ কিসে হবে, তা তারা জানে না, জ্ঞানী লোকের কথায় তারা কানও দিতে চায় না। যে-বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো, সেটি পড়ার জন্য তারা আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। বইয়ের দোকানের তাকে বইটি আর দেখা যায় না, কিন্তু বইটির হাজার-হাজার কপি লুকিয়ে-চুরিয়ে বিক্রি হতে থাকে। তিন গুণ, চার গুণ, পাঁচ গুণ চড়া দামে তা বিক্রি হয়। চিত্রপ্রতিলিপি তৈরি হয়– যাকে সরল বাংলায় বলে, ফটোকপি– সে-চিত্রপ্রতিলিপি হাতে-হাতে ঘুরতে থাকে। রাস্তায় লোকজন সে-বই ফেরি করতে থাকে, গাড়ি থামলেই জানালার কাছে ছুটে আসে, গছিয়ে দিতে চায়। মহিলাদের কাছে তেমন সুবিধে করতে পারে না, তারা খুবই বুদ্ধিমতী, কিন্তু হাঁদারাম পুরুষগুলোকে পটাতে দু মিনিটও সময় লাগে না। দুর্ভাগ্যবশত, এ বইটি এখনও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি। সুতরাং, এ বইটি পড়ার কোনও দরকার নেই।

বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হল না কেন ? কেন আবার ? সেই লোকটির ষড়যন্ত্র, যে বইটির মলাটে লেখে দিয়েছে, এই বইটি পড়বেন না। এই দেখেই না সচিব, সহকারী সচিবরাও বইটি আর পড়েন নি। ছাপার অক্ষরে লেখা আছে, বইটি পড়বেন না, তার পরও তাঁরা বইটি পড়বেন কেন ? তবে লেখকের, তারও বেশি প্রকাশকের, কপাল ভালো হলে সচিব, সহকারী সচিব একদিন-না-একদিন বইটি পড়বেনই এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন। প্রকাশক যদি চালাক হন – তিনি যে চালাক, তা অবশ্য বিশ্বাস করা কঠিন, কেননা, চালাক হলে এ বইটি তিনি প্রকাশ করতেন না ; তবে, বলা যায় না, বইটি বেরুনোর পর তিনি চালাক হয়েও যেতে পারেন – প্রকাশক যদি চালাক হয়ে গিয়েই থাকেন, কিছু লোকজন ভাড়া করে তিনি একটি মিছিল বের করতে পারেন, সে-মিছিলে তারা প্ল্যাকার্ড নাড়বে, শ্লোগান দেবে, 'এ বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা কর, করতেই হবে ; লেখককে ফাঁসি দাও, দিতেই হবে'।

দুই, বইটি অপাঠ্য। 'অপাঠ্য' মানে, এক, পাঠ্যবইয়ের তালিকায় এ বইটির নাম নেই। 'অপাঠ্য' মানে, দুই, বইটি এতোই বাজে যে, তা পড়া যায় না। দুটোই ঠিক। প্রথমত, বইটিকে কোনও মতেই গবেষণার বই বলা যাবে না, অমন উঁচু দরের গবেষণার বই তো নয়ই, যেখানে শোনা যায়, এক গবেষক লিখেছিলেন, 'শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সাধারণত দু ধরনের চরিত্র দেখা যায় – এক, পুরুষ ; দুই, নারী'। তাঁর পরীক্ষক নাকি তাঁকে বলেছিলেন, এ কি লিখেছো ? সব উপন্যাসেই তো নারী-চরিত্র আর পুরুষ-চরিত্র থাকে- শরৎচন্দ্রের বেলায় এটি নতুন কি হলো ? তার ওপর, 'সাধারণত' লিখেছো। কেন?' গবেষক নাকি বলেছিলেন, 'কেন স্যার, খারাপ কি করেছি ? সব উপন্যাসেই নারী-চরিত্র আর পুরুষ-চরিত্র থাকে ঠিকই। কিন্তু যা সত্য, তা সব সময়ই সত্য, এবং সব সময়ই তা বলতে হবে, বার-বার করে বলতে হবে। আর 'সাধারণত' ? কেন স্যার, ওই গরুটা আছে না, মহেশ না কি যেন নাম ?' দ্বিতীয়ত, এ বইটির লেখক যদিও নিজেকে কবি বলে জাহির করতে চান, এ বইটি কবিতার বই নয়। হবে কী করে ? লোকটা আসলে কবি হলে তো হবে। তৃতীয়ত, বইটি ছোটগল্পের বই, কিংবা, উপন্যাস নয়। এ বইয়ে কিছু গালগল্প আছে ঠিকই, তা-ও খুব নিচু মানের, কিন্তু এখানে ছোটগল্পের, বা, উপন্যাসের ছিটেফোঁটাও নেই- ঝাউ গাছের মতো কল্পনার প্রসার নেই, বট গাছের মতো জীবনের গভীরে চলে-যাওয়া নেই, অর্কিডের মতো তীক্ষ্ণ মধুর কাঁটার আঘাত নেই। চতুর্থত, এ বইয়ে গভীর দর্শন নেই, মহৎ চিন্তা নেই। যে-রকম বইয়ের জন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আক্ষেপ করেছিলেন, এটি তেমন বই নয়। তেমন হলে তো এ বই পড়ে পাঠকের চিন্তা আমূল পাল্টে যেতো। এই বই পড়ে একটি জিনিসই পাল্টে যেতে পারে – তা হলো দিকজ্ঞান। কোনটি উত্তর, কোনটি দক্ষিণ, কোনটি পুব, আর কোনটি পশ্চিম, পাঠক তা গুলিয়ে ফেলতে পারেন। পঞ্চমত, এটি চুটকির বইও নয়। প্রমথ চৌধুরী যে-রকম বইয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন, এটি তেমন বই কিছুতেই নয়। ষষ্ঠত, এটি গোয়েন্দা-গল্পের বইও নয়, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীও নয়। ঠাট্টার বইও নয়, গুরুগম্ভীর বইও নয়। প্রবন্ধের বইও নয়, খবরের কাগজের লেখার সংকলনও নয়। কোনও ধরনের লেখার মধ্যেই এটি পড়ে না – এটি যে কেমন বই, তা-ই বুঝে ওঠা মুশকিল। সব শেষে, বইটি খুবই বাজেভাবে লেখা। এর গদ্য গদ্যই নয়- হাঁসজারু যেমন হাঁসও নয়, সজারুও নয়, সে-রকম। এ বইয়ের গদ্যকে উটের মতোও বলা যায় – বেঢপ, এবড়ো-খেবড়ো, পিঠটা উঁচু, ঠ্যাংটা বাঁকা, ভীষণ খসখসে চামড়া, গলার আওয়াজ ব্যাঙের আর ঘোড়ার ডাকের মিশেল। সে-গদ্য আবার ইংরেজি ঢংয়ে লেখা- মনে হয় যেন বাংলা অক্ষরে ইংরেজি পড়ছি। এ বইটির সমালোচনা দু বাক্যে করা যায় : 'কী দরকার ছিলো বইটি লেখার ? আর, ভুল করে যদি বইটি লেখা হয়েও থাকে, কী দরকার ছিলো সেটি প্রকাশ করার ?' সেই-যে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ একবার এক বই বিষয়ে লিখেছিলেন, অনেকটা সে-রকম : মনজুরে মওলাকৃত 'প্রেমকুসুমলতিকা' কাব্যগ্রন্থ প্রথম খণ্ড পাঠ করিলাম, দ্বিতীয় খণ্ড লিখিবার আবশ্যকতা দেখি না।

তিন, বইটি পড়ে কোনও লাভ নেই। এ বইটি পড়ে জানা যায় না কী করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়া যাবে, কী করে দুবাই-এ চাকরি পাওয়া যাবে, কী করে বউকে সামলানো যাবে, কী করে লটারির পয়সা পাওয়া যাবে, কী করে সুন্দরীদের মন ভোলানো যাবে, কী করে পরের পয়সায় খাওয়া যাবে, কী করে বনের খেয়ে ঘরের মোষ তাড়ানো যাবে, কী করে সিনেমায় নামার সুযোগ পাওয়া যাবে, কী করে ক্রোড়পতি হওয়া যাবে, এমন-কি কী করে লেখাপড়া না করে পরীক্ষায় পাস করা যাবে। অমন বই পড়ে লাভ কী ?

এ বইটি পড়ার পক্ষে যুক্তি একটিই। বইটি না পড়লে কী করে জানবেন, বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার মতো বই, বইটি অপাঠ্য, বইটি পড়ে কোনও লাভ নেই ?

সহৃদয় পাঠক, সহৃদয়া পাঠিকা, আপনাদের সাহস আছে, সততা আছে, সহনশীলতা আছে, সহানুভূতি আছে। এ বইটি আপনারা পড়বেন না ? যদি না-ই পড়বেন, তাহলে এ পর্যন্ত পড়লেন কেন ?

বৈশ্যানীর বিষ

বুলবুল চৌধুরী

আগেই কথা হয়ে আছে, ইতু আসবে বিকেল পাঁচটার দিকে। ওর সঙ্গে বসে আজ দুয়ের বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা টানা হবে। দিনমান ধরে সেই খেয়াল নিয়েই আছে গালিব। তাই ঘড়িতে পাঁচটা বাজবার দশ মিনিট আগে মোহন খান পরিচালিত 'যেদিকে দু'চোখ যায়' নাটকের এডিটিং থামিয়ে সে উঠে আসে নিজের চেয়ারে। সহ-পরিচালক হবার সুবাদে 'চিত্রময়' নামক প্রডাকশন হাউজ তাকে দিয়েছে পার্টিশন তোলা আলাদা একখানা ঘর। তবে আসছে মাসের প্রথম দিন থেকে এখানকার চাকরিতে ইস্তফা দেবার ঘোষণা দিয়েছে সে। এ ব্যাপারে ইতুর মন্তব্য হচ্ছে, মোহন খান কোনো বড় মাপের পরিচালক নন। সেই তুলনায় তুমি বেশি প্রতিভাবান। তাহলে তার পিছে কেন ঘুরে মরছ?

শুরুতে লেখক মোহন খান নাট্যকার-পবিচালক হিসেবে যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। ওই সময়টায় কাঙ্ক্ষিত চাকরি না পাওয়ায় আর পাশাপাশি ডিরেকশনটা কাছ থেকে ঠিকঠাক বুঝে উঠার আশায় সে 'চিত্রময়'র কাজে যুক্ত হয়েছিল। তবে খ্যাতি এবং অর্থভাগ্যের সম্মিলনে কখনো সখনো মানুষের মধ্যে ভ্রান্তি নেমে আসতেই পারে। বর্তমানে মোহন খানের যাচ্ছে সেই দশা। তারচে' বড় ব্যাপার হলো,ইতু চাচ্ছে নাট্যপরিচালক হয়ে থাকা নয়, অন্য কোনো চাকরিতে ঢুকুক গালিব। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, টিভি পর্দায় নাটকের নায়িকা হয়ে ঘুরবার ক্ষেত্রে আপনজনরা ইতুকে যারপরনাই উৎসাহ জোগায়। অথচ ডিরেকটরিয়াল মিডিয়ায় নিজের নাম লেখানোর ফলে ওই পরিবারের সবাই হবু জামাইকে অবহেলা ঢেলে দিচ্ছে। ব্যাপারটা নিয়ে কঠিন প্রশ্ন তুলতেই ইতু জবাব দিয়েছিল, আমি নাটক করি সখের বশে। আর তুমি তো এসবকে পেশা হিসেবে আঁকড়ে আছো। তা দিয়ে বিশেষ পয়সা-কড়ি হবে ভেবো না যেন।

গ্রুপ থিয়েটার করতে নেমে মঞ্চাভিনেত্রী ইতুর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তার। আর বাল্যবন্ধু এবং দলের প্রধান সিফাতের পাশে থেকে ডিরেকশন বুঝে ওঠার দিনগুলোয় ওর প্রেমে বাঁধা পড়ে গালিব। কিন্তু ইদানীং বিয়ের প্রস্তাবে ইতুর পিছলে পিছলে চলা ভাবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ নিয়ে সমাধান চাইতে গেলে সিফাত জবাব দিয়েছিল, গুণ কম থাকা মেয়েকে অভিনয়ের মোহে ভুল করতে দেখেছি। অবশ্য তোর প্রেমিকাকে নিয়ে সেরকম কোনো ভয়

নেই। ভালো অভিনেত্রী হবার কারণেই নাটকে বেশি বেশি ডাক পাচ্ছে ইতু। তাই হয়তো সংসার পাতলে কাজে দেরি হয়ে যাবার ভয়ে বিয়েটা ও পেছাচ্ছে।

প্রথম সারির নায়িকা হবার প্রশ্নে প্রেমিকাকে নিজের সবটুকু জানাই তো ঢেলে দিয়েছে প্রেমিক। বিয়ের পরও তা অব্যাহত থাকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে ওকে। তাহলে সেখানটায় সিফাতের উক্তি অনুযায়ী কাজে দেরি হয়ে যাবার মিছে শঙ্কা কেন জাগবে?

পুরানা পল্টনে অবস্থিত 'চিত্রময়ে'র অফিসে বসে ভাবনার আঁকিবুঁকি কেটে চলার ফাঁকে সিগারেট জ্বালে গালিব। ইতিমধ্যে ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা দশের ঘরে পৌঁছে গেছে। প্রশ্ন জাগে, আচ্ছা, ইতুর দেখা কি মিলবে? ও তো আগেও কথা দিয়ে মুখোমুখি হবার বদলে বেশিরভাগ সময়েই আড়ালে থেকেছে।

দুয়ার ঠেলে ভেতরে ঢোকেন মেকআপম্যান অঘোর মণ্ডল। তাকে দেখতে পাওয়া মাত্রই গালিব আমন্ত্রণ জানায়, আসুন দাদা। কোনো শুটিং নেই, তাও এলেন যে!

মানুষটা এগিয়ে এসে সামনে রাখা চেয়ারের গায়ে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বলেন, আসছিলাম পেমেন্ট লইতে অফিসে। প্রোডাকশন ম্যানেজার কইলেন, আপনে আমগো ছাইড়া যাইতাছেন। সত্য নাকি?

জি দাদা, ভালো চাকরি পাওয়াতেই চলে যেতে হচ্ছে।

কি চাকরি?

একটা প্রাইভেট ভার্সিটিতে পাবলিক রিলেশন অফিসারের পদ জুটেছে ভাগ্যে।

গালিব ভাই।

বলুন।

অঘোর মণ্ডল চারপাশটা সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে চাপাস্বরে জবাব দেন, ওই যে কয় না, দেওয়ালেরও কান আছে। এইতে বুঝি সাবধানের মাইর নাই। যা-হোক, আমার মনে একখান প্রশ্ন জাগল। জিজ্ঞেস করি?

নিশ্চয়। নিশ্চয়। কেন নয়? একটা কেন, প্রাণখুলে যা যা আছে সবই জিজ্ঞেস করতে পারেন আমাকে।

শোনেন, স্যার তো নাটক লেইখাই খালাশ। সেটে গিয়া ডিরেকশন দেন আপনে। নাম যায় ওনার। ক্যান, সব ছাইড়া নিজে পরিচালক হইলে বহুত ভালা করতেন।

গালিব জবাব দেয়, ইন্ডাস্ট্রির হাল-হকিকত কি আপনিও না টের পাচ্ছেন? এখানে ভাঁড়দের দখলে চলে গেছে সবই। তাই আমি যা চাইছি সেরকম নাটক করতে গিয়ে থই পাব আশা নেই।

তারপর মোবাইল ফোন বেজে উঠতেই গালিব চমকে দেখে, এ যে ইতুর নাম্বার। নিশ্চয় আসতে না পারার খবরটা জানাতে ও ফোনের আশ্রয় নিয়েছে। তবে 'শোনা যাক তো বক্তব্য' ভেবে সে প্রেমিকার সংযোগ পেতে সেটখানা কানে সেঁটে ধরে। বলে, হ্যালো।

অন্য প্রান্ত থেকে জবাব ভেসে আসে, প্লিজ আমার কথায় কোনো রাগ দেখাতে যেও না যেন!

এতে গালিব নিজেকে বেশ বাগে রেখে প্রশ্ন করে, ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়ায় আসতে দেরি হচ্ছে বুঝি? নাকি আসতে পারছো না খবর দিতেই আমাকে ফোন করলে?

আহ, উত্তেজনা থামাও দেখি প্রথমে। আগে বুঝতে হবে ব্যাপারটা। শোনো, তোমার ইতু হারিয়েও যাচ্ছে না, পালিয়েও যাচ্ছে না। মাঝে একটু দেরি হয়ে গেল, এই তো! তাহলে ভাবনা কিসের?

গালিব জবাব দেয়, ভূমিকা ছেড়ে মূল বিষয়টা বলো।

শোনো, বিকেল চারটেয় আউটডোর শুটিং সেরে ঘরে ফিরেছি। তারপর তোমার সামনে আসার জন্যই নিজেকে বদলেও নিয়েছিলাম। হঠাৎ পেলাম ফুফুর ফোন। তার কনিষ্ঠ পুত্রের জন্যে কনে দেখার আসরে আমাকে নাকি অবশ্য অবশ্যই হাজির থাকতে হবে। সত্যি, এই অবস্থায় তাকে ঠেলে তোমার কাছে আসি কী করে?

সিফাত মাঝে মধ্যেই বলে যে, কারও কারও কাছে তোর আশা থাকতেই পারে। তবে তার কোনো আঘাতে ভেঙে পড়লেও যে জীবনের বাঁচোয়া নেই। এক্ষণে তা স্মরণ করে গালিব শান্ত স্বরে জবাব দেয়, আচ্ছা, তাহলে সুযোগ বুঝে আমাকে ফোন দিয়ে ফের সময় ঠিক করে নিও।

তারপর অন্যদিকের কোনো উত্তর না শুনবার প্রয়াসে গালিব মোবাইল সেটখানা গুটিয়ে নিয়ে পকেটে ঢোকায়। অনুচ্চ স্বরে ইতুকে কথাটুকু শুনিয়ে ফোন ছাড়লেও ভেতরে জমে আছে অপমান-রাগ ইত্যাদি। হতে পারে ওর ফুফাতো ভাইয়ের কনে দেখার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। কিছুদিন আগেও প্রতিদিন দু'য়ের দেখাসাক্ষাৎ বজায় ছিল। ইদানীং সেসব দূরে থাকুক, ফোন করলেও উত্তরে ওর কণ্ঠে ছলনা ফুটে ওঠে। এতে ইতুকে না পাবার হিসেব কষতে হচ্ছে গালিবকে।

অঘোর মণ্ডল ডাকেন, গালিব ভাই।

বলুন দাদা।

কেমুন জানি চুপচাপ হইয়া পড়লেন?

হ্যাঁ দাদা, প্রেমের জটিলতায় বেজায় ঘুরপাক খাচ্ছি।

গালিব ভাই!

কি?

লাইলী-মজনুর যুগ কি আছে আর? আইজের দিনে প্রেম চলে হিসাব বুইঝা। চলেন আমার সঙ্গে রশীদ পাগলার মাজারে। ওইখানে গেলে আগল-পাগলের ভিড়ে দেখবেন কই গেছে আপনের দুখ।

সেটা কোথায়?

মিলবেরাকের পিছে। যাইবেন?

গালিব জিজ্ঞেস করে, কেন যাবেন রশীদ পাগলার মাজারে? আপনি কি পীর-ফকির মেনে চলেন?

না, না, ওইরকম কখনে? মাঝে

মইধ্যে সখ কইরা ওইসব জায়গায় গেলেও আইজ রওনা দিছি হুরন বিবিরে পার্বতী আর শানুরে শিব সাজাতেই। এই যে দেখেন, সঙ্গে লইছি মেকআপ বক্স।

অঘোর মণ্ডলের উত্তরে রহস্য অনুমান করা যায়। তাই গালিব জিজ্ঞেস করে, তারা আপনার কে হন?

শানু আমার বাল্যবন্ধু। হে বাবার করা বড় বাড়ি ভাড়া দিয়া বহুত পয়সা কামায়। আবার সব উড়ায় হুরন বিবিগো মতোন মাইয়ালোকের পিছে। রুচি ভালা না দোস্তের। তাও ডাকলে যাই। তার দুই কথা শুনি, শোনাইও কম কই! তবে লাজ থাকলে তো বেভার!

আচ্ছা দাদা, হুরন বিবির কিবা পরিচয়?

গাঞ্জা বেচে দাদা, গাঞ্জা। গেলে পাইবেন দুইজনেরে একখানে। যাইবেন?

ইতুর আচরণে মনের কোণে বিষণ্ণতা ছাপ ফেলেছে। জীবনের কাঁটাছেঁড়া অনেক রকমই হতে পারে। আর তা আত্মস্থ করতে না পারলে যে নিজেকে সচল রাখা দায়। সেরকম ভাবনায় মেকআপম্যানের সঙ্গে আগল-পাগলের ভিড়ে মিশে যাবার ইচ্ছে জাগে তার। তাই সে বলে ওঠে, চলুন তবে।

এতে অঘোর মণ্ডল সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে যেতেই গালিব তার সঙ্গী হয়ে 'চিত্রময়ে'র দ্বিতল অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসে পথে। সামনে এগিয়ে একটা স্কুটার পেয়ে যেতেই মেকআপম্যান আহ্বান জানান, উইঠা পড়েন দেখি।

তারপর পাশাপাশি বসে দু'জন। স্কুটার চলতে শুরু করলে গালিব সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিতেই অঘোর মণ্ডল তুলে নেন একখানা। বলেন, সিগারেড খড়ি মাড়ি-খড়ি মাড়ি ঠেকে আমার ধারে।

কেন?

উত্তর আসে, আমি তুলেমূলে হইলাম গিয়া গঞ্জিকাসেবী। ওই নেশার মানুষ হইয়া সিগারেডের মজা পামু কইত্থেনে?

সিফাতও গঞ্জিকাসেবী। তার পাশে থাকতে গিয়ে এই নেশার কিছু বশ মেনেছে গালিব। এখন তা খেয়ালে আসতেই সে প্রশ্ন করে, আচ্ছা দাদা, গাঁজা খাওয়াটা কে শেখাল আপনাকে!

অঘোর মণ্ডল জবাব দেন, শোনেন, আমার দাদু প্রত্যেক রাতে ঘুমানের আগে নিজের হাতে ছিলিম সাজাইতেন বহুত যতনে। দম নিতেন একটাই। ওই দমে কল্কির মাথায় ছোবার আগুন জ্বইলা উঠত দাউ দাউ। পরে দিদিমার দেওয়া কাসার বাটি ভরা গরম গরম দুধ গিলতেন ঢোক ঢোক। ওইসব দেইখাই ভাবছিলাম, কালে আমিও দাদুর মতন কল্কি ধরমু।

গালিবের ফোন বেজে ওঠে। কে হতে পারে? ইতু নয় তো! তা কেন হবে? অফিসে বসে ক্ষুব্ধ গালিবের ফোন কেটে দেয়ার বিষয়টা কি ও না বুঝেছে আর! প্রেমিকের অভিমানের কোনো রকম দায় থাকলে ইতু অনেক আগেই কল দিত। তবে পকেট থেকে মোবাইল সেটখানা বের করতেই বোঝা গেল, এ হচ্ছে সিফাতের নাম্বার। আর তা কানে তুলে নিতেই বন্ধুর জিজ্ঞাসা ভেসে আসে, হ্যালো, তুই কোথায়?

এই তো, নিজেকে একটু পথে পথে ছেড়ে রেখেছি।

সেকী কথা রে? নিজেকে পথে ছেড়ে রাখা মানে কি দাঁড়ায়? আবার মাতালের মতো জড়ানো ঠেকছে তোর কণ্ঠ। নেশা করেছিস নাকি? থির হয়ে চলে আয় আমার ঘরে। তোর প্রিয় টাকিলা পাবি।

গালিব উত্তর দেয়, তুই হাজারো লোভ দেখালেও এখন আমি আসছিনে। কারণ জানতে প্রশ্ন করলেও বলব, ব্যাপারটা পরে শুনিস।

সিফাত মন্তব্য করে, ভারি রহস্য তো!

হ্যাঁ, তাই।–বলেই ফোনের লাইন কেটে দেয় গালিব।

স্কুটার এগোয় ধোলাই খালের পথ ধরে। অঘোর মণ্ডল জিজ্ঞেস করেন, কার লগে আলাপ করলেন? কেউর লগে দেখা করণের কথা আছিল বুঝি? আমারে পাইয়া ভুইলা গেছিলেন?

গালিব হেসে জবাব দেয়, ভাবনার কিছু নয়। হয়েছে কি, সিফাতকে তো আপনি ভালভাবেই চেনেন। সে আমাকে মদ খেতে ডাকছে।

ওহ্, তাই কন। যাওনের ইচ্ছা নাকি?

গালিব জবাব দেয়, না, না দাদা, অমন কেন হবে? আমি সবদিক ভেবেই আপনার সঙ্গীসাথী হয়ে যাচ্ছি রশীদ পাগলার মাজারে। হুরন বিবি আর শানুকে দেখে তবেই ফিরব।

গালিব ভাই।

বলুন।

সত্য কইতে কি, স্যারের নাটকে পাইবেন শুধু কুতকুতানি। যাইতাছেন ত আমার লগে, শানু আর হুরণ বিবিরে দেইখা আপনে চাইলে ওই কাহিনী লইয়া হিট নাটক তৈরি করতে পারেন।

বিস্তর অর্থকড়ি হাতে আসায় সেসবে মোহন খান গা ভাসিয়েছেন যথেষ্ট। অতীতে কাগজে কাহিনীর নাট্যরূপ দিলেও কোনো নাটক করার ক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটা থাকে তার মাথায় মাথায়। আর সেটে ঢুকে তিনি কাগজ-কলম নিয়ে বসে যান সংলাপ লিখতে। তবে শিল্প কি অত সহজ এবং ভানের ধার ধারে?

সূত্রাপুর বাজার হাতের ডানে রেখে স্কুটার বাঁয়ের পথ ধরতেই অঘোর মণ্ডলের ফোন বেজে ওঠে। পরমুহূর্তেই তিনি হাতে থাকা মোবাইল সেটখানা চোখের সামনে তুলে নিতে নিতে বলে ওঠেন, ইস, বৈশ্যানীর ফোন দেখতাছি!

গালিব বেজায় চমকে প্রশ্ন করে, সে আবার কে দাদা?

মেকআপম্যান জবাব দেন, স্যারের ওই পাপিয়ার এই নাম দিছি আমি।

তারপর তিনি কানে সেটা তুলে নিয়ে খুবই কোমল স্বরে বলেন, হ্যালো ম্যাডাম।

এতে নায়িকা পাপিয়া জিজ্ঞেস

করেন, দাদা, কাল সকালে তো স্যারের নাটকের সেটে আসছেন আপনি।

জি ম্যাডাম, সিডিউল মতন পাইবেন আমারে।

শুনুন, এইমাত্র ডিরেক্টরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, সকালের বদলে বিকালের শিফটে নাটকের কাজ চলবে।

ঠিক আছে। তাইলে সময় মতনই আমি উনার কাজে হাজির থাকমু।

অঘোর দা।

কন ম্যাডাম।

কাল সকালে আমার বান্ধবী কল্পনার ফটো সেশন। ওর মেকআপটা কিন্তু আপনাকে সেরে দিতে হবে।

সকাল কয়ডায় ম্যাডাম?

উত্তর আসে, নয়টার দিকে চলে আসবেন আর কি।

কথা শেষে অঘোর মণ্ডল মোবাইল সেটখানা পকেটে রেখে বলেন, পাপিয়া ম্যাডাম কইলেন কাল সকালে উনার বান্ধবীর ফটো সেশনে থাকতে হইবো আমারে।

গালিব জবাব দেয়, কিন্তু কাল সকালে তো মোহন ভাইয়ের শুটিং আছে। স্পটে আপনি না থাকলে অ্যাকটর-অ্যাকট্রেসদের মেকআপ দেবে কে?

সকালের শুটিং ক্যানসেল করছেন স্যার।

কোথায় পেলেন খবর?

ম্যাডাম পাপিয়া জানাইলেন। আইচ্ছা গালিব ভাই, আপনি কি শুনছেন যে স্যার পাপিয়ারে গোপনে বিয়া করছেন?

অনেক রকম কথাই তো আসে কানে। অঘোরদা, একটা প্রশ্ন করি?

কইয়া ফালান।

আপনি পাপিয়ার নাম বৈশ্যানী দিলেন কেন?

মেকআপম্যান উত্তর করেন, ইতিহাসে পাইছিলাম আগের দিনে হিন্দুগো মাঝে বৈশ্যরা আছিলো কম দামের জাত। আবার বৈশ্যের বউ হইলো গিয়া বৈশ্যানী। পাপিয়া ম্যাডাম ওই জাত হওনেই ছিনালি দিয়া প্যাচাচ্ছে ভালা মানুষ স্যারেরে। কেউ কেউ কয় ওর লাগি স্যারের সোনার সংসারে দাউ দাউ আগুন জ্বলতাছে।

স্কুটার মিলবেরাক পুলিশ ফাঁড়ির সামনে পৌঁছতেই অঘোর মণ্ডল হেঁকে ওঠেন, ড্রাইভার সাব, ডাইনে, ডাইনে ঘুরান গাড়ি।

তারপর আঁকাবাঁকা গলি পথ বেয়ে স্কুটার গিয়ে থামে বুড়িগঙ্গা নদী লাগোয়া রশীদ পাগলার মাজারে। ভাড়া মিটানো হয়ে যেতেই মেকআপম্যান বলেন, আমার হাত ধরেন দাদা।

কেন?

দেখছেন কি ভিড়। ঠেলাঠেলিতে আপনে হারাইয়া গেলে খোঁজাখুজি করতে বেইল যাইব আমার।

অতীতে বিভিন্ন মাজার ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা গালিবের আছে। এসব জায়গায় পুণ্যকামীদের পাশাপাশি গাঁজাখোরদের আড্ডাই বিশেষ নজরে আসে। চলতে চলতে সে দেখে রাস্তার দু'পাশে বসেছে হরেক পসরা সাজানো ভাসমান দোকানপাট। তারও সামনে অনেকখানি জায়গাজুড়ে খণ্ডাকারে বসে গেছে বেশ কতেক গাঁজার আসর। কেউ কেউ মাথার উপর টানিয়েছে পলিথিন, কাপড় কিংবা চট। অঘোর মণ্ডল এগিয়ে গিয়ে থামেন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের আড্ডায়। তাকে দেখতে পেয়ে হুরন বিবি বলে ওঠে, আসছেন তাইলে দাদা, হাজার সালাম জানাই আপনেরে।

মেকআপম্যান জবাব দেন, হুরন, এই যে আমার লগে আসলেন নাটকের বহুত বড় ডাইরেকটার, গালিব ভাই। কই, ওনারে বসনের তো দিবি?

এই উচ্চারণে হুরন বিবি বসা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বলে, তাইলে ওনারে আমি সালাম জানাই। আসেন গো, আপনেরা ভিতরে আইসা সেবা লন আমার।

অঘোর মণ্ডল প্রশ্ন করেন, শানু কই।

কি গরম! ওই জইন্য তারে পাঠাইছি কোল ডিং আনতে। ভাগ পাইবেন আপনেরাও। দাদা, উনারে কি ছিলিম দিমু?

মেকআপম্যান উত্তর করেন, দলের মানুষ হওনেই বগলদাবা কইরা আনছি গালিব ভাইরে। দে, সেবা দে অতিথিরে। হের পরেই আমি তরে সাজামু পার্বতী।

হুরন বিবি বলে, তাইলে খাড়াইয়া রইছেন কেন, পইল্লা তো বসবেন।

সেই কথার পর অঘোর মণ্ডলের পাশাপাশি মাটির ওপর পাতা হোগলা পাতার পাটিতে আসন নেয় গালিব। ফাঁকে হুরন বিবিকে মোটামুটি দেখেও নেয় সে। লম্বা গড়নের মাঝবয়স্ক মাংস থলথল এই মোটা মহিলার গায়ের রং খুবই ফর্সা। কিন্তু রোদ-তাপের প্রভাবে তাতে খানিক পোড়া লাগা ছাপ পড়েছে।

কোল্ড ড্রিংকসের বড় বোতল হাতে ফিরে আসে শানু। বলে, আনলা তাইলে দোস্ত। আর দেরি দেখলে তোমারে আমি ফোন দিতাম।

শানু।

কি?

আমার ডাইনে বইসা আছেন দোস্ত মানুষ গালিব ভাই। নাটক বানান উনি।

শানু বলে, স্লামালাইকুম গালিব ভাই।

ওয়াইলাকুম সালাম। অঘোর দা আসতে পথে আপনার কথা বলছিলেন।

এতে শানু থমকে প্রশ্ন করে, দোস্তে কি আমার কোন বদনাম কয় নাই আপনেরে?

গালিব হেসে জবাব দেয়, কোথায়! বরঞ্চ আপনার প্রতি খুবই বন্ধুত্বপরায়ণ মানুষ উনি।

হুরন ডাকে, শানু ভাই।

কি?

মেমানরে কোল ড্রিংক খাওয়াইবা

না? বোতলডা দেও আমার দিকে। গেলাসে ঢালি। বাট্টুরে তোমগো তামু বানাইতে দিছি। তুমি ছোবাডা জ্বালাইলে পার।

চারদিকে মানুষজনের প্রবল হট্টগোলই জেগে আছে। ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে বসেছে অনেকগুলো গাঁজার আসর। লাল শাড়ি পরিহিতা হুরন বিবির এখানটাতে জায়গা নিয়েছে গোটা বারো খরিদ্দার। মাঝে গালিবের দিকে ফিরে অঘোর মণ্ডল জিজ্ঞেস করেন, কি, এখানে আইসা অসুবিধা বুঝতাছেন?

না, কোথায়! উল্টে আপনার রশীদ পাগলার মাজারে এসে বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ পাচ্ছি।

হুরন বিবি প্লাসটিকের গ্লাসে ঠাণ্ডা পেপসি পরিবেশন করে। আর কল্কি তৈরি হয়ে যেতেই ও তা এগিয়ে দেয় অঘোর মণ্ডলের দিকে। বলে, দাদা, সেবা লন। আপনার জন্যে মোহিনী তামু আনাইয়া রাখছিলাম। খান, ঘেরান পাইবেন।

মেকআপম্যান কল্কি নিজের হাতে তুলে নিলেও পরমুহূর্তে সেটা বাড়িয়ে দেন গালিবের দিকে। আর জিজ্ঞেস করেন, আপনে তো গাঞ্জা খান সিগারেডে ভইরা। এইডা চলে নি?

সব পারি দাদা। তবে শুরুটা আপনাকে দিয়েই হোক।

না, না, আপনে খালি আমার ক্যান, শানু, হুরনেরও অতিথি। তাই আপনে আগে।

এমন আহ্বানে গালিব কল্কিতে কষে দম নেয়। তারপর সেটা অঘোর মণ্ডল, শানু হয়ে উঠে যায় হুরন বিবির মুখেও। মেকআপম্যান ডাকেন, শানু।

কও।

আয়, তরে মেকআপ লওয়াই।

হুরন বিবি আপত্তি জানায়, না, দাদা, আমারে পার্বতী বানান আগে।

এতে শালু কাপড় পরিহিত গাট্টাগোট্টা শানু হেসে বলে, দোস্ত, ওর সখডা মিডাও আগে।

সেই কথায় অঘোর মণ্ডল এগিয়ে বসেন হুরন বিবির সামনে। ঝটপট হাতে তিনি ওর মেকআপটাও সেরে ফেলেন। এই দৃশ্যে আশপাশে থাকা গাঁজার আসর থেকে অনেকেই উঠে এসে ভিড় জমায় এখানটায়। তারই মাঝে পিছন ফিরে মেকআপম্যান তুলি হাতে শিবের সাজ পরাতে প্রথমেই তার কপালে এঁকে দেন শিবের ত্রিনয়ন।

ভিড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করেন খুবই লম্বাচওড়া এবং স্বাস্থ্যবান এক চুলওয়ালা মানুষ। তার পরনে কালো লুঙ্গি, কালো পিরহান। দু'হাতে ঝুলছে ফলফলাদিতে ঠাসা দু'খানা পলিথিনের ব্যাগ। বলেন, হুরন, রাখ।

সেগুলো তুলে নিতে নিতে হুরন ডাকে, কাবুলি ভাই, বসেন। আপনেরে দেইখা দিলডা খুশ হইয়া উডল।

না। কাম আছে। রাইতে কল দিস আমারে।

পরমুহূর্তে ভিড়ের ফাঁক গলিয়ে মানুষটা মিলিয়ে যায় ওই ভিড়ের মধ্যেই। অঘোর মণ্ডল শানুর দিকে ফিরে চাপাস্বরে বলে ওঠেন, দেখলি কাবুলি ভাইয়ের সঙ্গে হুরনের কেমুন পিরিত। তুই তো ওর পিছে খরচা কইরাই মরলি। মাঝে ওয়ে তরে শুধুক উরাত দেখাইয়া গেল। ছুঁইয়া কি দেখলি?

হুরন বিবির সামনে পিছনে, ডানে-বাঁয়ে লেগেছে গাঁজাখোরদের ভিড়। ওর পার্বতী সেজে ওঠার ঘটনায় বিস্তর কৌতূহলী দর্শক উপচে পড়েছে। এতে বেড়েছে গাজার বিক্রি। মাঝে বসে হুরন বিবি কাবুলি ভাইয়ের দেয়া ফলফলাদি থেকে তিনখানা আপেল বের করে ধরিয়ে দেয় অঘোর মণ্ডল, শানু আর গালিবের হাতে। বলে, খান আপনেরা।

মেকআপ নিতে থাকা শানুর দু'চোখ বুজে আছে। আসলে নেশাই জমেছে তার মধ্যে। তাই টলে উঠতেই অঘোর মণ্ডল ধমক লাগান, এত্ত লড়লে-চড়লে তরে আমি শিব সাজামু কেমনে?

হুরন বিবি ডাকে, দাদা।

কি?

আয়না থাকলে বুঝতাম কেমুন পার্বতী হইছি। উপরে উপরে সাজ লইলে কি হইবো, আন্তাডায় মোডে শান্তি নাই দাদা।

ক্যান?

বাতের বিষে মরি। কত্ত ওষুধ খাইলাম! কি হইলো কাম?

তারপর ও নিজের দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে বলে, ইস, কি যে বিষ। শানু ভাই, তুমি আমার পা দুইডা যদি এট্টুন টিপা দিতা!

সেই ডাকে শিব সাজা ফেলে একান্ত বশংবদের মতো হুরনের পা টিপতে বসে যায় শানু। আর অঘোর মণ্ডলের দিকে ফিরে বলে, দোস্ত, তুমি না কইলা ওয়ে আমারে উরাত দেখাইয়াই যাইতাছে। কই, এই দেখো, হুরনের উড়াত কেমুন টিপ্পা দিতাছি। পারছি, পারছি কিন্তুক আমি।

সেই পারা না পারার অতল একমাত্র ঈশ্বর স্পষ্ট জানেন। মানুষ কিবা পাবে তার ঠাঁই। তবে তার এই উক্তিতে বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটবার মতো করে হুরন বিবির হঠাৎ লাথি খেয়ে শানু ছিটকে পড়ে সামনে বসা ক'জন গঞ্জিকাসেবীর উপর।

সঙ্গে সঙ্গে সামনে বসা লোকজন প্রবল হট্টগোল বাঁধায়। গালিব কিন্তু অনড় দেখে চলে সবই। এ কোনো নাটকের দৃশ্য হলে ডিরেকটরিয়াল এঙ্গেল থেকে সে 'কাট', 'কাট', বলে উঠত। তবে জীবন তো নাটক নয়– দৃশ্যমানতার পাশাপাশি অনুভবই হচ্ছে তার সমান্তরাল নির্ণায়ক। সেখানটায় 'কাট', 'কাট', প্রযোজ্য নয়। জীবনের এই চলমানতায় সে ইতুর সঙ্গে নিজের, মোহন ভাইয়ের সঙ্গে পাপিয়া আর হুরন বিবির সঙ্গে শানুর গড়ে ওঠা সম্পর্কের মাঝে ধেয়ে আসা নীল নীল সব ছায়াপাতই নিরিখ করে চলে।

লোহার অজগর

জাকির তালুকদার

পটভূমি:

এই দেশে মানুষে মানুষে ভাত-কাপড়ের মতো রোদ-বৃষ্টি-বাতাসের বণ্টনেও বড় বেশি অসমতা। অঞ্চল থেকে অঞ্চলে এই ফারাক মাঝে মাঝে এত বেশি যে, আল্লাহ যাকে মেঘ আর বৃষ্টি বণ্টনের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন, সেই ফেরেশতাকে মানুষের শাপমান্যিও শুনতে হয়। বিদেশী স্যালো মেশিন, ডিপ মেশিন আসার পরেও, এখনও, এই জনপদের ভূমি আর আকাশসর্বস্ব ছোট কৃষকদের তাকিয়ে থাকতে হয় আকাশের দয়ার দিকেই। কারণ পাশের দেশ বাঁধের পর বাঁধ দিয়ে আটকে দেয়ায় নদী নামের জলবাহী ধারাগুলো তো অনেক যুগ থেকেই শুকাতে শুকাতে এখন যেটুকু দয়া দেখায় তা আর ভাটির দিকে নামতে পারে না, উজানেই তার মূলধন শেষ হয়ে যায়। কাজেই প্রত্যেক মৌসুমেই ধানচারার পুষ্টির জন্য কৃষকদের প্রার্থনা করতে

৯—

হয় 'আল্লা মেঘ দে পানি দে' বলে। বছর পঁচিশ আগে সেই রকম খরায় পড়েছিল তালেবপুর মৌজার আঠারো গ্রামের কৃষক। মনে হচ্ছিল ফেরেশতা কিছুতেই এই মৌজায় বৃষ্টির বরাদ্দ দিতে রাজি নয়। ফাটা ফাটা ক্ষেতের মধ্যে কোমর গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকা ধানচারাগুলোকে মনে হচ্ছিল আগাম দুর্ভিক্ষের সংকেত। যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে ধান হবে না। ধান না হলে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা দুরূহ তো হবেই, সেইসঙ্গে ভেঙে যাবে আঠারো গাঁয়ের শতখানেক তরুণীর বিবাহ। যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে বড় কষ্টের পথ বেয়ে মৌজার যে জনাদশেক ছেলেকে পাঠানো হয়েছে দূরের শিক্ষাশহর থেকে শিক্ষার আলো নিয়ে আসার জন্য, বন্ধ হয়ে যাবে তাদের লেখাপড়া। 'শিক্ষার আলো না পেলে মানুষ হয় পশুর সমান' প্রবাদ শুনে স্কুলে দেওয়া হয়েছে যেসব ছেলেমেয়েদের, তাদেরকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাঠাতে হবে দূরে-কাছের গঞ্জে কাজের সন্ধানে। কাজেই বৃষ্টিই তখন জীবনের একমাত্র আশ্বাস। কিন্তু বৃষ্টি তো নামে না!

পীরসাহেবের গদিনশীন খলিফাকে গিয়ে ধরলে তিনি এস্তেখারার নামাজ পড়াতে রাজি হতে চান না। বলেন যে, মৌজার মানুষ আল্লাহর নামে আরও কিছুদিন সবুর করুক। কিন্তু সবুরে মেওয়া না ফলায় অধৈর্য মৌজার মানুষ অন্য জেলা থেকে মওলানা আনার তোড়জোড় করায় মুরিদ ধরে রাখার স্বার্থে পীরসাহেবকে রাজি হতে হয়। খাড়া রোদের মধ্যেও এস্তেখারার নামাজে ঝেঁকে এসেছিল মৌজার মানুষ। যারা বছরে দুই ঈদের নামাজও ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে, তারা পর্যন্ত এসেছিল এস্তেখারার নামাজে। কিন্তু নামাজের তিনদিন পরেও বৃষ্টি তো দূরের কথা, মেঘেরও দেখা নেই। পীরসাহেব নিজের মান বাঁচাতে বলেন যে, বৃষ্টি অবশ্যই হতো যদি কোনো জেনাকারি না থাকত সেই নামাজের জামাতে। এখন যে বা যারা জেনা করেছে, তাদের পাপের সাজা ভোগ করতে হবে মৌজার সবাইকে।

এরপরে উপায়হীন গাঁয়ের মানুষ শুরু করল গাঁয়ে গাঁয়ে ব্যাঙের বিয়ে। রোজ চাল-ডাল চাঁদা তুলে ঢোলক বাজিয়ে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু ব্যাঙও ডাকে না, বৃষ্টিও নামে না।

এখন!

এখন তাদের জানামতে আর বাকি আছে একটাই পথ। কিন্তু সেটি যে বে-শরিয়তির চূড়ান্ত! কয়েকজন ফুঁসে ওঠে– কীসের বেশরিয়তি? জান বাঁচান হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফরজ। জান বাঁচানোর বেলায় শরা-শরিয়ত বলে কিছু থাকে না। সব শরিয়ত স্থগিত হয়ে যায় তখন। এই মছলা জানার জন্যে মোল্লার কাছে যেতে হয় না। সবাই জানে।

তখন আয়োজন করা হয় 'হুদমা দেওয়ের বিয়ের। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ঝড়-ঝাঁপ্টায় এখনও যে তলে তলে বেঁচে আছে হুদমা দেও, সেটাই বা কে জানত! যে বুড়ি গাঁয়ে গাঁয়ে জড়িবুটি বেচে বেড়ায়, সে হিন্দু না মুসলমান কেউ জানে না, সেই বুড়ি সোজাসুজি বলে যে, হুদমা দেও নিজেই এখন নীরস-রুক্ষ-ক্রুদ্ধ। সেই তো আদি বৃষ্টির দেবতা। সে বহুদিন নারী-সঙ্গমের অভাবে অতৃপ্ত। তাকে তৃপ্ত না করালে সে বৃষ্টি ঝরানোর ইচ্ছা বা ক্ষমতা– কোনোটাই ফেরত পাবে না। অতএব তাকে নারী-সঙ্গমের বিশল্যকরণী দিতে হবে।

আঠারো যুবতীকে বেছে নেওয়া হলো। মৌজার সীমান্তে শুকিয়ে যাওয়া তালপুকুরের পাশে পূর্ণিমা রাতে বানানো হলো হুদমা দেওয়ের মূর্তি। হুদমা দেও তো উদোম মানে ন্যাংটো অবশ্যই। কলাগাছের নরম থোর দিয়ে বানানো মাটির সমান্তরালে উচ্ছ্রিত লিঙ্গ। পূর্ণিমা রাতে আঠারো নগ্ন যুবতী হুদমা দেওকে ঘিরে নাচে আর তাকে সঙ্গম সুখ দেয়। একবার নয়, বারবার দেয়, সারারাত ধরে দেয়।

এবার হাতে হাতে ফল। ভোর না হতেই, আর সেই নাচ-সঙ্গমের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগেই দীর্ঘদিনের নির্মেঘ ধূসর আকাশ ছেয়ে গেল গুরুগুরু শব্দে ডাকা মেঘে। ভোরের আলোর সাথে পাল্লা দিয়ে এলো বৃষ্টি।

আর আঠারো যুবতীর মধ্যে নন্দ বাউলের যুবতী কন্যা শিউলি হলো গর্ভবতী।

সারা গাঁয়ের সকল নারী শিউলিকে যত্ন করেছিল পুরো গর্ভকাল। সে যখন পাঁচ মাসের পোয়াতি তখন মারা গেল নন্দ বাউল। বাপের অভাব তাকে টেরই পেতে দিল না গাঁয়ের মানুষ। পুরো গর্ভকাল আরামে-আয়েশে কাটিয়ে হুদমা দেওয়ের 'ছাওয়াল' জন্ম দিয়ে আঁতুর ঘরে নিজেও মরল শিউলি। তারপর থেকে হুদমা দেওয়ের 'ছাওয়াল' এখন গোটা মৌজার ছাওয়াল।

০২.

আধা-মানুষটাকে দেখলেই এখন গ্রামের কারও কারও মাথা গরম হয়ে ওঠে। কেননা বর্ষীয়সী নারীমহলের বাইরেও গ্রামের কেউ কেউ এখন তার জন্মবৃত্তান্ত আঁচ করে ভাসা-ভাসা ভাবে। নিশ্চিত না হলেও তারা জানে যে এই আধা-মানুষটার বর্তমান উপস্থিতিও যেমন স্বাভাবিক নয়, তেমনই তার আবির্ভাবও স্বাভাবিক নয়। অন্তত আর সব মানুষের মতো গতানুগতিক নয়। গ্রামের যারা তার মতো বয়সের লেখাপড়া জানা যুবক-যুবতী, তারা গ্রামের বয়স্কা

মহিলাদের কাছে তার বাড়তি সমাদর পাওয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে দেখেছে যে, যাদের কাছে এই রহস্যের চাবি, তারা নিজেদের মুখকে কী এক আশ্চর্য সংযমের সাথে তালা দিয়ে রাখতে পারে এই আধা-মানুষটার প্রসঙ্গ উঠলেই। অথচ সেই মহিলাদের মধ্যে অনেকেই মুখরা হিসাবে পরিচিতা। কারও কারও তো নামের সাথে যুক্ত হয়েছে 'প্যাঁচালি' কিংবা ' ট্যানডেস্টার রেডিও' অভিধাও। যেহেতু তারা গল্প জুড়তে পারলে আর থামতে চায় না; বরং শ্রোতার বিরক্তি-পছন্দের তোয়াক্কা না করে কথা চালিয়ে যায় অনর্গল। কিন্তু এই আধা-মানুষটার প্রসঙ্গ ওঠামাত্র সেই প্যাঁচালিরাও তৎক্ষণাৎ ঠোঁট সেলাই করে নেয় অদৃশ্য সূঁচ-সুতা দিয়ে। 'ট্যানডেস্টার রেডিও' যেন অদৃশ্য কেউ বন্ধ করে দেয় বোতাম ঘুরিয়ে। দশগ্রাম জুড়ে আধা-মানুষটাকে সবাই ডাকে 'ছাওয়াল' বলে। সেই 'ছাওয়াল'-এর প্রসঙ্গে তারা কোনো কথা বলতে রাজি নয়। অথচ কোনো বাড়িতে পিঠা তৈরি হলে জামাই-ঝি, নাতি-নাতনির পাতে না তুলে দিয়ে প্রথম পিঠাটি তুলে রাখা হয় ছাওয়ালের জন্য। নতুন চালের ক্ষীর-পায়েসের প্রথম লোকমা মসজিদে-মন্দিরে-পীরের দরগাতে না গিয়ে যায় ছাওয়ালের মুখে। গেরস্থের বাড়ির কোণ ঘেঁষে ছাইগাদায় বেড়ে ওঠা কলার ঝাড়ে প্রথম কাঁদি এলে সবচেয়ে দবজ কলাটি ওঠে ছাওয়ালের মুখে। ছাওয়াল ইচ্ছে হলে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। ইচ্ছে হলে সারাদিন ঘুমায়। তাকে কোনোদিন কোনো ক্ষেতে-আলে এক কোদাল মাটি কাটতে দেখে নি কেউ। তাকে কেউ কোনোদিন কোনো কাজ করতেও দেখে নি। কিন্তু তার খাদ্যের অভাব নেই। তার পরনের কাপড়ের অভাব নেই। তার ঘরের চালা ঝুরঝুরে হয়ে গেলে গাঁয়ের ঘরামিরা বিনা মজুরিতে চাল ছেয়ে দিয়ে আসে। ঘরের বেড়া ভেঙে গেলে বেড়া বেঁধে দিয়ে আসে। চালার খড় বা বেড়ার খলপা যোগাড়ও করে তারা নিজে। ছাওয়াল কাউকে বলেও না তার ঘর ঠিক করতে। কাউকে বলেও না তার কিছু চাই কি না। ঘরামিরা তার ঘর মেরামত করে, সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কাজ করতে করতে কোনো ঘরামি বিড়ি ধরালে সে আগে তুলে দেয় ছাওয়ালের হাতে। ছাওয়াল ইচ্ছে হলে দুইটান দিয়ে বিড়ি ফিরিয়ে দেয় দাতার হাতে, ইচ্ছে হলে পুরোটাই টানে ফুক ফুক করে। কেউ তার কাছে বিড়ির অবশেষ চেয়ে নেয় না। তার ধূমপানের তৃপ্তিতে কেউ হস্তক্ষেপ করে না। তাকে আয়েশের সাথে বিড়ি টানতে দেখলে ঘরামি বুঝে নেয় যে ছাওয়াল এই বিড়ি পুরোটাই টানবে। সে তখন আর একটা ধরায়। গেরস্থ কোনো ঘরামিকে ঘর ছাওয়ার কাজে নিয়োগ দিলে নিজেও পাশে পাশে থাকে। পরখ করে কাজটি তার মনমতো হচ্ছে কি না। ছাওয়ালের সেসব চিন্তা নাই। সে যখন খুশি চলে যায়। ঘরামি কী করছে না-করছে তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নাই। ঘর ছাওয়ার কাজ হয়ে গেলে যে মেঝে-বারান্দা-বিছানা পরিষ্কার করতে হবে, তা নিয়েও ছাওয়ালের কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। আশপাশের বাড়ি থেকে কোনো যুবতীকে-তরুণীকে পাঠাবে তার মা। সে এসে করে দিয়ে যাবে সেসব কাজ। অন্যদিনও তার ঘর-দুয়ার-বিছানা পরিষ্কার করার কাজ করে দিয়ে যায় কোনো-না-কোনো বাড়ির মেয়ে এসে। কেন করছে তা তারা জানে না। শুধু জানে এভাবেই চলে আসছে, এভাবেই ছাওয়ালের সব কাজ করে দিয়ে যায় অন্য মানুষ, তাকে খাওয়ায় অন্য মানুষ, তার যা যা প্রয়োজন তা মেটায় অন্য মানুষ। ছাওয়াল শুধু উপস্থিত থাকে গাঁয়ে। শুধু উপস্থিতই থাকে। যেমন বাতাস উপস্থিত থাকে, কিন্তু আছে কি না বোঝা যায় না, যেমন শীতের দিনে নদী দু'পাশ থেকে বুঁজতে বুঁজতে পরিণত হয় মরাচিহ্নে, আবার বর্ষায় মনে করিয়ে দেয় যে সে জাতে আসলেই একটি নদী; তখন গ্রামবাসীকে মেনে নিতে হয় যে এটা আসলেই আমাদের সেই নদীই। সেই রকম ছাওয়াল সামনে না থাকলে কেউ মনেও রাখে না সে আছে কি না, কিন্তু সামনে এসে দাঁড়ালেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয়া হয় তার পাওনা। ষোলো আনার উপরে আঠারো আনা। কিন্তু গাঁয়ের মানুষের কাছে তার এই রকম একটি আসন কেন, কবে থেকে তার পাওনার উৎপত্তি, নিষ্কর জমির মতো এই নিশ্চিন্ত জীবনযাপন কেন তার পাওনা, সেই প্রশ্ন কেউ তুললে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। শিক্ষিত কোনো ছেলে বেশি চাপাচাপি করলে কোনো প্রৌঢ়া রেগে গিয়ে বড়জোর এইটুকু বলে যে, শিক্ষার গমক দেখানোর কোনো অধিকার এই গাঁয়ের কোনো শিক্ষিত পোলার নাই, কারণ ছাওয়াল না থাকলে টাউন থেকে ঝুড়ি ভরে বিদ্যা আনা তার কপালে জুটত না। এই ধরনের উত্তর শিক্ষিত ছেলেদের কাছে উত্তরের বদলে বরং আরও বেশি প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতে থাকে।

কিন্তু খাওয়া-পরা নিয়মিত পেলে, কিংবা মাথার ওপরে চালা আর চারপাশে বেড়ার আচ্ছাদন পেলে, কিংবা শীতে-বর্ষণে পছন্দের পিঠে-পুলি আর ঘি-ছিটানো ডিম-খিঁচুড়ি পেলেই যে ভর-ভরন্ত একজন জোয়ানের সব পাওয়া হয়ে যায় না, এই কথাটা একবারের জন্যেও মনে আসে নি গাঁয়ের মানুষের। তবে আলেয়া ঠিকই টের পেয়েছিল। ছাওয়ালের ভিটার সবচেয়ে কাছের বাড়ির বাদশা মিয়ার মেয়ে আলেয়া। যেহেতু সবচেয়ে কাছের বাড়ি, তাই ছাওয়ালের ঘরের কাজও

অন্যদের তুলনায় একটু বেশিই করে দিতে হয় বাদশা মিয়ার বাড়ির মেয়েদেরই। আলেয়া এই রকমভাবে আসছে ছোটবেলা থেকেই। আগে আসত আলেয়ার মা-দাদিমা। আলেয়া একটু একটু করে বড় হয়েছে, আর তার ওপর মা-দাদিমা একটু একটু করে ছেড়ে দিয়েছে ছাওয়ালের ঘরের দায়িত্ব। আলেয়া আসে ছাওয়ালের ঘরের কাজ করতে। ছাওয়াল ঘরে থাকলে টুকটাক কথা বলে, মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাশা-খুনসুটিও করে। ছাওয়াল সব ঠাট্টার মানে ঠিকমতো বোঝে না। কিন্তু তাতে আলেয়ার হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়া আটকায় না। সেসব গল্প আলেয়া বাড়িতে গিয়ে শোনায়ও বাড়ির মানুষদের। ছাওয়াল যেহেতু দুনিয়াদারির কিছু বোঝে না, তাকে কিছু বুঝতেও হয় না, তাই তার কথার মধ্যে থাকে অনেক আবোল-তাবোল। সেসব গল্প বাড়ির মানুষকে শুনিয়ে হাসায় আলেয়া। দুনিয়াদারির তুলনায় ছাওয়াল যে ছাওয়ালই রয়ে গেছে, তা ভেবে বেশ কৌতুক অনুভব করলেও গাঁয়ের মানুষ সবাই একমত যে এরকমই হওয়ার কথা। কারণ ছাওয়াল তো আর তাদের মতো স্বাভাবিক মানুষ নয়। পুরো মানুষও নয়। কেননা যা যা থাকলে একজন মানুষকে আস্ত একজন মানুষ বলে মেনে নেয় গাঁয়ের মানুষ, তার অনেকগুলিই নেই ছাওয়ালের। গাঁয়ের মানুষ শুধু এটুকু জানে যে কোনো এক কারণে গোটা গাঁয়ের সবাই তাদের অস্তিত্বের জন্য 'ছাওয়াল-সংক্রান্ত' কোনো একটা কিছুর জন্য ঋণী। তারা তাদের ঋণ শোধ করে চলেছে ছাওয়ালকে দুনিয়াদারির চিন্তা থেকে মুক্ত রেখে। তারা আলেয়ার কাছ থেকে ছাওয়ালের শিশুসুলভ কাণ্ড-কারখানার গল্প শোনে, আর প্রশ্রয়ের হাসিতে প্রসন্ন হয়ে ওঠে। ইজের-পরা . বয়স থেকে আলেয়া দেখ-ভাল করছে ছাওয়ালের। এখন সালোয়ার-কামিজ পার হয়ে শাড়িতে উন্নীত হওয়ার পরেও তার ওপর কোনো বিধিনিষেধ জারি হয় নি। আসলে বিধিনিষেধ জারি হয় নি ছাওয়ালের ওপর। কারণ সে যে ছাওয়াল! কিন্তু আলেয়া টের পেতে থাকে, ছাওয়াল

এখন আসলে যুবক। তার গা থেকে এখন ছিটকে বের হয় পুরুষ-পুরুষ গন্ধ। ঘরের মেঝে ঝাঁট দিতে দিতে আলেয়ার মাথা মাঝেমধ্যে ঝিমঝিম করে ওঠে। কোনো কোনো সকালে ঝাঁপ ঠেলে ছাওয়ালের ঘরে ঢুকে তাকে ঘুমন্ত দেখে কাজ শুরু করে। কাজ করতে করতেই হঠাৎ ছাওয়ালের বিছানার দিকে তাকিয়ে ছ্যাঁৎ করে ওঠা বুক নিয়ে আলেয়া দেখতে পায় সে আলেয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে অন্যরকম এক দৃষ্টিতে। সেটি যে জোয়ানপুরুষের দৃষ্টি তা বুঝতে অন্য দশটা মেয়ের মতো আলেয়ারও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। সে তখন রেগে উঠবে, নাকি বিব্রত হবে, নাকি খুশি হবে, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু তাকে বাকি কাজ শেষ করতে হয় ঢিবঢিব করা বুক নিয়েই। তার হাত-পা ভারি পাথর হয়ে যেতে চায়। এত দুর্বল মনে হয় নিজেকে যে সে বাড়ি ফিরতে পারবে কি না সন্দেহ! আকুল হয়ে খোদাকে ডাকে– আল্লা, তুই মোক আজ বাড়ি ফিরায়া ন্যান। হামি কাল আর আসিম না!

কিন্তু পরদিন আলেয়ার পা তাকে ঠিকঠিক পৌঁছে দেয় ছাওয়ালের ভিটায়। ছাওয়ালের মধ্যে কী যে এক আকর্ষণ! আর যেদিন কানাই শীল আসে, সেদিন তো আর ছাওয়ালের দিক থেকে চোখই ফেরাতে পারে না আলেয়া। ছাওয়ালের নিজের চুল-দাড়ি-গোঁফ কোনোটারই খেয়াল থাকে না। কিন্তু কানাই শীল খেয়াল রাখে। গাঁয়ের অন্য মানুষ ছাওয়ালের ভাত-কাপড়-বসতভিটার দায়িত্ব নিয়েছে। কানাই শীল নিজের ঋণ শোধ করে দুই-তিনদিন পর পর এসে ছাওয়ালের খেউড়ি করে দিয়ে। খেউড়ি করার পর দাড়ি-গোঁফের আড়াল থেকে যে উজ্জ্বল যুবকটি বেরিয়ে আসে তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না আলেয়া। নিজের কাছে নিজেই স্বীকার করে– এই মানুষডা তো হামার আব্বার চায়তেও সোন্দর বাহে!

আলেয়ার আব্বা বাদশা মিয়া এই তল্লাটের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ। এই ভাটি-বয়সেও তার পাশে দাঁড়ায় এমন যুবক খুঁজেই পাওয়া যায় না। শহরের ফ্যাশন শিখে আসা তরুণদেরও বাদশা মিয়ার পাশে নেহায়েত ফ্যাকশা দেখায়। জোরে কথা বলতে বা হাসতে শোনা যায় না বাদশা মিয়াকে। কিন্তু মন ভালো থাকলে কারও দিকে যদি একবার তাকিয়ে হাসে, তবে সেই হাসিতে মোহিত হয়ে যায় তার সবচেয়ে বড় শত্রুও। তরুণ বয়সে তার নাকি ছিল অসাধারণ গানের গলাও। সেই গান শুনে আর বাদশার ভুবনমোহিনী হাসি দেখে কত তরুণী যে কত রকম পাগলামি করেছে, তা নিয়ে এখনও আলেয়ার আড়ালে গল্প করে তার মা-দাদিরা। আলেয়া বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে দেখে আসছে তার বাবার মতো সুন্দর পুরুষ এই গাঁয়ে আর একজনও নাই। বিকালে যখন দুপুরের আরামের ভাতঘুমের পরে সতেজ মুখ নিয়ে, ধবধবে কাপড় পরে, হাতে তিন ব্যাটারির টর্চটা নিয়ে আব্বা গঞ্জের গদির দিকে রওনা দেয়, তখন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে আলেয়া। ইউসুফ নবীর মতো এমন সুন্দর মানুষ তার আব্বা, ভেবে গর্বে বুক ফুলে ওঠে আলেয়ার। কিন্তু খেউড়ি করার পরে ছাওয়ালের মুখের দিকে তাকালে সেই আব্বার মুখটাকেও বুড়োটে-মলিন মনে হয় আলেয়ার কাছে।

সেই কানাই শীলই এক রোদ-না-ফোটা সকালে ছাওয়ালের খেউড়ি করতে এসে দেখতে পায়, আলেয়া আবেশে চোখ বন্ধ করে চিত হয়ে শুয়ে আছে মেঝেতে, আর দুনিয়াদারি না বোঝা হুদমা দেওয়ের ছাওয়াল আলেয়ার বুকের আঁচল-ব্লাউজ সরিয়ে সাদা-পলির মতো নরম বুকে প্রবল বেগে ঘষে চলেছে নিজের মুখ।

দশদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে তন্ন তন্ন করে ভাবার পরে পরিবারের জীবিত মুরুব্বি আলেয়ার দাদি, তার পুত্র বাদশা মিয়ার প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করে সিদ্ধান্ত জানায়– গাঁয়ের ভালোর জন্যেই আলেয়ার সাথে ছাওয়ালের বিবাহ দেওয়া হোক।

কিন্তু বাদশা মিয়া এককথায় নাকচ করে দেয় এই প্রস্তাব। শুধু নাকচ করাই নয়, সে এককথায় জানিয়ে দেয় যে সে আর এই বিষয়ে কোনো কথা শুনতে পর্যন্ত রাজি নয়। তার বুড়ি মা তবুও সওয়াল-জবাবের চেষ্টা করলে চিরশান্ত বাদশা মিয়া খ্যাপা কুত্তার মতো খেঁকিয়ে উঠে মাকে ধমক লাগায়– তুই চুপ থাক বুড়ি! মিয়্যা মানুষ হয়া তোর দেওয়ানি করা লাগবি না।

শুধু বিয়েতে গররাজিই নয়, বাদশা মিয়া সাফ সাফ জানিয়ে দেয় যে আলেয়াকে আর কোনো কারণেই ছাওয়ালের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেওয়া চলবে না। যদি বাড়ির কেউ এই হুকুম অমান্য করে, তবে বাদশা মিয়া কসম কেটে বলে, তাকে সে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।

গাঁয়ের লোক জানে বাদশা মিয়া শান্ত স্বভাবের মানুষ। সেইসাথে এটাও জানে যে বাদশা মিয়া একেবারেই এক কথার মানুষ। তার কথার নড়চড় হবে না। কাজেই ছাওয়ালের সংস্পর্শে যাওয়ার সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায় আলেয়ার।

তখন ছাওয়ালের ঘরগেরস্থির কাজ করার জন্য জোনাবালির কন্যা জয়নবকে পাঠানোর কথা বলা হয়। জয়নাবের মা, এমনকি জয়নাব নিজেও এই দায়িত্ব

পেয়ে খুশি। কারণ গাঁয়ের সবারই বিশ্বাস যে ছাওয়ালের প্রত্যক্ষ সেবা মানেই সেবাকারী পরিবারের ওপর লক্ষ্মীর শুভদৃষ্টি পড়া। কিন্তু এতবড় সৌভাগ্য গ্রহণে মোটেও রাজি নয় খোদ জোনাবালি। তার সাফ কথা, জোয়ান মেয়েকে ছাওয়ালের কাছে পাঠাতে রাজি নয় সে। গাঁয়ের মানুষ তার এই সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চাইলে জোনাবালি রুক্ষস্বরে বলে যে সে কোনো কারণ দর্শাতে বাধ্য নয়, রাজিও নয়।

ছাওয়ালের ঘরে জঞ্জাল জমতে থাকলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মা-চাচি-দাদিদেরই গিয়ে কাজ করে আসতে হয়। তারা ঘর গোছানোর কাজ ভালোভাবেই সম্পন্ন করে বটে, কিন্তু দেখা যায় তাদের প্রতি ছাওয়াল যেন ঠিক প্রসন্ন নয়। ভোরে দরজা ঠেলে ঘরে কারও ঢোকার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছাওয়াল ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে। কী এক প্রত্যাশায় চকচকে দৃষ্টি নিয়ে তাকায় ঘরে-ঢোকা ব্যক্তির দিকে, কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে সে যেন হতাশ-অবসন্ন হয়ে আবার নিজেকে বিছানায় গড়িয়ে দেয়। মা-চাচিরা যতই বয়স্কা হোক, নারী তো বটেই। সবাই বুঝে ফেলে যে ছাওয়াল আসলে কী চায়, কাকে চায়। ছাওয়ালকে সন্তুষ্ট না রাখলে যে গাঁয়ের সমূহ অমঙ্গল, সেকথা তারা অনেক বছর যাবৎ শুনে আসছে। কিন্তু উপায়ই বা কী!

শেষে গাঁয়ের বর্ষিয়সী রমণীরাই প্রস্তাব পেড়ে বসে। অচেনা সর্বনাশের মুখোমুখি হওয়ার আশংকায় দিনের পর দিন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দিন কাটানোর চাইতে বরং গাঁয়ের কোনো সুলক্ষণা তরুণীর সঙ্গে ছাওয়ালের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হোক। গাঁয়ে বিবাহযোগ্যা তরুণীর সংখ্যা খুব একটা কম থাকে না কোনোদিনই। আট তরুণীর খোঁজ পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গেই। যেকোনো একজনের সাথে ছাওয়ালের শরিয়ত মোতাবেক মালাবদল করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। আর কোনো তরুণীই অরাজি নয় ছাওয়ালের স্ত্রী হতে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, কোনো তরুণীর বাপই রাজি নয় নিজের মেয়ের সাথে গাঁয়ের সৌভাগ্যের বরপুত্র ছাওয়ালের বিয়ে দিতে। তাদেরকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা চলে। কিন্তু তারা সবাই বাদশা মিয়ার মতোই একগুঁয়েভাবে অটল থাকে নিজের নিজের জেদে। এমনকি শত অনুরোধেও কেউ কারণ ব্যাখ্যা করা তো দূরের কথা, তাদের অরাজির কারণ সম্পর্কে সামান্যতম সূত্র দিতে পর্যন্তও রাজি হয় না। তারা আর্তস্বরে ক্ষমা চায়, রেগে ওঠে, চিৎকারের সাথে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হয়, এমনও জানায় যে তারা শান্তিস্বরূপ গাঁয়ে একঘরে হয়ে পর্যন্ত থাকতে রাজি আছে, এমনকি রাজি আছে নিজের হাতে নিজের মেয়েকে কেটে টুকরা টুকরা করে মরানদীতে ভাসিয়ে দিতে– কিন্তু ছাওয়ালের সাথে নিজ কন্যার বিয়ে দিতে রাজি নয়।

বাদশা মিয়ার সাথে তার সমবয়সী আরও আট মেয়ের বাপের চোখে চোখে কথা হয়। তাদের প্রত্যেককেই চূড়ান্ত বিভ্রান্ত দেখায়। উদভ্রান্তও। কিন্তু বাদশা মিয়াসহ তাদের নয়জনেরই সিদ্ধান্ত অটুট– গাঁয়ের যদি চূড়ান্ত সর্বনাশও হয়ে যায়, যদি অলৌকিক অভিশাপে তাদের গাঁয়ের পাশে মরা সাপের মতো শুয়ে থাকা মরানদীটা প্রমত্তা হয়ে ডুবিয়ে দেয় গোটা গ্রাম, যদি তাদের অরাজির ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে মাটি দু'ফাঁক হয়ে গিলে ফেলে খেত-খামার ঘর-বসতিসহ গাঁয়ের সকল মানুষকেও, তাহলেও তারা রাজি নয় ছাওয়ালের হাতে নিজের মেয়েকে তুলে দিতে।

আর কী কারণে তারা রাজি হচ্ছে না, সেই কারণটা জানাতেও রাজি নয় কেউ।

০৩.

ছাওয়াল! ছাওয়াল!

বাদশা মিয়ার গানের মতো সুরেলা কিন্তু চাপা কণ্ঠের ডাকে ছাওয়াল বিছানায় উঠে বসে। চোখ ডলে অন্ধকারের মধ্যেই আরেকটা জমাট লম্বাটে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে– কে বাহে? ও, বাদশা কাকা!

পরম মমতাময় গলায় বাদশা মিয়া ডাকে– ছাওয়াল চল!

কুণ্ঠে যামো কাকা?

রেলগাড়ি দেখবার যামো। হামি আর তুই।

রেলগাড়ি! এবার ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ায় ছাওয়াল– সেই রেলগাড়ি? লোহার অজগর সাপ? যাঁই প্যাটের মদ্যে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ গিলা ল্যায় আবার ওগড়ায়? এক জাগাত গিলা খায় আবার আরেক জাগাত গিয়া ওগড়ায়?

হ্যাঁ বাপ সেই রেলগাড়ি।

অন্ধকারেই ঠোঁট ফোলায় ছওয়াল– তুমি হামাক লিবার চাও, কিন্তু লাও না!

সান্ত্বনা দিয়ে হাসে বাদশা মিয়া– রেলগাড়ি তো সবসময় আসে না রে বাপ। তার আসার সোমায় হলে তখন আসে। এত বচ্ছর সোমায় হয় নি। এখন চল!

সোমায় হইছে রেলগাড়ি আসার?

হ্যাঁ বাপ। তাড়াতাড়ি চল। দেরি করলে রেলগাড়ি চলা যাবি। ফের যে কত বচ্ছর পরে আসে তা কে কবার পারে!

চলো কাকা চলো!

অন্ধকারে ছাওয়ালের হাত ধরে উঠোনে নামে বাদশা মিয়া। দ্রুত পায়ে হাঁটে। কোনো মাটির ঢেলায় হোঁচট খায় ছাওয়াল– আন্ধার কাকা। তোমার টর্চবাতি কুষ্ঠে?

ঘরে বাপ। পুন্নিমা রাত আছে। টর্চ দরকার নাই। চল পা চালা!

বাদশা মিয়ার কণ্ঠ বরাবরের মতোই মোলায়েম, কিন্তু হাতের মুঠি বজ্রের মতো শক্ত। ছাওয়াল আপত্তি জানায়– মুঠা কম শক্ত করেন বাহে! দুখ পাই।

বাদশা মিয়া হাসতে হাসতে বলে– তুই ছোট মানুষ, হাত ছাড়লে আন্ধারে হারায় যাবার পারিস। তাই হাত ধরে রাখি বাপ। পথ হারানের চায়ে একটু কষ্ট পাওয়া ভালো।

হাতের মুঠির চাপ একটুও না কমিয়ে চলার গতি আরও বাড়িয়ে দেয় বাদশা মিয়া। তার সাথে তাল মিলিয়ে ছুটতে হয় ছাওয়ালকে।

তারা হাঁটতে হাঁটতে মাঠ পেরিয়ে সড়কে ওঠে। ছাওয়াল জিজ্ঞেস করে– পুন্নিমা কুষ্ঠে কাকা? আলো দেখবার পাই না।

আকাশোত তাকা বাপ। তারা দেখতে পাস?

হ্যাঁ পাই।

ঐ তারার দিকত তাকায়া পথ হাঁট ছাওয়াল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় সময়ের হিসাব এবং হাঁটার হিসাব– দুইই হারিয়ে ফেলে ছাওয়াল। সে শুধু বাদশা মিয়ার মুঠির টানে পথ চলে। পথ চলে আর পথ চলে। তার সারা গায়ে ঘাম ছোটে। নিঃশ্বাস ছোট আর ঘন হতে হতে বুকে ব্যথা শুরু হয়। গলা শুকিয়ে বুকে হাপর পড়তে শুরু করে। তবু বাদশা মিয়া হাঁটায় ক্ষান্ত দেয় না। বরং তাকে ভয় দেখায়– সোমায় মতোন না পৌঁছালে রেলগাড়ি দেখবার পাবু না ছাওয়াল! একবার না দেখলে আবার কবে যে আসে! কবে যে আসে!

ঠিক। ছাওয়াল ভুলে যায় নিঃশ্বাসের কষ্টের কথা, বুকের হাপরের কথা, তৃষ্ণায় আক্রান্ত বুকের কথা। সে বাদশা মিয়ার হাতের টানে আকাশের দিকে মুখ রেখে ছুটে চলে। লোহার অজগর তাকে দেখতেই হবে। সেই ছোটবেলায় তাকে কথা দিয়েছিল বাদশা মিয়া। আজ এত বছর পরে সে তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করার জন্য ছাওয়ালকে নিয়ে যাচ্ছে রেলগাড়ি দেখাতে। এই সুযোগ ছাড়তে স্বল্পবুদ্ধির ছাওয়ালও নারাজ।

একসময় থামে বাদশা মিয়া। কথা বললে বোঝা যায় সে-ও হাঁপাচ্ছে। সে বলে– আমরা এখন রেলগাড়ি দেখবার পামো বাপ।

কুষ্ঠে কাকা? রেলগাড়ি তো দেখি না। খালি আন্ধার।

রেলগাড়ি আন্ধারেই আসে। তার দুই আগুনের চোখ আছে। সেই চোখে আন্ধার চিরতে চিরতে আসে। আসুক রেলগাড়ি। আয় আমরা ততক্ষণ শুই!

কুষ্ঠে শুবো কাকা?

এই যে জাগাত খাড়ায়া আছি, সেই জাগাতই শুই আয়।

তারা পাশাপাশি চিত হয়ে শোয়। ছাওয়াল খেয়াল করে তার ঘাড়ের নিচে এবং পায়ের হাঁটুর নিচে খুব শক্ত কিছু একটা লম্বালম্বি পেতে রাখা। সে জিজ্ঞেস করে– এইডা কী কাকা?

রেলগাড়ির নিশানা ছাওয়াল। এই নিশানা দেখতে দেখতেই রেলগাড়ি আসে।

চিত হয়ে শুয়ে অন্ধকারে আকাশ দেখতে দেখতে চোখ ক্লান্তিতে বুঁজে আসে ছাওয়ালের। সে ঘুমের মধ্যেই দূরে কোথাও মেঘ ডাকার শব্দ শুনতে পায়। কীসের শব্দ কাকা?

রেলগাড়ির শব্দ ছাওয়াল। রেলগাড়ি আসতিছে তোক আর হামাক লিতে।

হামরা কুষ্ঠে যামো কাকা?

তোর মায়ের কাছোত।

তুমি আর আমি দুইজনাই যামো কাকা?

হ্যাঁ বাপ, দুইজনাই যামো।

তুমি আর হামি?

হ্যাঁ বাপ। তুই আর হামি।

আর আলেয়া?

আলেয়া যে যাবার পারবি না!

মেঘ-গর্জনের মতো শব্দটি তখন অনেক কাছে এসে পড়েছে। শব্দ এত বেশি যে বাদশা মিয়ার মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়েও ছাওয়াল তার সব কথা শুনতে পাচ্ছে না। তারপরে হঠাৎ বিজলি হানার মতো করে আলো এসে পড়ল তাদের ওপর। এত তীব্র আলোতে অন্ধ হয়ে যেতে যেতেও মাথা উঁচুতে তুলে ছাওয়াল জিজ্ঞেস করে– ক্যান আলেয়া যাবার পারবি না ক্যান?

প্রচণ্ড আসুরিক শক্তিতে তাকে আবার শুইয়ে দেয় বাদশা মিয়া। এবার নিজে পাশে না শুয়ে ছাওয়ালের গায়ের ওপর নিজের সমস্ত ওজন চাপিয়ে শুয়ে পড়ে, যাতে একবিন্দু নড়ার শক্তি থাকে না ছাওয়ালের। লোহার অজগর ততক্ষণে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের ওপর। সেই অবস্থাতেও অসীম মমতা মাখা কণ্ঠে বাদশা মিয়া বলে– আলেয়া যে তোর বইন ছাওয়াল! গর্ভ দুইখান কিন্তু জন্মবীজ যে এক বাপ!
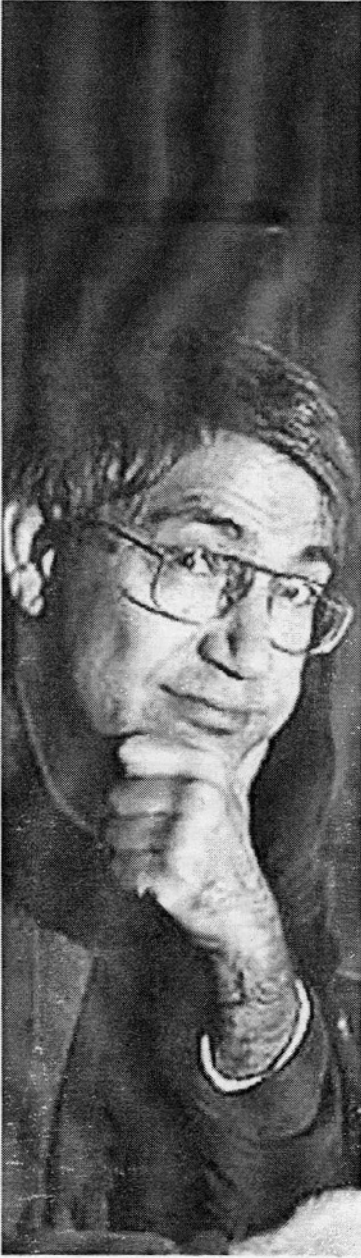
নিহিত লেখক

ওরহান পামুক

অনুবাদ : কবীর চৌধুরী

আমি ত্রিশ বছর ধরে লিখছি। এ কথাটি আমি এখন বেশ কিছুকাল যাবৎ বলছি। প্রকৃতপক্ষে, আমি এত বেশিকাল ধরে বলছি যে তা আর এখন সত্য নয়, কারণ লেখক হিসাবে আমি এখন আমার একত্রিশতম বর্ষে পা রাখছি। আমি এখনো অবশ্য বলতে ভালোবাসি যে ত্রিশ বছর ধরে আমি উপন্যাস লিখছি, যদিও এর মধ্যে সামান্য একটু অতিরঞ্জন আছে। মাঝে মাঝে আমি অন্য ধরনের লেখাও লিখি: প্রবন্ধ, সমালোচনা, ইস্তাম্বুল অথবা রাজনীতি সম্পর্কে আমার চিন্তাভাবনা, বক্তৃতা-ভাষণ। কিন্তু আমার সত্যিকার আন্তর প্রেরণা, যা আমাকে জীবনের সঙ্গে বেঁধে রাখে, তা হলো উপন্যাস রচনা। আরও বহু লেখক আছেন যাঁরা আমার চাইতে অনেক বেশি দিন ধরে লিখছেন, এ বিষয়টির উপর খুব বেশি নজর না দিয়ে অর্ধ-শতাব্দী ধরে লিখে যাচ্ছেন। কয়েকজন মহান লেখকও আছেন যাঁদের কাছে আমি বারবার ফিরে যাই : তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, টমাস মান, যাঁদের সাহিত্যিক জীবনের ব্যাপ্তি ছিল পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল... তাহলে সাহিত্যিক হিসাবে আমার ত্রিশতম বার্ষিকী নিয়ে আমি এত হৈ চৈ করছি কেন? করছি, কারণ একটা অভ্যাসরূপে লেখা, বিশেষ করে উপন্যাস লেখা সম্পর্কে, আমি কিছু কথা বলতে চাই।

সুখী হবার জন্য আমাকে প্রতিদিন আবশ্যিকভাবে আমার সাহিত্যের মাত্রা গ্রহণ করতে হবেই। এ ব্যাপারে আমি সেই রোগীর মতো যাকে প্রত্যেকদিন এক চামচ

ওষুধ বাধ্যতামূলকভাবে খেতে হয়। আমি যখন আমার শৈশবে, জানতে পারি যে, একজন ডায়াবেটিক রোগীকে প্রত্যেকদিন ইনজেকশন নিতে হয় তখন, সবার মতো, আমারও খুব খারাপ লেগেছিল। তখন আমি হয়তো তাদেরকে প্রায় অর্ধমৃত বলেও ভেবেছিলাম। সাহিত্যের উপর আমার নির্ভরশীলতাকেও আমাকে ওই রকমই অর্ধ-মৃত করে তুলতে হবে। বিশেষ করে আমি যখন তরুণ একজন লেখক ছিলাম তখন আমি অনুভব করেছি যে অন্যরা আমাকে বিবেচনা করতো বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি মানুষ বলে, এতই নিয়তিনির্দিষ্ট যে আমাকে সহজেই "অর্ধমৃত" বলা যেতে পারতো। অথবা যথার্থ অভিধাটি হয়তো হবে "অর্ধপ্রেত"। আমি মাঝে মাঝে এমনও কল্পনা করতে চেয়েছি যে আমি সম্পূর্ণ মরে গিয়েছি, তারপর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমার ভেতরে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করছি। সাহিত্য আমার জন্য একটা ঔষধ। অন্যরা যেমন চামচ দিয়ে কিংবা ইনজেকশনের মাধ্যমে তাদের ওষুধ গ্রহণ করে আমাকেও তেমনি আমার প্রতিদিনের সাহিত্যের মাত্রা গ্রহণ করতে হয় এবং তাকে কতিপয় মানদণ্ড রক্ষা করতে হয়।

প্রথমত; ওষুধটাকে ভালো হতে হবে। এটা কতটা খাঁটি এবং কার্যকর তার ভালোত্ব আমাকে তা বলে দেবে। একটা উপন্যাসে একটা ঘন, গভীর অনুচ্ছেদ পড়া, সেই ভুবনে প্রবেশ করা এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা, এর চাইতে বেশি আনন্দ আমাকে অন্য আর কিছু দেয় না, অন্য আর কিছু আমাকে জীবনের সঙ্গে এর চাইতে নিশ্চিতভাবে বেঁধে রাখে না। আর ওই রকম লেখকের মৃত হওয়াই আমি শ্রেয় মনে করি, কারণ তখন আমার প্রশংসাকে ছায়াচ্ছন্ন করার জন্য ঈর্ষার কোনো ক্ষুদ্র মেঘপুঞ্জ সেখানে উপস্থিত থাকে না। যত আমার বয়স বাড়ছে আমার বিশ্বাস তত দৃঢ় হচ্ছে যে সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি তাঁদের দ্বারা রচিত হয়েছে যাঁরা আজ আর জীবিত নেই। অন্যরা এখনো মৃত না হলেও এখন তাঁদের উপস্থিতি অনুভব করা যায় শুধু প্রেতাত্মার মতো। এই কারণেই রাস্তায় যদি বড়ো লেখকদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায় তখন আমরা তাঁদের সঙ্গে প্রেতাত্মার মতো আচরণ করি, দূর থেকে দেখে আমরা বিস্মিত হই, আমাদের চোখকে যেন আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না। কিছু সাহসী আত্মা তাঁদের অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য তাঁদের কাছে এগিয়ে যায়। কখনো কখনো আমি আমার নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিই যে এঁরা শিগগিরই মৃত্যুবরণ করবেন, আর একবার মৃত্যুবরণ করার পর, তাঁদের বইগুলি আমাদের হৃদয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আরও বেশি সমাদৃত স্থান অধিকার করবে। অবশ্য সবসময় তা হয় না।

আমি নিজে যা লিখছি তা যদি আমার সাহিত্যের দৈনন্দিন মাত্রা হয় তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়ায়। কারণ যারা আমার সঙ্গে আমার এই পীড়ার অংশীদার তারা জানেন যে এর সর্বোত্তম নিরাময় এবং সর্বোচ্চ সুখের উৎস হলো প্রতিদিন অর্ধ-পৃষ্ঠা উত্তম লেখা। গত ত্রিশ বৎসর ধরে আমি আমার ঘরে, আমার টেবিলে, একাকী বসে, গড়পড়তা দৈনিক দশঘণ্টা কাটিয়েছি। এর মধ্যে থেকে আপনি যদি প্রকাশযোগ্য ভালো লেখার হিসাব নেন তাহলে প্রতিদিনের গড়পড়তা লেখার পরিমাণ অর্ধ-পৃষ্ঠার চাইতে বেশ খানিকটা কমই হবে। আমি যা লিখি তার বেশিরভাগই আমার নিজের গুণগত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না। এই দু'টি জিনিসই আমার যন্ত্রণার প্রধান উৎস।

কিন্তু দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। যে লেখক সাহিত্যের উপর আমার মতো এত নির্ভরশীল তার পক্ষে নিজের লেখা বই-এর সৌন্দর্যে সুখী হবার মতো অগভীর হওয়া সম্ভব নয়, তাছাড়া সে কত কিছু অর্জন করেছে তার জন্যও সে কখনো নিজেকে অভিনন্দন জানাতে পারে না। সাহিত্য ওই রকম লেখককে বিশ্বজগৎকে রক্ষা করার ভান করতে দেয় না, বড়ো জোর, সে একটা দিন বাঁচাবার সুযোগ দেয়। আর দেখা যায় প্রতিটি দিনই কঠিন। যখন তুমি কিছু লেখো না, লিখতে পারো না, তখন দিনগুলি বিশেষ কঠিন হয়ে ওঠে। তখন যা করতে হয় তা হলো দিনটা কাটাবার জন্য যথেষ্ট আশা খুঁজে পাওয়া, আর যে বইটা অথবা যে পৃষ্ঠাটা তুমি পড়ছো তা যদি ভালো হয়, তার মধ্যে আনন্দ আর সুখ লাভ করা, যদি মাত্র একটি দিনের জন্য হয় তাহলে তাই।

যে দিন আমি ভালো কিছু লিখতে পারি না, অথবা কোনো একটা বই-এর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারি না সেদিন আমার মনের অবস্থা কেমন হয় একটু বুঝিয়ে বলি। প্রথমত : আমার চোখের সামনে পৃথিবীটা বদলে যায়, তা অসহ্য ও চরম ঘৃণ্য হয়ে ওঠে। যারা আমাকে চেনে তারা ব্যাপারটা ঘটতে দেখে, কারণ তখন আমার চারপাশে যে পৃথিবী আমি দেখি আমি নিজে তার মতো হয়ে যাই। যেমন, আমার মেয়ে বিকালের দিকে আমার মুখে গাঢ় হতাশার চিহ্ন দেখে বলে দিতে পারে যে, সেদিন আমি ভালো কিছু লিখতে পারি নি। ওর কাছ থেকে আমি এটা গোপন রাখতে চাই কিন্তু পারি না। ওই সব অন্ধকার মুহূর্তে আমার মনে হয় জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কোনো ভেদরেখা নেই। কারও সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছা করে না, সেটা ভালোই, কারণ আমার ওই অবস্থা দেখে আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছাও কারও হয় না। প্রতিদিন অপরাহ্ণে, একটা থেকে তিনটার মধ্যে, ওই রকম হতাশার একটা মৃদু সংস্করণ আমার উপর নেমে আসে। তবে পড়া আর লেখার মাধ্যমে আমি তার মোকাবিলা করতে শিখেছি।

আমাকে যদি আমার কালি কলমের চিকিৎসা ছাড়া এক নাগাড়ে দীর্ঘদিন কাটাতে হয়, সেটা ভ্রমণ, কিংবা গ্যাস বিল পরিশোধ না করা, কিংবা মিলিটারি সার্ভিসে যোগদান করার জন্য (একবার তা হয়েছিল), কিংবা কোনো রাজনৈতিক কারণে (ইদানীং তা কয়েকবার হয়েছে), অথবা অন্য যেকোনো কারণে হোক, তখন আমি অনুভব করি যে আমার ভেতরে যন্ত্রণা সিমেন্টের মতো চেপে বসছে। আমার শরীর সহজে নড়াচড়া করতে পারে না, আমার অস্থিসন্ধিগুলি শক্ত হয়ে যায়, আমার মাথা পাথরের মতো ভারি হয়ে ওঠে, আমার গায়ের ঘামের গন্ধ পর্যন্ত একটা ভিন্ন রূপ নেয়। এই যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা জাগে, কারণ জীবন সারাক্ষণ একটা মানুষকে সাহিত্যের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র করে। আমি হয়তো একটা জনাকীর্ণ রাজনৈতিক সভায় বসে আছি, কিংবা স্কুলের বারান্দায় সহপাঠীদের সঙ্গে আলাপ করছি, অথবা আমার আত্মীয়দের সঙ্গে বসে ছুটির দিনে একসাথে খাচ্ছি, আমার মনের সঙ্গে মিল নেই এমন একজন ভালো মানুষের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছি, কিংবা টিভির পর্দায় যাই দেখানো হচ্ছে তাই দেখছি, আমি হয়তো একটা জরুরি প্রয়োজনীয় মিটিং-এ আছি কিংবা সাধারণ কোনো একটা জিনিস কিনতে গিয়েছি কিংবা আইনঘটিত একটা কাজে নোটারির কাছে চলেছি, কিংবা ভিসার জন্য আমাব ছবি তুলতে যাচ্ছি–এমন সময় হঠাৎ আমার চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে আর তখন, মাঝদুপুর হলেও, আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আমি যখন বাড়ি থেকে দূরে থাকি, যখন একা সময় কাটাবার জন্য নিজের ঘরে ফিরতে পারি না, তখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা হলো দিন-দুপুরে সামান্য একটু ঘুমিয়ে নেওয়া।

পরিচিত ভুবনের বস্তুনিচয় দিয়েই আমি ওই নতুন ভুবন নির্মাণ করি। এইখানেই আমরা বিষয়টার মর্মমূলে পৌঁছে যাই। ভালো কিছু লিখতে হলে আমাকে প্রথমে বিক্ষিপ্তচিত্ত হতে হবে, বিরক্তি বোধ করতে হবে, জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।

তাহলে, হ্যাঁ, এখানে আসল ক্ষুধাটা সাহিত্যের জন্য নয়, বরং একটা ঘরের জন্য যেখানে আমি আমার নিজের চিন্তাভাবনা নিয়ে একা থাকতে পারি। ওই রকম একটা ঘরে আমি ওই একই জনাকীর্ণ জায়গাগুলি নিয়ে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন নির্মাণ করতে পারি, ওই সব পারিবারিক জমায়েত, স্কুলের পুনর্মিলনী, আনন্দোচ্ছল নৈশভোজ, ওই সব মানুষ যারা তাতে যোগ দেয়। স্বপ্নে, অবশ্যই, সবাই এবং সব কিছু হয়ে ওঠে কৌতূহলোদ্দীপক, চিত্তাকর্ষক এবং বাস্তব। পরিচিত ভুবনের বস্তুনিচয় দিয়েই আমি ওই নতুন ভুবন নির্মাণ করি। এইখানেই আমরা বিষয়টার মর্মমূলে পৌঁছে যাই। ভালো কিছু লিখতে হলে আমাকে প্রথমে বিক্ষিপ্তচিত্ত হতে হবে, বিরক্তি বোধ করতে হবে, জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। আমার চারপাশে যখন প্রচণ্ড হৈ-হল্লা, আমি দপ্তরে বসে আছি, চারিদিকে অনেকগুলি টেলিফোন বেজে চলেছে, আমি রৌদ্রকরোজ্জ্বল সমুদ্র সৈকতে বন্ধু ও প্রিয়জন পরিবৃত হয়ে আনন্দ করছি, অথবা একটি বৃষ্টিস্নাত শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছি, এক কথায়, আমি যখন অনুভব করছি যে আমার চোখের সামনে দৃশ্যটির প্রাণকেন্দ্র উন্মোচিত হচ্ছে ঠিক তখনই অকস্মাৎ আমার মনে হবে যে আমি আর সত্যি সত্যি সেখানে নেই, আমি লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছি। আমি দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করি। আমি যদি নৈরাশ্যে ডুবে থাকি তাহলে আমি শুধু একঘেয়েমিজনিত বিরক্তির কথা ভাবি। যেটাই হোক, আমার ভেতরের একটা কণ্ঠস্বর আমাকে ঘরে ফিরে গিয়ে আমার টেবিলে বসার তাগিদ দেয়।

ওই রকম কণ্ঠস্বরের জবাবে বেশিরভাগ মানুষ কী করে সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, তবে আমার মতো মানুষরা লেখকে পরিণত হয়। আমার অনুমান, কবিতার পরিবর্তে তারা গদ্য লেখক ও ঔপন্যাসিক হন। এই পর্যায়ে, আমাকে যে-ওষুধ প্রতিদিন অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে তার গুণাগুণ সম্পর্কে কিছু কথা বলতে পারি। আমরা এখন দেখি যে তার সক্রিয় উপাদানসমূহের মধ্যে আছে একঘেয়েমিজনিত বিরক্তি, বাস্তবজীবন এবং কল্পনার জীবন।

এই স্বীকারোক্তিতে আমি যে আনন্দ পাই এবং নিজের সম্পর্কে এই রকম উক্তি করতে পেরে আমার মধ্যে যে ভীতি জেগে ওঠে, দুটো মিলে, আমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির দিকে নিয়ে যায়। আমি একটা সহজ তত্ত্বের কথা বলতে চাই। এই ধারণাটির উৎস হলো, লেখা একটা সান্ত্বনা, এমনকি একটা ওষুধও, অন্তত আমার মতো ঔপন্যাসিকের জন্য। আমি

আমার এই তত্ত্বটি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। আমি, আমার মতো ঔপন্যাসিকরা, আমাদের দৈনন্দিন দিবাস্বপ্নের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের বিষয়বস্তু বেছে নিই। একটা উপন্যাস যে কিছু ধারণা, তীব্র আবেগ, প্রচণ্ড ক্রোধ এবং কামনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তা আমরা সবাই জানি। আমাদের ভালোবাসার মানুষদের খুশি করার জন্য, আমাদের শত্রুদের খাটো করার জন্য যা কিছু আমরা গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি তার উচ্চ প্রশংসা করা, যে বিষয় সম্পর্কে আমরা কিছু জানি সে বিষয়ে কর্তৃত্বব্যঞ্জকভাবে কথা বলে আনন্দ পাওয়া, যে সময় অতীত হয়ে গেছে তা স্মরণ করা এবং স্মরণ করে আনন্দ লাভ করা, প্রেমলীলায় লিপ্ত হবার স্বপ্ন দেখা অথবা বই পড়া অথবা রাজনীতিতে অংশ নেওয়া, আমাদের বিশেষ দুর্ভাবনাসমূহকে অথবা আমাদের ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া, এই রকম এবং আরও অনেক গোপন, এমনকি অর্থহীন কামনা আমাদের গড়ে তোলে, যা একই সঙ্গে সুস্পষ্ট ও রহস্যময়। এই সব কামনাই আমাদের মধ্যে দিবাস্বপ্ন জাগিয়ে তোলে, যাকে আমরা ভাষা দিই। এই দিবাস্বপ্নগুলি কোথা থেকে আসে অথবা এদের অর্থ কী, যদি কিছু থাকে, তা আমরা বুঝতে না পারলেও, আমরা যখন লিখতে বসি তখন এই দিবাস্বপ্নগুলিই আমাদের মধ্যে প্রাণের নিঃশ্বাস বইয়ে দেয়, ঠিক যেভাবে কোনো অজ্ঞাত স্থান থেকে একটা বাতাস ভেসে এসে বহু তারের বীণায় সুরের ঝঙ্কার তোলে। একজন হয়তো এটাও বলতে পারেন যে আমরা ওই রহস্যময় বাতাসের কাছে নিজেদের সঁপে দিই, সেই কাপ্তানের মতো নিজের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে যার কোনো ধারণা নাই।

একইসঙ্গে, আমাদের মনের এক অংশে, একটা মানচিত্রে, আমরা আমাদের অবস্থান একেবারে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারি, ঠিক আমরা যেমন নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আমরা কোন দিকে চলেছি। যখন আমি নিঃশর্তভাবে নিজেকে বাতাসের কাছে সমর্পণ করি তখনও আমার গতিধারা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা আমি ধরে রাখি। যাত্রা শুরুর আগে আমি কিছু পরিকল্পনা করে নিয়েছি : যে কাহিনি আমি বলতে চাই তাকে আমি কয়েকটা পর্বে ভাগ করে নিয়েছি, আমার তরী কোন কোন বন্দর স্পর্শ করবে তা স্থির করেছি, কী কী মাল সেটা বহন করবে এবং কোথায় কী নামিয়ে দেবে তাও ঠিক করেছি, আমার ভ্রমণের সময় এবং তাঁর গতিপথ স্থির করে নিয়েছি। কিন্তু কোনো এক অজানা জায়গা থেকে ছুটে এসে আমার পালে যদি হাওয়ার ঝাপ্টা লাগে এবং তা যদি আমার গল্পের গতিধারা বদলে দেয় তাহলে আমি বাধা দেব না। কারণ আমার তরী সবচাইতে আন্তরিকভাবে যা কামনা করে তা হলো একটা পরিপূর্ণ সুস্থতার বোধ, ভরা পালে আপনপথে নিখুঁতভাবে এগিয়ে যাওয়ার একটা অনুভূতি। মনে হয়, আমি যেমন সেই বিশেষ স্থান ও কালের সন্ধান করছি যেখানে সব কিছু অন্য সব কিছুর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে, প্রতিটি জিনিস একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত, প্রতিটি জিনিস যেন পরস্পর সম্পর্কে অবহিত। তারপর হঠাৎ বাতাস থেমে যাবে, এবং আমি নিজেকে আবিষ্কার করবো শান্ত একটা জায়গায়, যেখানে কিছুই নড়ে না। তা সত্ত্বেও আমি অনুভব করি যে এই শান্ত ও কুয়াশাচ্ছন্ন জলরাশিতে এমনসব জিনিস আছে যা, আমি যদি ধৈর্য ধরে থাকি, আমার উপন্যাসকে ঠিক সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি সবচাইতে আকুলভাবে যা কামনা করি তা হলো একটা আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা, যার কথা আমি আমার উপন্যাস 'স্নো' তে বর্ণনা করেছি। কোলরিজ 'কুবলাই খাঁ–তে যে অনুপ্রেরণার বর্ণনা দিয়েছেন এটা তার চাইতে ভিন্নরকম নয়। আমি আকুলভাবে কামনা করি অনুপ্রেরণা আমার কাছে আসবে (কোলরিজের কাছে যেভাবে এসেছিল কবিতার রূপ নিয়ে এবং 'স্নো'-র নায়ক কা-র কাছে যেভাবে এসেছিল) একটা নাটকীয়রূপে, খুব ভালো হবে যদি তা এমন একটা দৃশ্য ও পরিস্থিতির রূপ নিয়ে আসে যা আমার উপন্যাসে অতি উত্তমরূপে বসে যাবে। আমি যদি ধৈর্য এবং মনোযোগের সঙ্গে অপেক্ষা করি তাহলে আমার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়। একটা উপন্যাস লেখার অর্থ হলো এই সব কামনা, বাতাস এবং অনুপ্রেরণার সামনে নিজেকে মেলে ধরা, সেইসঙ্গে আমাদের মনের নিভৃত অন্ধকার স্থানগুলিতেও, তাদের কুয়াশা আর নৈঃশব্দের মুহূর্তগুলিতেও তাদের প্রবেশ করতে দেওয়া।

কারণ উপন্যাস একটা কাহিনি ছাড়া আর কী, যা এইসব হাওয়া দিয়ে তার পালকে ফুলিয়ে তোলে, অজানা অঙ্গন থেকে ভেসে আসা অনুপ্রেরণার উপর যা নিজেকে গড়ে তোলে, আমাদের বিনোদনের জন্য উদ্ভাবিত জিনিসগুলি যা আঁকড়ে ধরে এবং সেসবকে একত্রিত করে তাকে একটা অর্থবহ পূর্ণতা প্রদান করে? সর্বোপরি একটা উপন্যাস হলো একটা পাত্র, আমরা যে স্বপ্ন-জগতকে ধরে রাখতে চাই ওই পাত্র তাকে তার ভেতরে রাখে, চিরদিনের জন্য জীবন্ত এবং চিরদিনের জন্য প্রস্তুত। সর্বোপরি, একটা উপন্যাসকে বেঁধে রাখে আমাদের সেই সব ছোট ছোট দিবাস্বপ্ন, তাদের ভেতরে প্রবেশ করার পর মুহূর্ত থেকে ক্লান্তিকর যে জগত ছেড়ে আমরা পালাতে চাই তাকে যা ভুলতে সাহায্য করে। আমরা যত বেশি লিখি পাত্রের ভেতরের ওই দ্বিতীয় জগতটি যেন তত বেশি সমৃদ্ধ, প্রশস্ত, বিশদ এবং সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা ওই জগতকে লেখার ভেতর দিয়ে চিনি এবং আমরা তাকে যত বেশি ভালো করে চিনি তত বেশি সহজভাবে আমরা তা আমাদের মাথার উপর বয়ে নিয়ে যেতে

পারি। আমি যদি একটা উপন্যাস রচনার মাঝপথে থাকি এবং আমার লেখা যদি ভালোভাবে এগিয়ে চলে তাহলে আমি খুব সহজে তার স্বপ্নগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে পারি। কারণ উপন্যাস হলো সেই নতুন জগত যেখানে আমরা সানন্দে ঘুরে বেড়াতে পারি, পড়ার মধ্য দিয়ে কিংবা আরও পরিপূর্ণভাবে লেখার মধ্য দিয়ে। একজন ঔপন্যাসিক তাঁর কাজকে এমনভাবে রূপ দেন যেন তিনি যে স্বপ্নগুলি বিশদ করতে চান তা সহজে বহন করতে পারেন। এইসব কাজ মনোযোগী পাঠককে আনন্দ দেয়, একইসঙ্গে লেখককেও একটা সারবান এবং অটুট স্বাস্থ্যবান জগৎ উপহার দেয়। ওই জগতে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারেন এবং দিবসের যেকোনো সময়ে আনন্দ লাভ করতে পারেন। আমি যদি অনুভব করি যে ওই রকম অলৌকিক জগতের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ আমি সৃষ্টি করতে পারব তাহলে কাগজ কলম নিয়ে আমার টেবিলে পৌছার মুহূর্ত থেকে আমার মন গভীর তৃপ্তিতে ভরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আমি আমাদের প্রতিদিনের একঘেয়ে পরিচিত জীবনকে পেছনে ফেলে একটা বৃহত্তর জগতে চলে যেতে পারি, স্বাধীনভাবে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারি। বেশিরভাগ সময় আমার বাস্তব জীবনে প্রত্যাবর্তনের অথবা আমার উপন্যাসের সমাপ্তি পর্বে পৌছুবার কোনো আশঙ্কা তখন আমার মধ্যে জাগে না। এই অনুভূতির সঙ্গে, আমার মনে হয়,আরেকটা জিনিসের বিশেষ মিল আছে। আমি যখন আমার পাঠকদের বলি যে আমি একটা নতুন উপন্যাস লিখছি, তখন তারা বলে ওঠে, "আপনার উপন্যাসটি সত্যিকার দীর্ঘ করবেন কিন্তু", ওদের কথায় আমার মন খুশিতে ভরে ওঠে, আর আমি ঈষৎ গর্বভরেই বলতে পারি যে আমার পাঠকদের এই উক্তি আমার প্রকাশকের নিরন্তর মিনতি "দয়া করে একটু ছোট করবেন"-এর চাইতে আমি হাজার বার বেশি শুনি।

একটি মানুষের সুখ ও আনন্দ থেকে উৎসারিত একটা অভ্যাস কেমন করে এমন একটা কাজের জন্ম দিতে পারে যা এতে বিপুলসংখ্যক মানুষকে উৎসাহী ও কৌতূহলী করে তুলতে পারে? আমার "মাই নেম ইজ রেড"-এর পাঠকরা বইটির নায়ক শেকুরের একটি উক্তির উল্লেখ করে : "সব কিছু বিশদ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা একটা চরম বুদ্ধিহীনতা।" ওই দৃশ্যে আমার সহানুভূতি আমার ছোট্ট নায়ক, আমার নামে যার নাম, ওরহান, তার প্রতি নয়, আমি সহানুভূতি অনুভব করি ওরহানের মায়ের প্রতি, যিনি তাকে নিয়ে মৃদু সস্নেহ পরিহাস করছেন। আপনারা যদি আমাকে ওই ওরহানের মতো আরেকটা বুদ্ধিহীনতার কাজ করার অনুমতি দেন তাহলে স্বপ্নগুলি কেন লেখকের জন্য ওষুধ হিসাবে কাজ করতে পারে, পাঠকের জন্যও পারে, আমি তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে পারি। আমি যদি আমার উপন্যাসের ভেতরে সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট হই এবং যদি আমার লেখা ভালোভাবে অগ্রসর হতে থাকে, আমি যদি নিজেকে ঝনঝন করে বাজতে থাকা টেলিফোন থেকে, দৈনন্দিন জীবনের সকল ঝামেলা আর বিরক্তিকর একঘেয়েমি থেকে, দূরে সরিয়ে আনতে সক্ষম হই তাহলে যে বাঁধনমুক্ত নিয়মনীতি দ্বারা আমার স্বর্গ তার কাজ করে চলে, তার সাহায্যেই আমার ছেলেবেলার খেলাগুলি আমার স্মৃতিতে আমি জাগিয়ে তুলতে পারি। যেন সব কিছু খুব সহজ ও সরল হয়ে গেছে, যেন আমি এমন একটা পৃথিবীতে আছি যেখানে আমি প্রতিটি ভবন, গাড়ি, জাহাজ, বাড়ির ভেতরটা দেখতে পাই, কারণ সেগুলি সবই কাঁচের তৈরি : আর ওরা তাদের গোপন কথা আমাকে বলতে শুরু করেছে। আমার কাজ হলো নিয়মনীতিগুলি বুঝতে পারা এবং মন দিয়ে শোনা : প্রতিটির অভ্যন্তরে যে কর্মকাণ্ড চলছে আনন্দের সঙ্গে তা লক্ষ্য করা, আমার নায়কদের সঙ্গে মোটরে আর বাসে চড়ে সারা ইস্তাম্বুলে ঘুরে বেড়ানো, যেসব জায়গা দেখে দেখে আমার বিরক্তি ধরে গিয়েছিল নতুন চোখে তাদের দেখা এবং ওই দেখার মধ্য দিয়ে তাদের নবরূপে রূপান্তরিত করা। আমার কাজ হলো মজা পাওয়া, দায়িত্বজ্ঞানহীন হওয়া, কারণ আমি যখন মজা পেতে থাকি তখন হয়তো (ছোটদের আমরা যে কথা বলতে ভালোবাসি) আমি কিছু একটা শিখেও যেতে পারি।

এই যে পৃথিবী আমি আবিষ্কার করি, সৃষ্টি করি, বড় করে তুলি, করতে করতে তার জন্য নীতিমালা বানাই, অচেনা কোন অঙ্গন থেকে ছুটে এসে আমার পালে খোলা হাওয়া লাগবে তার জন্য অপেক্ষা করি, ঝুঁকে পড়ে আমার মানচিত্রের উপর চোখ রাখি, এর উৎস একটি শিশুসুলভ নিষ্পাপতা, যার দুয়ার আমার জন্য মাঝে মাঝে রুদ্ধ হয়ে যায়। সব লেখকের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে।

একজন কল্পনাকুশল ঔপন্যাসিকের সবচাইতে বড়ো গুণ হলো এই জগৎকে ভুলে যাবার ক্ষমতা, যেভাবে একটি শিশু ভুলে যায় সেইভাবে, দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারার এবং তার মধ্যে মজা পাবার ক্ষমতা, পরিচিত জগতের নিয়মকানুন মেনে খেলে চলা এবং একইসঙ্গে তাঁর বন্ধনমুক্ত কল্পনার ওপাশে তাঁর সুগভীর দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে সচেতন থাকা, এর সাহায্যেই তো তিনি পরবর্তী সময়ে তাঁর পাঠকদেরকে তাঁর গল্পের মধ্যে হারিয়ে যাবার সুযোগ করে দেবেন। একজন ঔপন্যাসিক সারা দিন খেলে কাটিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু একইসঙ্গে তিনি একটি গভীর প্রত্যয় বহন করে চলেন যে, তিনি অন্যদের চাইতে বেশি আন্তরিক ও চিন্তাশীল। এর কারণ, তিনি সব কিছুর একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে সরাসরি দৃষ্টিপাত করতে পারেন, যেভাবে শিশুরা পারে। একসময় আমরা বাঁধনহারা হয়ে যেসব খেলা খেলেছিলাম এখন তার জন্য কিছু নিয়মনীতি বানাবার সাহস অর্জন করার পর তিনি অনুভব করেন যে পাঠকরা ওই একই নিয়মনীতির মধ্যে, একই ভাষা, একই বাক্যাবলি এবং তাই একই কাহিনির মধ্যে, নিজেদেরকে টেনে নিয়ে যাবার অনুমতি দেবে। ভালো লেখার অর্থ হচ্ছে পাঠককে সেই জায়গায় পৌঁছে দেয়া যেখানে তিনি বলতে পারেন, "আরে, আমি তো এটাই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি নিজেকে অতোটা ছেলেমানুষি পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি নি।"

এই যে পৃথিবী আমি আবিষ্কার করি, সৃষ্টি করি, বড় করে তুলি, করতে করতে তার জন্য নীতিমালা বানাই, অচেনা কোন অঙ্গন থেকে ছুটে এসে আমার পালে খোলা হাওয়া লাগবে তার জন্য অপেক্ষা করি, ঝুঁকে পড়ে আমার মানচিত্রের উপর চোখ রাখি, এর উৎস একটি শিশুসুলভ নিষ্পাপতা, যার দুয়ার আমার জন্য মাঝে মাঝে রুদ্ধ হয়ে যায়। সব লেখকের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে। একটা মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয় যখন আমি আটকে যাই, অথবা আমি উপন্যাসটিকে যে জায়গায় ছেড়ে এসেছিলাম সেখানে আবার ফিরে যেতে চাই কিন্তু পারি না। এরকম অবস্থা সকল ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রেই হয়। আমি হয়তো এই পীড়ায় অন্য লেখকদের চাইতে কম ভুগি কিন্তু এই রোগ একটা সাধারণ ব্যাপার। আমি যেখানে ছেড়ে দিয়েছিলাম সেখান থেকে যদি আবার শুরু করতে না পারি তাহলে আমি সবসময়ই উপন্যাসটির অন্য কোনো ফাঁকা জায়গা ভরাট করার কাজে লেগে যাই। আমি আমার মানচিত্র খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি, তাই আমি অন্য আরেকটি পর্ব থেকে লিখতে শুরু করতে পারি। পড়ার ক্রম অনুসরণ করে লেখার আমার কোনো দরকার নেই। ব্যাপারটা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ তা অবশ্য নয়। গত শরৎকালে আমি যখন নানারকম রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লড়ছিলাম তখন ওই রকম একটা সমস্যায় আমি আটকে পড়ি, আর তখন আমার মনে হয় আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি যা উপন্যাস রচনার সঙ্গে সম্পর্কিত। দাঁড়ান, আমাকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে দিন।

আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা এবং যে রাজনৈতিক কর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে আমি তখন নিজেকে আবিষ্কার করি তা আমাকে আমি যতটা চেয়েছিলাম তার চাইতে বেশি 'রাজনৈতিক', 'গুরুত্বপূর্ণ' এবং 'দায়িত্বশীল' ব্যক্তি করে তোলে : একটা নিরানন্দ পরিস্থিতি, তার চাইতেও নিরানন্দ একটা মানসিক অবস্থা, কথাটা আমাকে মৃদু হাস্যের সঙ্গে বলতে দিন। এই কারণেই আমি ওই শিশুর মতো নিষ্পাপতার ভুবনে প্রবেশ করতে পারি নি, যেটা ব্যতীত কোনো উপন্যাস সম্ভব হয় না। কিন্তু এটা সহজবোধ্য। এটা আমাকে অবাক করে নি। ঘটনাবলি এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে বলি, আমার দ্রুত অপসৃয়মাণ দায়িত্বহীনতার বোধ, শিশুর মতো আমার খেলা করার প্রবণতা, আমার শিশুসুলভ কৌতুকরস, এই সবই একদিন ফিরে আসবে, আর তখন আমি তিন বৎসর ধরে যে উপন্যাসটি লিখছি তা শেষ করতে সক্ষম হবো। তবু, আমি এখনো রোজ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠি, ইস্তাম্বুলের এক কোটি মানুষের ঘুম ভাঙার অনেক আগে, এবং আমার উপন্যাসটির ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করি, যা আমার টেবিলের উপর মাঝরাতের নীরবতার মধ্যে অসমাপ্ত পড়ে আছে। আমি এটা করি কারণ আমি আমার প্রিয় দ্বিতীয় ভুবনে প্রবেশ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, তারপর অনেক পরিশ্রম করে আমি আমার মাথার ভেতর থেকে একটা উপন্যাসের নানা টুকরো বের করে এনে তাদেরকে আমার সামনে নড়াচড়া করতে দেখি। কিন্তু ওই টুকরোগুলি আমি যে উপন্যাসটি লিখছিলাম তার কোনো অংশ নয়। তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কাহিনির দৃশ্যাবলি। ওই ক্লান্তিকর নিরানন্দ সকালগুলিতে আমার চোখের সামনে দিয়ে যা ভেসে যায় তা আমি গত তিন বছর ধরে যে উপন্যাস লিখছিলাম তার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত। তারা হলো অন্য একটি উপন্যাসের ক্রমবর্ধমান দৃশ্য, বাক্য, চরিত্র এবং নানা বিচিত্র বিষয়। কিছুক্ষণ পর আমি এসব টুকরো একটা নোট বই-এ লিখে রাখতে শুরু করি এবং যেসব চিন্তা আগে কখনো আমার মাথায় আসে নি তা টুকে রাখি। এই অন্য উপন্যাসটি হবে একজন প্রয়াত সমকালীন শিল্পীর চিত্রকর্ম নিয়ে। আমি শিল্পীর চরিত্র সৃষ্টি করার সময় তাঁর চিত্রকর্মগুলি নিয়ে বিশেষভাবে ভাবতে থাকি। কিছুক্ষণ পর আমি বুঝতে পারি কেন আমি ওই একঘেয়ে দিনগুলিতে শিশুর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বোধ আমার মধ্যে পুনরুদ্ধার করতে

পারি নি। আমার পক্ষে ছেলেমানুষির ভুবনে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় নি, আমি শুধু আমার নিজের শৈশবের দিনগুলিতে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছি, সেই সব দিনের কাছে যখন (আমি "ইস্তাম্বুল" উপন্যাসে তার কথা বলেছি) আমি একজন শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখতাম এবং আমার সমস্ত জাগ্রত মুহূর্ত অতিবাহিত করতাম একটার পর একটা ছবি এঁকে।

পরে, আমার বিরুদ্ধে মামলা যখন তুলে নেওয়া হলো, তখন আমি আমার "অপাপবিদ্ধতার জাদুঘর" উপন্যাসের কাছে ফিরে যাই, যাব পেছনে আমি ইতোমধ্যে তিন বৎসর ব্যয় করেছি। তবু আজ আমি ওই অন্য উপন্যাসটির পরিকল্পনা করছি, দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজাচ্ছি, নির্ভেজাল ছেলেমানুষির মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে ব্যর্থ হয়ে আমি আমার ছেলেবেলার আবেগের মধ্যে, অর্ধেকটা ফিরে গিয়ে, এই কাজটা করছি। এই অভিজ্ঞতা উপন্যাস রচনার রহস্যময় শিল্পকলা সম্পর্কে আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছে।

আমি সেটা "নিহিত পাঠক"–এর তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি। এই তত্ত্ব তুলে ধরেছেন মহান সাহিত্য সমালোচক ও তাত্ত্বিক উলফগ্যাঙ্গ আইসার। আমি আমার নিজের প্রয়োজনের স্বার্থে নিজের মতো করে তা ব্যবহার করবো। আইসার একটি পাঠকভিত্তিক অতি চমৎকার তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন। তিনি বলেছেন, একটি উপন্যাসের অর্থ তার টেক্সট-এর মধ্যে, তার পাঠের মধ্যে থাকে না, তার কনটেক্সটের মধ্যেও, প্রসঙ্গের মধ্যেও তা থাকে না, তা থাকে এই দুই-এর মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গায়। তাঁর মত অনুযায়ী যখন একটা উপন্যাস পড়া হতে থাকে তখনই তার অর্থ বেরিয়ে আসতে শুরু করে, আর তাই তিনি যখন নিহিত পাঠকের কথা বলেন তখন তিনি নিজেকে একটি অপরিহার্য ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করেন।

আমি তখন যে উপন্যাসটি লিখছিলাম তাকে সামনের দিকে এগিয়ে না নিয়ে আমি যখন অন্য আরেকটা বই-এর জন্য নানা দৃশ্য, বাক্য ও ঘটনাবলিকে আমার মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলছিলাম তখন এই তত্ত্বটি আমার মধ্যে জেগে ওঠে এবং একটি অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে তা আমার কাছে যা তুলে ধরে তা হলো এই:

প্রতিটি অলিখিত কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট ও পরিকল্পিত উপন্যাসের (অন্য কথায়, আমার অসমাপ্ত উপন্যাসটিসহ) একজন নিহিত লেখক অবশ্যই থাকেন। তাই আমি যখন আবার আমার উপন্যাসটির নিহিত লেখক হয়ে উঠতে পারবো শুধু তখনই তা সমাপ্ত করতে সক্ষম হব। কিন্তু আমি যখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ডুবে যাই, অথবা, স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যা প্রায়ই ঘটে, আমার চিন্তাধারা যদি প্রায়ই অপরিশোধিত গ্যাস বিল, টেলিফোনের ঝনঝন ধ্বনি, পারিবারিক জমায়েত ইত্যাদির দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় তখন আমি আর স্বপ্নে দেখা বই-এর নিহিত লেখক হয়ে উঠতে পারি না। ওই সব দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যাবার ফলে আমি যে উপন্যাস লেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম তার নিহিত লেখক হওয়া আর আমার পক্ষে তখন সম্ভব হয় না। তারপর ওই দিনগুলি কেটে যায়, আমি আমার উপন্যাসের কাছে প্রত্যাবর্তন করি, একটা প্রেমের কাহিনি, যার ঘটনাকাল ১৯৭৫ সাল থেকে বর্তমান সময়, যার ঘটনাস্থল ইস্তাম্বুল অথবা, পত্র পত্রিকা যাকে অভিহিত করে, "ইস্তাম্বুল সমাজ", আমি ফিরে আসি আমার পূর্বতন সত্তার কাছে যার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম, আর আমি যখনই ভাবি আমি উপন্যাসটি প্রায় শেষ করে এনেছি তখনই আমার চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা লাভের ফলেই আমি এখন বুঝতে পারি যেসব বই আমি লিখতে চাই তার নিহিত লেখক হবার জন্য গত ত্রিশ বছর ধরে কেন আমি সাধনা করেছি। স্বপ্নে একটা বইকে দেখা কঠিন নয়। আমি প্রায়ই তা করি, যেমন আমি আর আমি নই, অন্য একটি মানুষ, প্রায়ই আমি তেমন কল্পনা করি। কঠিন জিনিসটা হলো তোমার স্বপ্নে দেখা বইটির নিহিত লেখক হওয়া। আমার জন্য হয়তো তা আরও বেশি কঠিন কারণ আমি শুধু লিখতে চাই বৃহদাকার, মোটা, উচ্চাভিলাষী উপন্যাস, আর আমি লিখি খুব ধীর গতিতে।

কিন্তু কোনো অভিযোগ নয়। ইতোমধ্যে আমার সাতটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। আমি এখন স্বচ্ছন্দে বলতে পারি যে, পরিশ্রম করতে হলেও, আমি সেই লেখক হয়ে উঠেছি যে তার স্বপ্নে দেখা বইগুলি লিখতে পারে। আমি আমার বইগুলি লিখেছি এবং সেগুলি পেছনে ফেলে এসেছি। একইভাবে লেখকের যে প্রেতাত্মা ওইসব বই রচনা করতে পারতো তাকেও আমি পশ্চাতে ফেলে এসেছি। ওই সাতজন নিহিত লেখকের সবাই আমার মতো, গত ত্রিশ বছর ধরে তারা ইস্তাম্বুল থেকে জীবন এবং বিশ্বকে যেমন দেখা যায় তা দেখেছেন, আমার জানালার মতো একটি জানালা থেকে দেখা সেসব দৃশ্যাবলি এবং যেহেতু তারা এই জগতটাকে আদ্যোপান্ত চেনেন এবং তাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন তাই তারা একটি ক্রীড়ারত শিশুর গাম্ভীর্য এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে তা বর্ণনা করতে সক্ষম হন।

আমি আরও ত্রিশ বছর উপন্যাস লেখার জন্য সক্ষম থাকতে চাই, সেটাই আমার সর্বোচ্চ আশা, আর এই অজুহাতটা ব্যবহারের জন্য আমি আমার নিজেকে মুড়ে নিতে চাই ব্যক্তিচেতনার নতুন নতুন বহিঃপ্রকাশ দ্বারা।
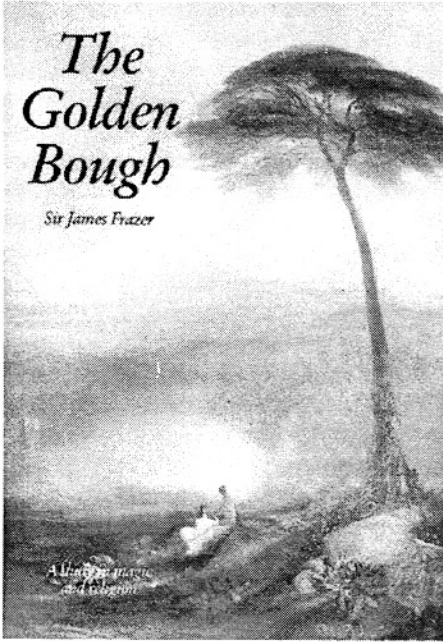
গোল্ডেন বাউ

স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার

অনুবাদ : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান পুরাকাহিনীর যুধিষ্ঠির হলো দেবরাজ ওডিনের পুত্র বল্ডার। বল্ডার দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, প্রাজ্ঞ, সুবোধ এবং সবার প্রিয় হিসেবে পরিচিতি ছিল। আর ছিল যশ ও খ্যাতি। বল্ডারকে অমর করার জন্য দেবতারা তাকে যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করে। দেবী ফ্রিগ আগুন, পানি, লোহা এবং অন্য সমস্ত ধাতব পদার্থ, পাথর, মাটি, গাছপালা, পশুপাখি, অসুখবিসুখ, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি সবাইকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় যে তারা ভুলেও কখনো বল্ডারের ক্ষতি করবে না। প্রতিজ্ঞা পরীক্ষার জন্য দেবদেবীরা বল্ডারকে ঘিরে বসে এবং প্রত্যেকেই তার প্রতি হয় তীর, নয় পাথর ছুঁড়ে মারে; কেউ কেউ এগিয়ে তাকে তলোয়ারে কাটার চেষ্টাও করে। কিন্তু না, বল্ডারেরর কিছুই হয় না। ওদিকে শয়তানি বুদ্ধিতে পাকা আর এক দেবতা লোকি বল্ডারকে মারার ফন্দি আঁটে। সে দেবী ফ্রিগ-এর কাছে জানতে পায় মিসেলটো নামের এক ক্ষুদে পরগাছাকে প্রতিজ্ঞা করানো হয় নি। লোকি তখন মিসেলটোর এক শাখা ভেঙে অন্ধদেব হথারকে দেয় তাক করে বল্ডারের দিকে ছুঁড়তে। সে হথারকে বল্ডারের অবস্থান বুঝিয়ে দিলে অন্ধদেব নির্ভুল লক্ষ্যে হাতের ডাল ছুঁড়ে মারে। হথারের নিক্ষিপ্ত মিসেলটোর আঘাতে সত্যনিষ্ঠ বল্ডারের মৃত্যু ঘটে ।

বল্ডার এবং মিসেলটোর কাহিনী উত্তরের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান পুরাকাহিনী হলেও দক্ষিণের ইতালি পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপেই তা প্রচলিত। রোমের উপকণ্ঠের একটি প্রাচীন জনপদ নেমি– সেখানে এবং আরিসিয়া বা রিচিয়া গ্রামে রয়েছে পাহাড় ও কুঞ্জঘেরা, কাকচক্ষুর নিথর জলে ভরা এক হ্রদ। এর নাম ডায়ানার মুকুর। এইখানে এক পবিত্র বৃক্ষ পাহারা দেয় এক ক্রূরদর্শন পুরোহিত। এই পুরোহিত যতদিন তার পদরক্ষা করবে ততদিন থাকবে তার রাজা উপাধি– বনের রাজা। নেমির এই অরণ্যে ওকগাছ ঘিরে জড়িয়ে থাকে স্বর্ণলতা মিসেলটো। পুরোহিত এই মিসেলটোই পাহারা দেয়। স্বর্ণশাখার সোনালি ডাল ভাঙতে পারে কেবল ফেরারি এক ক্রীতদাস। কিন্তু ভাঙার পরও দাসকে লড়তে হয় ওই পুরোহিতের সঙ্গে। এবং পুরোহিতকে বধ করেই কেবল সে অরণ্যরাজ উপাধি অর্জন করতে পারে। আর মৃত পুরোহিত হয়ে যায় বৃক্ষ আত্মার সঙ্গে একাকার।

এই মিসেলটো বা স্বর্ণলতার এমনই গুণ যে প্রবল শীতে বনের ওকগাছ যখন পত্রবিহীন তখন এই মিসেলটোই দ্বিগুণ তেজে স্বর্ণাভা ছড়িয়ে বন আলো করে রাখে। সম্ভবত এই আলোকসঞ্চারি গুণের জন্যই ভার্জিলের মহাকাব্য *ইনিদ*-এর ষষ্ঠ সর্গে দেখি নায়ক ইনিয়াস পায়রা উড়িয়ে মিসেলটোর শাখা হাতে যাত্রা করে মৃতের রাজ্য পাতালপুরিতে। ইংরেজ নৃতাত্ত্বিক স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার (১৮৫৪-১৯৪১) এই সব বিবিধ মিথ, লোকগাথা, উপকথা, লোকবিশ্বাস, আর্যা, আচারবিচার উপাচারের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে মিল অনুসন্ধান করেন তাঁর ১২খণ্ডে সমাপ্ত ভুবন বিখ্যাত বই *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion*-এ। মানুষের জাদুবিশ্বাস আর ধর্মাচার বৃত্তান্তের এই বিপুলায়তনের বই প্রাথমিকভাবে দুখণ্ডে সমাপ্য হলেও ফ্রেজারের গবেষণা অনুসন্ধান তাঁকে নিয়ে যায় বিচিত্র সব রীতিনীতি আর বিশ্বাসের তীরভূমিতে। বইয়ের আয়তন বাড়লেও বৃহত্তর পাঠকের আওতাভুক্ত করতে ১৯২২ সালে তিনি প্রকাশ করেন প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ম্যাকমিলান প্রকাশিত এই সংস্করণেরই প্রথম পরিচ্ছেদের বাংলা অনুবাদ এখানে ছাপানো হলো।

অরণ্যরাজ

ডায়না ও ভার্বিয়াস

টার্নারের আঁকা *গোল্ডেন বাউ* ছবিটা কে না দেখেছে? টার্নারের মহৎ অন্তর ছিল কল্পনার কনকরশ্মিতে উদ্ভাসিত। তারই আভায় তুলি চুবিয়ে তিনি সুন্দরতম নৈসর্গিক দৃশ্যকেও একেবারে স্বপ্নরাজ্যে পরিণত করেছেন। নেমির বনাঞ্চল ঘেরা হ্রদ যাকে পুরনো দিনের মানুষ বলতো 'ডায়নার আরশি'– নেমির সেই কুঞ্জবন ঘেরা হ্রদকে এভাবেই চিত্রপটে সৃষ্টি করেছেন টার্নার। আলবান গিরিকোলে নিরাপদে ঘুমিয়ে থাকা এই হ্রদের শান্ত জল যিনি একবার প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর পক্ষে এর সৌন্দর্য কখনো ভোলা সম্ভব নয়। এর দুই তীরে দুই খাঁটি ইতালিয় নিঝুম পল্লী, আর একই রকম নির্ভেজাল ইতালিয় প্রাসাদ। প্রাসাদের খিড়কি বাগান খাড়াভাবে নেমে এসেছে হ্রদের নিস্পলক জলের দিকে। কিন্তু তাতে দৃশ্যের সুনসান কি নির্জনতা কিছুমাত্র বিঘ্নিত হয় নি। কে জানে হয়ত আজও ডায়না দেবী স্বয়ং এই নিঝুম ঝিলের পাড়ে বাস করেন, হয়ত আজও জ্যোৎস্নায় এই বনে উপবনে তিনি একাকী ঘুরে বেড়ান। পুরাকালে ইতালির এই সুন্দর গ্রামীণ জায়গাটিতে বারবার ঘটেছে এক অদ্ভুত বিয়োগান্তক ঘটনা। হ্রদের উত্তর পাড়ে ঠিক যেখানে পাহাড়ের একটা অংশ বেরিয়ে আছে হ্রদের ওপর এবং যার ওপর এখনকার নেমি পল্লী অবস্থিত– হ্যাঁ ঠিক এর নিচেই রয়েছে ডায়না *নেমোরেনসিস* বা বনের দেবী ডায়নার কুঞ্জাশ্রম। এই হ্রদ আর এই কুঞ্জবন অনেকের কাছে আরিচিয়ার হ্রদ এবং কুঞ্জ নামেও পরিচিত। কিন্তু আরিচিয়া শহরটি (বর্তমানের লা রিচিয়া) সে সময় ছিল মাইল তিনেক দূরে আলবান পর্বতের পাদদেশে। পর্বতের দিকে ছোট এক ফাঁকা জায়গা দিয়ে খাড়াভাবে নেমে গেছে হ্রদের পানি। এতেই আরিচিয়া পল্লী কুঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই পূত কুঞ্জাশ্রমে সেকালে এক বিশেষ গাছ জন্মাত। দিনের যে কোনো সময় এবং হয়ত গভীর রাতেও দেখা যেত ওই গাছের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক ভয়াল দর্শন মানুষ। কে জানে কিসের খোঁজে বেড়াত সে। ডান হাতে তার খোলা তরোয়াল। চোখে উদ্বেগ নিয়ে সে এদিক ওদিক তাকাত– এমন যেন কোনো শত্রু মুহূর্তের অসাবধানতার সুযোগে আড়াল থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে নিজে কিন্তু একজন পুরোহিত এবং হন্তারকও বটে। আর যে লোকটার খোঁজে সে সদাসতর্ক হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, সে আজ হোক কাল হোক ওকে খুন করে ওর পৌরহিত্যের পদটি অধিকার করবেই। এ রকমই ছিল ওই অভয়ারণ্যের রীতিনীতি। ওই পৌরহিত্যের পদটি অর্জন করতে চাইলে প্রার্থী ওই পুরোহিতকে হত্যা করেই কেবল তা অর্জন করতে পারত। আবার এই নতুন পুরোহিতও তার পদমর্যাদা বজায় রাখতে পারত যতদিন না তার চেয়েও বলশালী, তার চেয়েও চতুর কেউ এসে তাকে খুন করত।

এই বিপজ্জনক পদটি নিয়ে যে পুরুতঠাকুর সদাউদ্বিগ্ন থাকত তার উপাধি ছিল রাজা– বনের রাজা। কিন্তু এর চেয়ে বেশি অস্বস্তি, এর চেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন যে আর কোনোকালে আর কোনো রাজার ভোগ করতে হয় নি সে কথা আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি। সারা বছর– কি গ্রীষ্মে কি শীতে, কি ঝড় কি ঝঞ্ঝায়– এই রাজা মশায়কে একা জেগে বন পাহারা দিতে হতো। হ্যাঁ ঘুমাতে সে পারত বৈকি, এবং নিদ্রা সে কখনো কখনো যেত বটে, তবে তা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। জাগ্রত প্রহরায় একটু ঢিল পড়লে, শরীরের প্রত্যঙ্গের শক্তিতে, কি অসি চালনার পারদর্শিতায় একটু মন্থরতা এলে তার ঘনিয়ে আসত মহাবিপদ। আবার প্রৌঢ়ত্ব কি বার্ধক্যের পাকা কেশদামও বাজাতে পারত তার মৃত্যু-ঘণ্টা। সুন্দর ঝকঝকে দিনে এক খণ্ড মেঘ যেমন হঠাৎ করেই সূর্যকে আড়াল করে ফেলে, তেমনি এই পুরুতঠাকুরের মুখদর্শনেও সুবোধ ও ধার্মিক তীর্থযাত্রীদের কাছে এই চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ আঁধারিতে ছেয়ে যেত। তার কঠিন এবং ভয়াবহ মুখাবয়বের বিপরীতে ইতালির স্বপ্নিল নীল আকাশ, বসন্তের আলোছায়ার চিত্রল বনরাজী এবং সূর্যকরোজ্জ্বলে চিকচিক জলরাশি– সব কিছুই যেন অশুভ কিছুর ইঙ্গিত বহন করত। তার চেয়ে বরং আমরা এই দৃশ্যকে এমন একজন মুসাফিরের চোখ দিয়ে দেখি, যে মঞ্জিল মকসুদে পৌঁছতে বিলম্ব করে ফেলেছে। শরতের ছোট বেলা ডুবে আঁধার হয়ে এসেছে, মরা পাতা ঝরে পড়েছে জমিনে পুরু হয়ে এবং বাতাসে বর্ষশেষের হাহাকার উঠছে সর্বত্র। বিষণ্ন সংগীতে সুষমভাবে বাঁধা শান্ত-সৌম্য দৃশ্য, আকাশে জলভারনত মেঘ, গাছের শাখায় শাখায় হাওয়ার বিলাপ, পায়ের নিচে শুকনো পাতার খসখস আওয়াজ, ঝিলের কোলে শীতল জলের ছলাৎ ছলাৎ, আর সামনের দিকে তাকালে দেখা যায় গোধূলিতে কি সাঁঝের আঁধারে ভীষণদর্শন এক বিষণ্ন মূর্তি পদচারণা করছে, কাঁধে ধরা ইস্পাতের তলোয়ার। তখন আসমানে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সাঁতরে বেড়ায় কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদ। মরা চাঁদের আলো বনের চাঁদোয়া চুঁইয়ে ঝরে পড়লে ইস্পাতের তলোয়ার থেকে থেকেই চিকচিক করে ওঠে।

পৌরোহিত্যের এই সব আজব নিয়মকানুন প্রাচীন গ্রিক কি রোমক সভ্যতায় নজীরবিহীন। এদের কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেওয়ারও উপায় নেই। ব্যাখ্যা দিতে গেলে আমাদের আরও গভীরে যেতে হবে। তবে পুরোহিতবধের এই রীতি যে বর্বর যুগেরই নিদর্শন তা সম্ভবত কেউ অস্বীকার করবে না। এই

রীতি সাম্রাজ্যবাদী যুগে ইতালির সুসভ্য সমাজের জন্য ছিল একেবারে বেঢপ, বেমানান। পরিপাটি করে কাটা ঘাসের লনে প্রাচীন শিলাখণ্ডের উপস্থিতি যেমন উটকো– অনেকটা সেরকম। অথচ এই প্রথার ক্রূরতা এবং বর্বরতাই কিন্তু বিশ্লেষণের কাজে সহায়ক হতে পারে। মানুষের আদি ইতিহাস নিয়ে সম্প্রতি অনেক গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণায় একথাই প্রকাশ হয়েছে যে, বাহ্যিক নানা বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষের মন প্রথম মোটা দাগে জীবন দর্শন বিচার করতে শেখে মানুষের মধ্যকার মৌলিক সামঞ্জস্য দিয়েই। এজন্য যদি দেখাতে পারি যে, নেমির পৌরোহিত্যের মতো বর্বর প্রথা অন্যান্য সংস্কৃতিতেও দেখা যায়, যদি সেই সব উদ্দেশ্য বের করতে পারি যা দ্বারা পরবর্তীকালে এই প্রথা রীতিমতো প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যদি প্রমাণ করতে পারি যে এই সব উদ্দেশ্য মানব সমাজে ব্যাপকভাবে, সম্ভবত সর্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর ফলে বহু বিচিত্র প্রতিষ্ঠানও সৃষ্টি হয়েছে যারা বিশেষক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কিন্তু মূলত এক, যদি দেখাতে পারি যে এই সব উদ্দেশ্য এবং তাদের ফলে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো আসলে প্রাচীন গ্রিস এবং রোমেও প্রচলিত ছিল– তাহলে হয়ত এমন সিদ্ধান্তে আসা যাবে যে, আরও আগেকার কোনো যুগেই একই ধরনের উদ্দেশ্য মেটাতে নেমির পৌরোহিত্যের জন্ম হয়েছিল। অবশ্য এ ধরনের অনুমান অকাট্যভাবে প্রমাণ করার উপায় নেই, কেননা আমাদের হাতে নেই জোরালো দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমি যেসব শর্তের ইঙ্গিত দিয়েছি তা মেটানোর প্রেক্ষিতে এর সম্ভাব্যতা এবং সম্পূর্ণতা অনেক বেশি। এই বইয়ের উদ্দেশ্য হল, এই সব শর্ত পূরণ করে নেমির পৌরোহিত্য সম্পর্কে সম্ভাব্য একটা বিশ্লেষণ প্রদান।

এই বিষয়ে সামান্য যা কিছু তথ্য আমাদের হাতে আছে তা দিয়েই আলোচনা শুরু করতে চাই। একটা কাহিনিতে বলা হয়েছে যে, নেমি উপত্যকায় ডায়না দেবীর অর্চনা শুরু করে অরেস্টেস। টরিক কার্সোনিজ (ক্রিমিয়া)-এর রাজা খোয়াসকে হত্যার পর অরেস্টেস তার বোনকে নিয়ে পালিয়ে আসে ইতালি। সঙ্গে সে টরিক ডায়নার বিগ্রহ লুকিয়ে আনে এক বোঝা জ্বালানি লাকড়ির মধ্যে। মৃত্যুর পর তার দেহাবশেষ আরিচিয়া থেকে রোমে পাঠানো হয় এবং সেখানে কনকর্ডের মন্দিরের পাশে কাপিতোলাইনের ঢালুতে শনিদেবের মন্দিরের সামনের চত্বরে সমাধিস্থ করা হয়। গ্রিক-রোমক পাঠকদের কাছে টরিক ডায়নায় আরোপিত এই সহিংসতার কাহিনি বহুল পরিচিত। কথিত আছে যে নেমির সীমানায় বহিরাগত কেউ এলে আর ফিরে যেতে পারত না; তাকে দেবীর বেদিমূলে বলি দেওয়া হতো। কিন্তু ইতালিতে স্থানান্তরের পর এই ধর্মাচার কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। নেমির কুঞ্জবনে এক বৃক্ষ জন্মাত যার ডাল– কারো সাধ্য ছিল না ভাঙে। তবে হ্যাঁ, হিম্মত থাকলে কোনো ফেরারি ক্রীতদাসই কেবল গাছের একটি শাখা ভাঙতে পারত। এই কাজে সফল হলে তাকে ওই জিম্মিদার পুরোহিতের সঙ্গে মল্লযুদ্ধের ছাড়পত্র দেওয়া হতো। আর যুদ্ধে যদি সে পুরোহিতকে বধ করতে পারল, তো অরণ্যরাজ (Rex Neworensis) উপাধিটিও সে বাগিয়ে নিয়ে ওই পুরোহিতের স্থলাভিষিক্ত হলো। পুরাকালের বিশ্বাস অনুযায়ী ক্রীতদাস যে গাছের ডাল ভাঙে সেই গাছই হল স্বর্ণশাখা বা গোল্ডেন বাউ। সিবিল যোগিনীর পরামর্শ মতো ঈনিয়াস যমপুরীতে বিপজ্জনক যাত্রার প্রাক্কালে এই ডালটিই ভেঙে হাতে নিয়েছিল। আবার, ওই ক্রীতদাস তো ফেরারি। তার পলায়নের সঙ্গে মিল আছে অরেস্টেসের পালানোর। এক সময় টরিক ডায়নাতে যে মানুষ বলি দেওয়া হতো, তার মিলও দেখতে পাই দাসের আর পুরোহিতের মল্লযুদ্ধে। যুদ্ধে জিতে শাসন করার প্রথা ইতালির সাম্রাজ্যবাদী যুগেও বহাল থাকে। রাজা কালিগুলার নানা খেয়াল ছিল। তো একটি খেয়ালের বশে সে ভাবল– দূর! নেমির পুরুত বড় বেশিদিন ধরে শাসন করছে। অতএব সে আরো ষণ্ডামার্কা একজনকে ভাড়া করে পুরোহিতকে মারার ব্যবস্থা করে। এ্যান্টোনাইনস্-এর সময় ইতালিতে বেড়াতে গেছেন এমন পরিব্রাজকের লেখা থেকে জানতে পাই যে, কালিগুলার সময় পর্যন্ত পুরোহিতের পদটি মল্লযুদ্ধের মাধ্যমেই জিতে নিতে হতো।

আজও নেমিতে ডায়নার পূজাঅর্চনার কিছু কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে মানতের যে সব দৃষ্টান্ত মিলেছে তা থেকে মনে হয়, দেবীকে প্রধানত শিকারী হিসেবেই পূজা করা হয়েছে। এরপর ক্রমে তিনি স্বামী-স্ত্রীর সন্তান এবং পোয়াতির সহজ প্রসবের অনুমোদন দান করেছেন। আবার তাঁর পূজাচারে মনে হয় আগুনেরও একটা বড় ভূমিকা ছিল। তাঁর বার্ষিক উৎসব হতো তেরই আগস্টে, অর্থাৎ বছরের সবচেয়ে খরার সময়। সেসময় তাঁর কুঞ্জাশ্রমে অনেকগুলো মশালও জ্বালানো হতো। আগুনের লেলিহান শিখা বিম্বিত হতো হ্রদের জলে। ওই দিন ইতালির এ মাথা থেকে ওমাথা– প্রত্যেক গৃহের চুলোয় পবিত্র আগুন জ্বালিয়ে পালন করা হতো ডায়নার ধর্মাচার। তাঁর আশ্রমে–ব্রোঞ্জের ছোট ছোট মূর্তি পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যায়, দেবী ডান হাতে উঁচু করে ধরে আছেন মশাল। আর যেসব মহিলার প্রার্থনা তিনি কবুল করতেন, তারা জবা ফুল এবং হাতে প্রজ্বলিত মশাল নিয়ে মানত রক্ষা করতে আসত দেবীর কুঞ্জাশ্রমে। অজ্ঞাত কেউ একজন একবার নেমির ছোট মন্দিরে সম্রাট ক্লডিয়াস এবং তার পরিজনের নামে এক অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল– তারও নিদর্শন মেলে। কুঞ্জবনে টেরাকোটা দেয়ালি আবিষ্কার করা গেছে অনেক। মনে

হয় এগুলো অধস্তন ব্যক্তিদের নামে একই উদ্দেশ্যে জ্বালানো হতো। যদি তাই হয়, তো ক্যাথলিকরা যে চার্চে পবিত্র মোমবাতি জ্বালে তার সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশ স্পষ্টই চোখে পড়ে। আবার নেমির ডায়নার একটা উপাধি কিন্তু 'ভেস্তা' বা 'বহ্নিশিখা'। এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মন্দিরে সব সময়ই জ্বলত এক পবিত্র অনির্বাণ শিখা। মন্দিরের তলার কোষ্ঠে উত্তর-পূর্ব কোণে একটা প্রশস্ত গোল চত্বর আছে। তিন ধাপ উঁচু চত্বরে মোজাইকের কিছু নিদর্শন দেখা যায়। রোমান ফোরামের ভেস্তার গোল মন্দিরে যেমন, তেমনি এখানেও সম্ভবত ডায়নার ভেস্তারূপের সমর্থন মেলে এই গোল মন্দিরে। ভেস্তার কুমারী পূজারিণীরা পবিত্র বহ্নি জ্বালিয়ে যেত। টেরাকোটায় এক পূজারিণীর মাথাও পাওয়া গেছে। কুমারীদের জ্বালানো পবিত্র আগুন মনে হয় সমগ্র ল্যাটিন অঞ্চলেই পুরাকাল থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত চালু ছিল। আবার দেবীর বার্ষিক উৎসবে শিকারী কুকুরদেরও সাজানো হতো নানা সাজে এবং বন্য শিকারকে নির্যাতন করা হতো না। দেবীর বিগ্রহের সামনে যুবকেরা আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়ায় অংশ নিত। মদ চলত এবং ভোজে থাকত পাঁঠা, পত্রপাতে পরিবেশিত গরম কেক এবং ডাল-পাতাসহ ঝুলন্ত আপেল।

কিন্তু নেমির উপবনে ডায়না যে একাই রাজত্ব করেছে তাতো নয়। আরো দুজন ছোট মাপের দেবী তাঁর বনে থাকতেন। একজনের নাম ইজেরিয়া। তিনি স্বচ্ছ জলের রাণী। এই জলের ধারা সবুদ্বুদ নেমে আসত আগ্নেয়শিলার ওপর দিয়ে এবং বেশ বড়সড় মোহন প্রপাতের বেশে ওই হ্রদে নামতো লা মোল নামের জায়গাটায়। আধুনিক নেমি পল্লীর mill বা কারখানাগুলো এই জায়গায় রয়েছে বলে এর এমন নাম। পাথরকুঁচির ওপর দিয়ে টগবগ করে নামত জলের স্বচ্ছ ধারা। ওভিদ এই স্বচ্ছতোয়ার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে, এর জল নাকি তিনি প্রায়ই খেতেন। পোয়াতি মেয়েরা ইজেরিয়ার কাছে মানত করত, পশু বলি দিত; কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে ডায়নার মতো এই নিমদেবীও সহজ প্রসবে সাহায্য করতে পারেন। লোকপ্রথায় এমন বিশ্বাস রয়েছে যে, এই জলদেবী জ্ঞানী রাজা ন্যুমার স্ত্রী কিংবা উপপত্নি ছিলেন। রাজা নাকি নির্জন নিকুঞ্জে দেবীর সঙ্গে প্রেম করতে আসত এবং রোমকদের যে আইন সে দেয়, তা নাকি এই দেবীর সঙ্গে নিভৃতে আলাপচারিতায় প্রাপ্ত অনুপ্রেরণার ফল। প্লুটার্ক এই কাহিনিকে মানুষের জন্য অন্যান্য দেবীর প্রেমের কাহিনির সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেমন, সুদর্শন তরুণ অটিস আর এ্যান্ডিমিয়নের জন্য সিবেলি এবং চাঁদের ভালোবাসা। অনেকের মতে, প্রেমিক প্রেমিকার সাক্ষাতের স্থান নেমির উপবন নয়, বরং রোমের জল-চোয়ানো বন্দর পোর্টা ক্যাপেলার বাইরে একটা কুঞ্জবন। সেখানে ইজেরিয়ার আরেকটি পবিত্র ঝর্ণা পাথরের অন্ধকার কন্দর থেকে বেরিয়ে এসেছে। রোমের কুমারী মেয়েরা প্রতিদিন এই ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে আসত সতী দেবীর মন্দির ধোবে বলে। মাটির কলসি ভরা জল মাথায় করে নিয়ে আসত তারা। টুভেলানের সময় প্রাকৃতিক শিলাখণ্ড মার্বেলে পরিণত হয় আর মন্দিরের পবিত্র জমি ইহুদি– উদ্‌বাস্তু দ্বারা বিনাশ হয়ে যায়। জিপসিদের মতো এই ইহুদিরা অবশ্য তাড়া খেয়ে বাধ্য হয়েছিল দেবীর কুঞ্জবনে ছড়িয়ে পড়তে। আমরা এ কথা ভাবতে পারি যে, নেমির হ্রদে পড়েছে যে ঝর্ণাধারা তা আসলে ইজেরিয়া, এবং আলবান পর্বতাঞ্চল থেকে প্রথমদিকের যেসব বসতিস্থাপনকারী টাইবার নদীর তীরে তীরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারাই এই জলরানীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে এবং শহরের তোরণের বাইরে তাঁর জন্য এক কুঞ্জাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। এই পবিত্র মন্দিরাঞ্চলে অনেক স্নানাগারের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে, সেই সঙ্গে টেরাকোটায় তৈরি মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও। এতে মনে হয় যে, ইজেরিয়া ঝর্ণার জল মানুষের রোগমুক্তির কাজেও ব্যবহৃত হতো। রোগীরা হয়ত আশার বশে কিংবা দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসেবে অসুস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিকৃতি দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করত। ইউরোপের বহু গ্রামে আজও এই ধরনের রীতি চালু রয়েছে। ঝর্ণার জলে মনে হয় আজও রোগব্যাধি নিরাময়ের গুণ রয়ে গেছে।

নেমির দ্বিতীয় নিমদেবী হলেন ভার্বিয়াস। কিংবদন্তি আছে এমন যে, এই ভার্বিয়াস ছিল তরুণ গ্রিক বীর হিপোলিটাস– খুব নিষ্পাপ ও সৎ চরিত্রের অধিকারী। সে শিকারের কলাকৌশল শিখেছিল নরাশ্বদানব কিরনের কাছ থেকে। সারাক্ষণ সে অরণ্যে তাঁর একমাত্র সঙ্গিনী আর্টেমিসকে (ডায়নার গ্রিক নাম) সঙ্গে করে বুনো জন্তু জানোয়ার তাড়া করে ফিরতো। আর্টেমিস দেবীর সঙ্গলাভে সে খুবই অহঙ্কার করতো। ফলে মেয়েদের ভালোবাসার সে তোয়াক্কা করত না। বিপত্তি ঘটলো এখানেই। তার এই অবজ্ঞা গিয়ে লাগলো আফ্রোদিতির আঁতে। প্রেমদেবী তখন হিপোলিটাসের সৎ-মা ফ্রিডাকে উস্কে দেয় তার সঙ্গে প্রেম করতে। সৎ-মায়ের কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে মা তার বাবা থিসিউসের কাছে গিয়ে তার বিরুদ্ধে ইজ্জতহানির অভিযোগ করে। অভিযোগ বিশ্বাস করে থিসিউস তার মুরুব্বি সমুদ্রদেব পসাইডনের কাছে প্রার্থনা জানায় যেন দেবতা এই কল্পিত অন্যায়ের শোধ নেন। অতএব একদিন যখন হিপোলিটাস সারোনিক উপসাগরের তীর দিয়ে রথ চালিয়ে নিচ্ছে, তখন সমুদ্রদেব ঢেউয়ের মধ্য থেকে মারমুখো এক ষাঁড় পাঠান। রথের ঘোড়াগুলো আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলে হিপোলিটাস রথ থেকে ছিটকে পড়ে এবং ঘোড়ার ক্ষুরের নিচে থেঁতলে গিয়ে মারা যায়। কিন্তু ডায়না তো এই তরুণ বীরকে ভালোবাসেন।

দেবী তখন করেন কি, হেকিম এ্যাসকুলাপিয়াসকে রাজী করান ভেষজ ঔষধ দিয়ে এই তরুণ শিকারিকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফেরাতে। কিন্তু এতে দেবরাজ জুপিটার হলেন নাখোশ। কেন এক নশ্বর প্রাণী ফিরে যাবে মৃত্যুর প্রান্ত থেকে? রেগে গিয়ে তিনি অনধিকারচর্চাকারী হেকিম সাহেবকেই নিক্ষেপ করলেন নরকে। কিন্তু ডায়না তাঁর প্রিয়পাত্রকে দেবরাজের রোষানল থেকে লুকিয়ে রাখেন ঘন মেঘের আবরণে। উপরন্তু, তার সুরত পাল্টানোর জন্য তার বয়সও দেন বাড়িয়ে। এরপর তাকে নিয়ে যান সুদূর নেমির উপত্যকায়। সেখানে নিয়ে তাকে জলপরী ইজেরিয়ার হেফাজতে রাখেন। এরপর থেকে ভার্বিয়াস নাম নিয়ে সেখানেই ইতালির গভীর বনাঞ্চলের নিভৃতে হিপোলিটাসের অজ্ঞাত জীবন শুরু হয়। সেখানে সে রাজা হিসেবে রাজত্ব করে এবং ডায়না দেবীর উদ্দেশ্যে একটা মন্দিরও স্থাপন করে। তার এক যোগ্য সন্তান ছিল যার নামও ভার্বিয়াস। তো বাপের পরিণতির তোয়াক্কা না করে সে এক পাল তেজী ঘোড়া ছুটিয়ে যায় ঈনিয়াস আর ট্রোজানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। নেমি ছাড়া অন্য আরও কয়েক জায়গায় ভার্বিয়াসকে একজন দেবতা হিসেবেই অর্চনা করা হতো। ক্যাম্পানিয়াতে এক বিশেষ পুরোহিতের কথা শোনা যায়, যে নাকি ভার্বিয়াসের সেবায় নিয়োজিত। যেহেতু ঘোড়াই মেরেছে হিপোলিটাসকে, এজন্য আরিচিয়ার উপবনে এবং আশ্রমাঞ্চলে ঘোড়ার প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। ভার্বিয়াসের প্রতিকৃতি স্পর্শ করা যেত না। কেউ কেউ ভাবত সে বোধ হয় সূর্যদেব। "কিন্তু আসল সত্য হল সে ডায়নার সঙ্গে সম্পর্কিত এক নিমদেবতা, যেমন কিনা এ্যাটিস যুক্ত দেব-জননীর সঙ্গে, এ্যারিকথোনিয়াস যুক্ত মিনার্ভার সঙ্গে এবং এ্যাডোনিস ভেনাসের সঙ্গে।" এই সম্পর্ক কি ধরনের তা আমরা শীঘ্রই বিচার করব। তবে আপাতত এ কথা বলা যায় যে, এই পৌরাণিক বীরের ঘটনাবহুল দীর্ঘ জীবনের দম প্রশংসনীয় বটে। রোমান দিনপঞ্জিতে যে সন্ত হিপোলিটাসের কাহিনি পাওয়া যায়, যে তেরই আগষ্ট অর্থাৎ ডায়নার নিজের দিবসে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিল; সে যে আমাদের আলোচ্য গ্রিক বীর হিপোলিটাস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পাপিষ্ঠ পৌত্তলিক হিসেবে দু-দুবার মরেও সে এখন প্রাণ পেয়ে খ্রিস্টান সন্ত হিসেবে দিব্যি মহানন্দে টিকে আছে।

নেমিতে ডায়নার পূজাপাট্য সম্পর্কে যে সব কেচ্ছা প্রচলিত, তাদের যে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই তা প্রমাণ করতে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয় না। এই কাহিনিগুলো সেইসব বৃহত্তর পুরাকাহিনির অন্তর্গত, যে কাহিনি তৈরী করা হয় ধর্মীয় পালাপার্বণের জন্মবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করার জন্য। অন্য সংস্কৃতিতে প্রচলিত একই ধরনের কাহিনির সঙ্গে বাস্তবিক বা কাল্পনিক মিথের ভিত্তি ছাড়া এদের আর কোনো মিল নেই। নেমিপুরাণের অসংগতি খুবই স্পষ্ট, কেননা পূজা-অর্চনার ভিত কখনো কখনো অরেস্টেস, কখনো হিপোলিটাসকে ঘিরে, অর্থাৎ ধর্মাচারের যখন যে প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলা হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে এই পুরাণ গড়ে উঠেছে। এই সব কাহিনির আসল মূল্য হলো এই যে, তারা তুলনার একটা মানদণ্ড সৃষ্টি করে; ফলে পূজা-অর্চনার প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়াও, সরাসরি না হলেও এই কেচ্ছা-কাহিনি প্রমাণ করে যে, গল্পের আসল উৎস প্রাচীনকালের কল্পকাহিনির কুজ্ঝটিকায় কোথাও হারিয়ে গেছে এবং এভাবে কাহিনিগুলো তাদের মহান যুগেরও এক সাক্ষী হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে সম্ভবত আপাত ঐতিহাসিক ধারার চেয়ে এসব কাহিনির ওপরই বেশি নির্ভর করা যায়। জ্যেষ্ঠ কাটো আবার বলেন যে, ইতালির তাসকুলামের এক নায়ক জনৈক ইজেরিয়াস ব্যাবিয়াস বা ল্যাভিয়াস নাকি কুঞ্জাশ্রমটি ডায়না দেবীকে উৎসর্গ করেছিলেন– তাসকুলাম, আরিচিয়া, লাজুভিয়াম, লরেন্টাম, বোরা, টাইবার, পমেসিয়া এবং আর্ডিয়ার জনগণের পক্ষ থেকে। এই ঐতিহ্য অবশ্য কুঞ্জাশ্রমের স্বর্ণযুগেরই পরিচায়ক, কেননা এতে বলা হয় যে– এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৪৯৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দেরও আগে। ওই বছর রোমানরা পমেসিয়া লুট করলে ইতিহাস থেকে এই রাজ্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু ল্যাটিন রাজ্যগুলো তো নিঃসন্দেহে ছিল খুবই সভ্য। তাহলে এতগুলো নগর-রাষ্ট্র কি করে আরিচিয়ার পৌরোহিত্যের মতো একটি বর্বরপ্রথা এভাবে প্রতিষ্ঠিত করে? নিশ্চয়ই তাহলে এই প্রথা স্মরণাতীতকালের কোনো প্রথা এবং আমাদের জানামতে, ইতালি তার যে কোনো ঐতিহাসিক সময়ের চেয়ে ছিল অনেক বেশি অসভ্য। আরেকটি কাহিনি চালু আছে যা এই ধারাকে শক্তিশালী করার চেয়ে বরং আরও নড়বড়ে করে দিয়েছে। এই গল্পে কুঞ্জাশ্রম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব চাপানো হয়েছে জনৈক ম্যানিয়াস ইজেরিয়াসের কাঁধে। এই ব্যক্তি বলেছিল, "আরিচিয়াতে বহু মানি আছে।" এই প্রবাদ বাক্য অনেকে বিশ্লেষণ করেন এভাবে যে, ম্যানিয়াস ইজেরিয়াস সর্বকালের বিখ্যাত এক বংশের আদিপুরুষ। আবার অনেকে বলেন যে, এই প্রবাদ বাক্যটি একথাই বোঝায় যে আরিচিয়ায় বহু কুৎসিত এবং বিকৃতাঙ্গ ব্যক্তির বসবাস এবং তাদের ম্যানিয়াস নাম হয় ম্যানিয়া থেকে। ম্যানিয়া শব্দের অর্থ – একরোখা গোঁয়ার গোবিন্দ। বাচ্চাদের ভয় দেখানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। একজন রোমক ব্যঙ্গ লেখক ম্যানিয়াস বলতে বোঝান আরিচিয়ার রাস্তার ঢালে শুয়ে থাকা ভিক্ষুদের। এইসব ভিক্ষু তীর্থের কাকের মতো যাত্রীদের অপেক্ষায় পথ চেয়ে

থাকতো। এইসব নানামত নানাপথ এবং সেই সঙ্গে আরিচিয়ার ইজেরিয়াস এবং তাসকুলানের ইজেরিয়াস ল্যাভিয়াসের মধ্যে পার্থক্য আমাদের মনে সন্দেহ উস্কে দেয়। তবু কাটো এই ঐতিহ্য সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাতে একে খুব বাস্তব মনে হয় এবং এর স্থপতি এমন একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যে এই তথ্যকে স্রেফ অলস কল্প-কাহিনি বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। বরং আমরা এমন মনে করতে পারি যে, এর দ্বারা প্রাচীনকালের কোনো কুঞ্জাশ্রমেরই পুনঃস্থাপন বা পুনর্নির্মাণের কথা বলা হয়েছে এবং নগর রাষ্ট্রগুলোর সচেতন প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হয়েছে। যাই হোক, এসব ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসে উপনীত হওয়া যায় যে, কুঞ্জাশ্রম প্রাচীন কাল থেকেই সমগ্র ল্যাটিন রাজ্যের না হোক বহু পুরনো নগর-রাজ্যেরই এক বারোয়ারি অর্চনা মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর্টেমিস ও হিপোলিটাস

আমি বলেছি যে অরেস্টেস এবং হিপোলিটাসের আরিচিয়া ভিত্তিক বিভিন্ন কাহিনি ইতিহাস হিসেবে মূল্যহীন হলেও তাদের অন্য একটি উপযোগিতা আছে। নেমিতে পূজার ধরন অন্যান্য কুঞ্জাশ্রমের ধর্মাচারের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারি। নিজেদেরই আমাদের প্রশ্ন করতে হবে– ভার্বিয়াস এবং অরণ্যরাজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাহিনিনির্মাতা অরেস্টেস এবং হিপোলিটাসকে এত টেনেছেন কেন? অরেস্টেসের বেলায় না হয় উত্তরটা স্পষ্ট। আরিচিয়ার পৌরোহিত্যের যে রক্তাক্ত ও খুনে শাসনের উত্তরাধিকার, তা বুঝতে অরেস্টেস এবং টরিক ডায়নার প্রতিকৃতি– যা কিনা কেবল মানুষের রক্তেই নিবৃত্ত হয়– নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু হিপোলিটাসের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটা এত সোজা নয়। যেভাবে হিপোলিটাসের মৃত্যু হয়েছিল তাতে উপবনে ঘোড়ার প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু কেবল এই একটি ঘটনাতেই কিন্তু হিপোলিটাসের পরিচয় মেলে না। এজন্য পূজা-অর্চনার ধরন এবং হিপোলিটাসের মিথ বা পুরাণের আরও গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

হিপোলিটাসের পৈত্রিক নিবাস ট্রয়েজেন-এ। সেখানে তার এক বিখ্যাত কুঞ্জাশ্রম আছে। প্রায় স্থলবন্দী মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এক উপসাগরের তীরে অবস্থিত এই আশ্রম। বর্তমানে সেখানে সাগরের উভয়তীরে পর্বতের রুক্ষ পাদদেশে কমলা আর নারঙ্গি বন সমগ্র জায়গাটা আবৃত করে আছে। হেসপেরাইডস্ বাগান ছাড়িয়ে দীর্ঘ সাইপ্রাস গাছের চূড়া ঘন সবুজ শিখার মতো ঊর্ধ্বগামী। শান্ত সাগরের নীল জলকে খোলা সমুদ্রের কবল থেকে রক্ষা করেছে এই উপসাগর। সেখানে রয়েছে সমুদ্রদেব পসাইডনের পবিত্র দ্বীপাঞ্চল। ছোট টিলার চূড়া পাইন গাছের ঘন স্নিগ্ধ সবুজে আচ্ছাদিত। এই সুন্দর সাগরপাড়েই অর্চনা হতো হিপোলিটাসের। তার কুঞ্জাশ্রমে ছিল এক মন্দির, তাতে রক্ষিত ছিল এক প্রাচীন প্রতিকৃতি। পূজা সম্পন্ন করত এক পুরোহিত। ওই পদে সে আসীন থাকত সারা জীবন। হিপোলিটাসের সম্মানে প্রতি বছর এক বলি উৎসব পালন করা হতো এবং তার অকালমৃত্যুতে ফি বছর যথাযথ মর্যাদায় শোকও জ্ঞাপন করা হতো। কুমারী মেয়েরা চোখের জলে করুণ সংগীতের মাধ্যমে এই শোক যাপন করত। বিয়ের আগে যুবক যুবতী নিজেদের চুলের গোছা উৎসর্গ করত ওই মন্দিরে। ট্রয়েজেন–এ ছিল তার সমাধি, যদিও লোকে বলত না ঠিক কোন জায়গাটায় সেই সমাধি। প্রিয়দর্শন হিপোলিটাস আর্টেমিস দেবীর প্রিয়পাত্র, অথচ ভরা যৌবনেই সে ঝরে পড়েছে। কুমারী মেয়েরা তার জন্য প্রতি বছর অশ্রুবর্ষণ করে। তো এই হিপোলিটাসের মধ্যেই আমরা সাক্ষাৎ পাই এক প্রেমিকের, যে মরণশীল হওয়া সত্ত্বেও দেবীর ভালোবাসা পেয়েছিল। প্রাচীন ধর্মে এমন ঘটনা কিন্তু প্রচুর। সবচেয়ে পরিচিত এমন আরেকটি কাহিনি হল এ্যাডোনিসের। হিপোলিটাসকে নিয়ে আর্টেমিস ও ফ্রিডার যে রেষারেষি, তা বলা হয় প্রকারান্তরে এ্যাডোনিসের প্রেমের জন্য আফ্রোদিতি এবং প্রসারপাইনের প্রতিদ্বন্দ্বিতারই এক রূপ। ফ্রিডা নিছক আফ্রোদিতিরই আরেক সত্তা। এই তত্ত্বে সম্ভবত হিপোলিটাস কি আর্টেমিসের প্রতি অবিচার করা হয় না, কারণ আর্টেমিস মূলত কিন্তু কৃষির এক প্রধান ফলন দেবী এবং পুরাকালের ধর্মমত অনুসারে প্রকৃতির ফুল্লরা, যার কাজে তাকে স্বয়ং হতে হয় ফলবন্ত। অতএব তাকে অবশ্যই এক পুরুষসঙ্গী রাখতে হবে। এই মত অনুযায়ী ট্রয়েজান-এর বিবাহযোগ্য ছেলেমেয়েরা যে তাদের চুলের গুচ্ছ দান করত তার তাৎপর্য এই যে, দেবীর সঙ্গে তাদের বন্ধন যেন আরও দৃঢ় হয়। আর এভাবেই মাটির, গবাদিপশুর এবং মানুষের ফলবন্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। এই মতের সমর্থন মেলে আরেকটি দৃষ্টান্তে। সেটি হল, ট্রয়েজেন-এ হিপোলিটাসের মন্দিরে দামিয়া এবং অক্সেসিয়া নামে দুই স্ত্রী-শক্তির পূজা করা হতো। জমির উর্বতার সঙ্গে যে এই স্ত্রী-শক্তির সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এপিদাউরাসে খুব খরা দেখা দিলে লোকে দিব্যবাণী অনুযায়ী দামিয়া এবং অক্সেসিয়ার প্রতিকৃতি আঁকে পবিত্র জলপাই কাঠের গুঁড়িতে। প্রতিকৃতিও আঁকা শেষ আর দেখা যায় মাটিতে আবার শস্য গজাতে শুরু করল। আরও কাহিনি আছে। এই দুই স্ত্রী-শক্তিকে ট্রয়েজেন-এর লোকেরা কুমারী বলে ডাকে। তো সেখানকার হিপোলিটাস মন্দির প্রাঙ্গণেই এই দুই কুমারীর সম্মানে পাথর নিক্ষেপের এক অদ্ভুত প্রথা পালন করা হতো। ভালো ফলন নিশ্চিত করতে এ ধরনের

পাথর নিক্ষেপের প্রথা যে আরও বহু দেশে পালন করা হতো তার নজীর দেখানো খুবই সোজা। যৌবনদীপ্ত হিপোলিটাসের বিয়োগান্তক মৃত্যুতে একই ধরনের অন্য আরও গল্পে অমর দেবীর ভালোবাসার ক্ষণিক আনন্দের মূল্য পরিশোধ করতে সুদর্শন তরুণদের প্রাণ বিসর্জনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এইসব হতভাগ্য প্রেমিক সবসময় যে কল্পকাহিনির সৃষ্টি তা হয়ত নয়, আর গল্পে যে তাদের ক্ষরিত রক্তে বাগানে ফুল ফুটে ওঠে, রক্তজবার লাল রং, কি গোলাপের রক্তবর্ণের ছোপ– এসবও কিন্তু শুধু যৌবন ও সৌন্দর্যের গ্রীষ্মকালীন পুষ্পের মতো ক্ষণস্থায়ী হওয়ার অমন কবিকল্পনা নয়। মানবজীবন আর নিসর্গ জীবনের সম্পর্ক বিষয়ে এক গভীর দর্শন নিহিত আছে এইসব কাহিনিতে– এমন বিষাদময় দর্শন যা জন্ম দিয়েছে বিয়োগান্তক প্রথা-পার্বণের। কি সেই দর্শন এবং কি সেই প্রথা তা আমরা আরেকটু পরেই জানব।

স্মৃতিচারণ

এখন সম্ভবত বুঝতে পারব, কেন পুরাকালের মানুষ আর্টেমিসের প্রেমিক হিপোলিটাসকে ভার্বিয়াসের সঙ্গে এক করে দেখেছে। ঐতিহাসিক সার্ভিয়াসের মতে, এই ভার্বিয়াস আর ডায়নার যে সম্পর্ক, এ্যাডোনিস আর ভেনাসের অথবা এ্যাটিস আর দেব-জননীরও সেই একই সম্পর্ক। আর্টেমিসের মতো ডায়নাও ছিল সাধারণভাবে ফলনদেবী এবং বিশেষভাবে প্রসবদেবী। ফলে তার গ্রিক অনুপক্ষের মতো তারও প্রয়োজন হয় এক পুরুষ সঙ্গীর। সার্ভিয়াসের কথা যদি ঠিক হয় তো তারও সেই পুরুষসঙ্গীটি ছিল ভার্বিয়াস। এভাবে পরিষ্কার বলা যায় যে, নেমির প্রথম রাজা এবং পবিত্র কুঞ্জাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ভার্বিয়াসই ডায়নার পুরোহিত অরণ্যরাজের পৌরাণিক আদিপুরুষ বা পুরোহিত বংশের প্রত্নপ্রতীক। এই সব পুরোহিত তার মতোই একের পর এক নৃশংসতার শিকার হয়ে প্রাণ দিয়েছে। অতএব খুবই স্বাভাবিক যে ভার্বিয়াস যে-সম্পর্কের অধিকারে মন্দিরের দেবীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই একই সম্পর্ক নিয়ে এইসব পুরোহিতও দেবীর পূজা-অর্চনা করে গেছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, নশ্বর অরণ্যরাজ তার রাণী হিসেবে পেয়েছে স্বয়ং বনদেবী ডায়নাকেই। আর যদি সেই পবিত্র বৃক্ষ যাকে সে প্রাণ দিয়ে রক্ষার কাজে নিয়োজিত, সেই পবিত্র বৃক্ষকে দেবীর বিশেষ অবতার হিসেবেই মনে করা হয়, তাহলে খুবই সম্ভব যে দেবীর পূজারী কেবল ওই বৃক্ষের পূজাই করত না, মাঝে মাঝে স্ত্রী হিসেবে তাকে আলিঙ্গনও করত। এ রকম মনে করায় উদ্ভট কিছু নেই। কারণ, ঐতিহাসিক প্লিনির সময়ও একজন অভিজাত রোমক আলবান পর্বতে ডায়নার আরেকটি পবিত্র কুঞ্জে এক সুদর্শন বীচ গাছকে নিয়ে এমন আচরণ করেছে বলে প্রমাণ আছে। সে গাছটিকে জড়িয়ে ধরত, চুমু খেতো, এর ছায়াতলে শুতো, গাছের কাণ্ডে মদ ঢালত। স্পষ্টতই সে মনে করত, যেন গাছটি স্বয়ং দেবী। আজও ভারতে এবং পবর্তদেশের বিভিন্ন স্থানে গাছের সঙ্গে নারী পুরুষের একেবারে দৈহিক বিয়ের প্রথাও চালু রয়েছে। তাহলে প্রাচীন ল্যাটিন অঞ্চলে থাকবে না কেন?

এভাবে দৃষ্টান্তগুলোর সামগ্রিক বিচার করে আমরা একথা বলতে পারি যে, নেমির পূতপবিত্র কুঞ্জাশ্রমে ডায়নার পূজাপাট্যের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং তা প্রচলিতও ছিল স্মরণাতীতকাল থেকে। বনাঞ্চলের দেবী হিসেবে, বন্য প্রাণীর দেবী হিসেবে, গৃহপালিত পশুপাখির এবং ক্ষেত-খামারের ফলনদেবী হিসেবেও মানুষের মনে ডায়নার আসন ছিল শ্রদ্ধাভক্তির। লোকে বিশ্বাস করত যে, দেবীর আশীর্বাদে স্বামী-স্ত্রী সন্তান লাভ করে এবং প্রসবের সময়ও দেবীর সহায়তা পায় পোয়াতি। কুমারী মেয়েরা তার পূতাগ্নি জ্বালিয়ে রাখে এবং তা অনির্বাণ শিখায় জ্বলে মন্দির প্রাঙ্গণের গোল চত্বরে। দেবীর সহগামী ছিল জলপরী ইজেরিয়া। এই নিমদেবী ডায়নার একটা দায়িত্ব নিজেই পালন করত। সেটা হল প্রসবকালে পোয়াতির ব্যথা প্রশমন করা। এই জলদেবী এক রোমক রাজার সঙ্গে উপবনে সহবাস করেছে বলেও জনশ্রুতি আছে। আমরা আরও জানতে পাই যে, বনের দেবী ডায়নার নিজেরই ছিল এক পুরুষসঙ্গী–নাম তার ভার্বিয়াস। এ্যাডোনিস যেমন ভেনাসের, এ্যাটিস যেমন সিবেলের, তেমনি ভার্বিয়াসও ডায়নার। শেষে জানতে পাই, এই পৌরাণিক ভার্বিয়াস ঐতিহাসিক যুগে যাদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তারা হলো এক দল পুরোহিত। এদের উপাধি অরণ্যরাজ। এই অরণ্যরাজেরা নিয়মিতভাবে উত্তরাধিকারীর তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ দিয়েছে এবং এদের জীবন একভাবে বাঁধা ছিল কুঞ্জের বিশেষ এক বৃক্ষের জীবনের সঙ্গে, কারণ যতদিন ওই গাছের কোনো ক্ষতি না হতো ততদিন তারাও বাইরের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে পারত। এই সব সিদ্ধান্ত স্পষ্টতই পৌরোহিত্যের উত্তরাধিকারের অদ্ভুত নিয়মকানুন বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষা করলে আমরা সম্ভবত বুঝতে পারব যে এই সব সিদ্ধান্তে নিহিত আছে সমাধানেরও বীজ। এখন তাহলে আমাদের সেই বৃহত্তর নিরীক্ষাতেই নিয়োজিত হতে হয়। খুব দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য এই প্রয়াস, কিন্তু এতে হয়ত আবিষ্কারের দীর্ঘযাত্রার আনন্দ আর চমকও মিলবে। এই পরিভ্রমণে আমাদের বহু ভিনদেশী রাজ্য পেরোতে হবে, বহু পরদেশী মানুষ আর তাদের অদ্ভুত সব আচার আচরণ, প্রথা আর রীতিনীতির সঙ্গে হবে আমাদের পরিচয়। দরাদরিতে ইতোমধ্যেই হাওয়া নাড়া দিয়েছে। তাহলে এবার পাল খুলে দিই এবং আসুন কিছু সময়ের জন্য আমরা ইতালির সৈকত থেকে নোঙর তুলি।

উত্তর আমেরিকায়

হাসনাত আবদুল হাই

এক॥

বাংলাদেশ বিমান অবাক করে দিয়ে ঠিক রাত এগারটা পঁয়তাল্লিশে যাত্রার সময় ঘোষণা করল। ভিআইপি লাউঞ্জে বসবার তো নয়ই, দাঁড়াবার জায়গাও নেই। এক সচিব বিদেশে অধ্যয়নরত মেয়েকে রিসিভ করতে এসেছেন, সঙ্গে স্ত্রী এবং পুরো পরিবার। সেইসঙ্গে অমাত্যবর্গ, তারা তুষ্টি সাধনে ব্যস্ত। এক ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা আমেরিকা যাচ্ছেন সপরিবারে তার অধ্যয়নরত পুত্রকে দেখতে। তিনি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা পুরো এক সোফা সেট জুড়ে বসে। একজন সংসদ সদস্য এসেছেন, তাঁকে বিদায় দিতে এসেছে তার প্রায় পুরো নির্বাচনী এলাকার মানুষ; বেশির ভাগই তরুণ। এমনি আরও কয়েকজন যাত্রী ও তাদের সহচরদের সরব উপস্থিতিতে ভিআইপি ভাড়াক্রান্ত এবং ভিড়াক্রান্ত, দুইই। আমার স্ত্রী-কন্যা-পুত্র বিদায় জানাতে আসে নি। ভিআইপি লাউঞ্জের মর্যাদা রক্ষার বিবেচনায় নয়, গভীর রাত্রির কথা মনে করে। তবে আমা দপ্তরের বেশ কয়েকজন এসেছেন, পাঁচজন তো হবেই। সচিব সহকর্মীকে বললাম, ভিআইপি লাউঞ্জ তুলে দিলে হয় না? এত লোক এখানে আসে, যার জন্য এর আলাদা কোনো আকর্ষণ নেই। সিভিল এভিয়েশন বিভাগ এখন সখেদে বলতেই পারে 'এই মণিহার আমার নাহি সাজে।' শুধু ভিভিআইপি লাউঞ্জ রাখলেই চলে। প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশ থেকে আগত সমপর্যায়ের অতিথিদের জন্য। এতে সাধারণ ডিপারচার লাউঞ্জের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে, সেইসঙ্গে হবে তার শ্রীবৃদ্ধিও। মন্ত্রী, সাংসদ এবং সিআইপি-ভুক্ত ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের পদধূলি পেয়ে সাধারণ যাত্রীদের ডিপারচার লাউঞ্জ শুধু ধন্য হবে না, নবজীবন লাভ করবে একই সঙ্গে।

সহকর্মী সচিব সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন। বললেন, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? হ্যাঁ, দেয়ার ইজ দা বার।

দুই॥

ফজলুল হক আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী। সলিমুল্লাহ হলে একসঙ্গে থেকেছি। অনার্স পরীক্ষার পর এক সঙ্গে একই প্যানেলে নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। আমি হয়েছি হল ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, সে নির্বাচিত হয়েছে ডাকসুতে। নির্বাচনের পর ডাকসুতে বিভাগীয় পদ লাভের জন্য দল বদলাবার জন্য তার বিছানাপত্র ফেলে দিয়েছিল– মনোনয়ন দিয়েছিল যেই ছাত্র সংগঠন তার কিছু মাসলম্যান। ফজলুল হক কয়েকদিন অন্যের সঙ্গে বিছানা শেয়ার করে দিন কাটিয়ে নিউমার্কেট থেকে নতুন তোশক বালিশ কিনে এনেছিল। সেই কেনা-কাটাকে সে নির্বাচনী খরচের মধ্যেই ধরেছিল।

ফজলুল হকের সঙ্গে আমার সখ্য বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রগাঢ়

ছিল না, কেননা সে এসেছে রাজশাহী থেকে আর আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের (ছাত্রীর সংখ্যা এত কম ছিল যে এটা তাদের জন্য অতটা প্রযোজ্য নয়) কলেজ ব্যাকগ্রাউন্ড তাদের মধ্যে নিবিড়তা এবং মেলামেশার ঘনিষ্ঠতার একটা প্রধান প্রণোদনা হিসেবে কাজ করত। ১৯৬২ সালে আমেরিকা থেকে ফেরার পথে কয়েকদিনের জন্য লন্ডন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে পাকিস্তান হাইকমিশনের সামনে ইউসুফ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি সোল্লাসে জড়িয়ে ধরে বলেন, এত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরবা কেন? এখানে তোমার বন্ধুদের অনেকেই আছে। এরপর তিনি ওয়াটারলু স্টেশনের লেফট লাগেজ থেকে আমার সুটকেস নিয়ে বেইজওয়াটারে নভারনারনেস টেরেসে এক এপার্টমেন্টে নিয়ে গেলেন। সেখানে অন্যান্যদের সঙ্গে ফজলু থাকে। তারা সবাই কাজ করছে, পার্ট-টাইম পড়ছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। লন্ডনে কয়েকদিনের থাকার পরিকল্পনা উড়িয়ে দিয়ে তারা আমার প্রায় পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা করে ফেলল। সেখান থেকে বেরিয়ে দেশে ফিরতে আমার লেগেছিল দু'বছর। সেই দু'বছর ফজলু আর আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তার সব কিছুই আমার মনঃপূত হয় নি, যেমন সে পারে নি আমার সবকিছু মেনে নিতে। সম্পর্ক তো পুরোপুরি মিল আর সামঞ্জস্যের জন্য গড়ে ওঠে না। বৈপরীত্য আর পার্থক্যগুলো মসৃণ করে দিতে পারে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, দৈনন্দিনের সান্নিধ্য। আমাদেরও তাই হয়েছিল।

ফজলু আমার প্রতি তার বন্ধুত্ব যে গভীর, বোধ করি তার প্রমাণ দেওয়ার জন্যই ১৯৯৭ সালে একদিন সচিবালয়ে আমার অফিসে এসে বলল, জরুরি কাজ আছে। বুঝলাম তার এলাকার রাস্তা মেরামত অথবা ব্রিজ তৈরির অনুরোধ নিয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে সে বলল, তোর সব বয়সের ছবি দিতে হবে আমাকে। শুনে আমি বেশ অবাক হয়ে বলি, কেন? হঠাৎ সব বয়সের ছবির প্রয়োজন হলো কেন? ফজলু চোখের পাতা একটুও না কাঁপিয়ে বলল, তুই মরে গেলে তোর ওপর একটা এ্যালবাম বার করব। স্মরণিকা। শুনে আমার মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ কথা বার হয় নি। আমি গম্ভীর মুখে বললাম, তোর আগে যে আমি মরবো একথা কী করে জানলি? ফজলু বিজ্ঞের মত বলল, তুই অফিসে সবাইকে যেমন বকাবকি করিস তা দেখেই বুঝতে পেরেছি তোর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। হয়তো একদিন অফিসেই .... । বলে সে আমার চেয়ারটার দিকে তাকায়। 'ডাই ইন হারনেস'– এই ইংরেজী ইডিয়মটির কথাই কি ভাবছে সে? জেনারেলরা যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, বৃদ্ধ বয়সে নিজ বাড়িতে বিছানায় শুয়েই মারা যান, আমলারাও তাই। 'ডাই ইন হারনেস' চমৎকার ইডিয়ম হতে পারে, কিন্তু বাস্তব জীবনে অবান্তর, প্রায় সব মানুষের ক্ষেত্রেই। আমি ফজলুর দিকে তাকিয়ে বললাম, এখন ১৯৯৭। আর দুই বছর পর অবসরে যাব। এতদিন যখন টিকে আছি, আরও দু'বছর বাঁচব ধরে নিতে পারিস। ফজলু তাতে আশ্বস্ত হয না। খুব সিরিয়াস মুডে বলে, তোর কিছু ঠিক নেই। শেষে আমার একটা আফসোস থেকে যাবে। তোর এ্যালবাম বার করা হবে না। ফজলুকে ছবি দেওয়া হয় নি, আমার আপত্তির জন্য না, সব বয়সের ছবি সংগ্রহে ছিল না বলে। তাছাড়া তার পরিকল্পনাটাই মনে হয়েছে হাস্যকর– সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও। আমি এমন কোনো কেউকেটা নই যে আমার এ্যালবাম কিনতে মানুষ লাইন দেবে। মিনি মাগনায় দিলে সের দরে বিক্রি করে দেবে নির্ঘাত। খুঁজে দেখতে হবে, পরে দেবো, এই সব বলে চা খাইয়ে ফজলুকে সে যাত্রা বিদায় করেছিলাম।

তিন॥

ফজলু অনেক দিনের বন্ধু হলেও দূরপাল্লার সফরে এই প্রথম সে আমার সঙ্গে। ব্যাপারটা বেশ কাকতালীয়ভাবেই ঘটে গিয়েছে। সে কিছুদিন আগে সিঙ্গাপুরে তার কানের অসুখের চিকিৎসার জন্য গিয়েছিল। সেখানে অপারেশনের পর তার মনে হয়েছে যে আমেরিকায় গিয়ে কোনো বিশেষজ্ঞের দ্বিতীয় মত নেবার প্রয়োজন। সেখানে তার ছেলে কিশোর কম্পিউটার প্রকৌশলী। থাকা-খাওয়া এমন কি চিকিৎসা খরচের চিন্তা নেই। সে সিঙ্গাপুর থেকেই বিমানের টিকিট কিনে নেয় আমেরিকা যাওয়ার জন্য। হিসেব করে দেখেছে ঢাকা থেকে কেনার জন্য যত টাকা লাগবে সিঙ্গাপুর থেকে কেনা হলে তার চেয়ে কম। হিসেবটা সেও বোঝে নি, আমাকেও বোঝাতে পারে নি। দু'জনে একসঙ্গে দূরপাল্লার যাত্রায় যাওয়ার পেছনে এই হলো তার দিকের ঘটনা। আমার ক্ষেত্রে যা হয়েছে তা হলো এই যে, হঠাৎ উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে যোগদানের একটা আমন্ত্রণ এলো, উদ্যোক্তা বাংলাদেশ জার্নালিস্টস এ্যান্ড রাইটার্স এসোসিয়েশন, যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমে বিষয়টাকে গুরুত্ব দিই নি, কেননা শুনেছি আমেরিকায় এখন একাধিক সংগঠন বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে। তাদের মধ্যে বেশ রেষারেষি এবং মতপার্থক্য রয়েছে। আর সবচেয়ে যেটা চিন্তার বিষয় সেটা হলো তারা ওয়ানওয়ে টিকিট দিয়ে বসে থাকে। ফজলুকে বলতেই সে নাম শুনে বলল, চিনি। কাকে? জিজ্ঞেস করে জানলাম, উদ্যোক্তাদের একজন মোজাম্মেল হক মিন্টু, তার সঙ্গে অনেক দিনের জানাশুনা। দু'একদিনের মধ্যেই সে টিকিটের ব্যাপারটা স্পষ্ট করে জেনে নেবে। দু'দিন না, পরদিনই সে জানাল যে রিটার্ন টিকিটই পাঠাচ্ছে উদ্যোক্তারা। তবে থাকতে হবে কোনো বাঙালির বাসায়। তারাই ঠিক করে দেবে। তারপর একটু থেমে ফজলু বলল, তার দরকার হবে না। জামশেদ, মানে তারার বাড়িতে থাকব আমরা।

আমরা? ফজলুও কি সাহিত্যিক হিসেবে অথবা সাংবাদিক পরিচয়ে আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকা যাচ্ছে?

ফজলু আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, আমি কান দেখাতে যাব। বিমানের টিকিট কেনাই আছে। কনফার্ম করে নিতে হবে। তুই সিভিল এভিয়েশনের সচিবকে বলে কনফার্ম করিয়ে দে।

শুনে খুব খুশি হলাম। আমেরিকা একা যেতে ভাল লাগত না। এখন তো আর আগের বয়স নেই। আমেরিকার কথা শুনলেই রোমাঞ্চ জাগে না। বেশ হবে দুই বন্ধু একসঙ্গে, পাশাপাশি বসে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে পৌঁছাবো আমেরিকায়। সিভিল এভিয়েশন সচিবকে বলার পর পরদিনই তিনি জানালেন ড. ফজলুল হকের টিকিট কনফার্মড। ফজলু সঙ্গে সঙ্গে জামশেদ মানে তারাকে ফোনে জানিয়ে দিলো, আমরা দু'জন নিউইয়র্ক আসছি সাতদিনের জন্য। তার বাড়িতে থাকব। জামশেদ ফজলুর রাজশাহী কলেজের বন্ধু, আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তারই সুবাদে এক বছর আগে। হাসিখুশি মানুষ, বহু বছর থেকে আমেরিকায় আছে, বিয়ে করেছে

এক আমেরিকান মহিলা। তাদের এক মেয়ে। ভাই মারা যাওয়ার পর জামশেদ কিশোর বয়সের ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমেরিকা নিয়ে সিটিজেনশিপ পাইয়ে দিয়েছে, এ্যাফিডেবিট দিয়ে দত্তক নিয়েছে তাকে। তার এক বিধবা বোনকেও নিয়ে সঙ্গে রেখেছে। তার ছোট আর এক বোনকেও স্পন্সর করে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছে। আমেরিকান হলেও লেনর, তার স্ত্রী-স্বভাবে খুব ভাল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুদের জামশেদের সাহায্য করাকে মোটেও অপছন্দের চোখে দেখে না। বরং তার মতই উৎসাহ দেখায়। লেনরের সঙ্গে তখনো দেখা হয় নি, কিন্তু শুনেই বলি, এমন মহিলা বাংলাদেশেও এখন কম। তবু মন খুঁতখুঁত করছিল, একজনের বাসায় দু'জন গিয়ে উঠব, কেমন দেখায়? অসুবিধে হবে তাদের। শুনে ফজলু বলল, কোনো অসুবিধা হবে না। লং আইল্যান্ডে ওদের বাড়িতে ছয় বেডরুম। একটিতে ওরা থাকে। একটিতে তার দত্তক ছেলে আর একটিতে বোন মুন্নী। বাকি তিনটি বেডরুমে বিড়াল শুয়ে থাকে। কেন তার মেয়ে? ফজলু বলল, আলিয়া তার কলেজের ক্যাম্পাসে থাকে। আমি বললাম, বিড়াল? বিড়াল থাকে মানে? ফজলু বলল, লেনরের বিড়াল পোষার বাতিক। ক'দিন পর পর বিড়াল নিয়ে আসে। তারা পালালে সে নতুন ধরে আনে।

আমি বললাম, তোর ছেলে কিশোরের সঙ্গে জামশেদের মেয়ের বিয়ের কথা বলছিলি। কি হলো? ফজলু গম্ভীর হয়ে বলল, হবে না। কেন? হবে না কেন? আমি তার দিকে তাকাই। ফজলু বলে, আলিয়ার বয়ফ্রেন্ড আছে। শুনে কিশোর এগুতে চায় না। আমি বললাম, আমেরিকা-ইউরোপে কেন, এখন বাংলাদেশেও প্রায় সব মেয়েরই বয়ফ্রেন্ড আছে। তারা সবাই বয়ফ্রেন্ডকে বিয়ে করে না। ফজলু বলল, কিশোর একটু কনজারভেটিভ। সে বয়ফ্রেন্ড আছে বা ছিল এমন মেয়ে বিয়ে করবে না। আমি বললাম , তাহলে কিশোরকে অনেকদিন আইবুড়ো থাকতে হবে। হয়তো সারা জীবনই। কোনো মানে হয়? ফজলু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কোনো মানে হয় না, অযথা।

যাবার দু'দিন আগে আমার একান্ত সচিব জানাল যে আমার টিকিট কনফার্মড হয় নি। রিকোয়েস্টে আছি। শুনে আমি স্তম্ভিত হই এবং তারপরই ক্রোধে ফেটে পড়ি। তাকে বলি, তুমি কী করছিলে এ ক'দিন, কনফার্ম করাওনি কেন? আমার বন্ধুরটা করিয়ে নিলে আর আমারটা হলো 'রিকোয়েস্ট'? তুমি আমার একান্ত সচিব, না একান্ত দুর্ভোগ? যাও, সামনে থেকে দূর হও। তোমার অকর্মণ্যতা, অদক্ষতা আর সহ্য করা যায় না। প্রশাসনের উপ-সচিবকে ডেকে বলি, 'আজই ওকে এখান থেকে বদলি করে দিন, অভিজ্ঞ কাউকে আনুন। সে আমার জন্য একটা মাথা ব্যথা হয়ে গিয়েছে। উপ-সচিব নোটপ্যাডে কলম ঠুকিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, দু'টো অর্ডার করব স্যার? আগের মতো? মানে? আমি বুঝতে না পেরে তাকাই তার দিকে। সে বলে, মানে আপনি আগেও ওকে দু'বার বদলি করে আবার ক্যানসেল করেছেন– কমপ্যাসনেট গ্রাউন্ড। এবারও তেমনই হবে কিনা জানতে চাইছিলাম। আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে তার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, রসিকতা করছে কিনা। বোঝা গেল না। মুখ একেবারে ভাবলেশহীন (অভিনয় করত কী চাকরিতে ঢোকার আগে?)। আমি হাতের কলম ঘুরাতে ঘুরাতে বলি, এবার এই অর্ডার ফাইনাল। একটাই অর্ডার টাইপ করা হোক।

সিভিল এভিয়েশন সচিবকে জানাতেই তিনি বললেন, আপনিও ঐ একই ফ্লাইটে যাচ্ছেন? আগে বলেন নি তো? দাঁড়ান দেখছি অবস্থা। শুনেছি সিটের অবস্থা বেশ টাইট (কোন অর্থে তা বোঝা গেল না।)। পরদিন তিনি ফোন করে বললেন, কী কাণ্ড জানেন? আপনাকে অফলোড করেই আপনার বন্ধু ফজলুল হকের সিট কনফার্ম করা হয়েছে। এখন আর একজনকে অফলোড করে আপনাকে সিট দিতে হবে । বলেছি আর্জেন্ট, হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার একান্ত সচিব কী করছিল? সে এটা দেখবে না? তাকে জিজ্ঞেস করুন তো এমন বোকামি করল কেন? আমি বললাম, জিজ্ঞেস করা যাবে না। সিভিল এভিয়েশন সচিব অবাক হয়ে বললেন, কেন? জিজ্ঞেস করা যাবে না কেন? আমি বললাম, তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এবারে চূড়ান্তভাবেই বরখাস্ত, মানে বদলি। একান্ত সচিবের পদ এখন শূন্য। তারপর বললাম, দেখবেন– অসুস্থ, বৃদ্ধ, অনাথ শিশু, অথবা অন্য কোনো সচিব অফলোড করে আমাকে সিট দিতে বলবেন না। বিবেকের দংশনে আমেরিকা যাত্রার আনন্দই মাঠে মারা যাবে। সিটের ওপর বসে ছটফট করব। মনে হবে অন্যের আসন দখল করে বসে আছি। আর কোনো মন্ত্রীকে অফলোড করা হলে তো কথাই নেই– খালাস। চাকরিটা যাবে নির্ঘাত। এভিয়েশন সচিব অভিজ্ঞের মত হেসে বলেন, তেমন যদি হয়ই তাহলে আপনিই একমাত্র যাত্রী হবেন না, যিনি এভাবে সিট পেলেন। বুঝলাম অফলোড করতে করতে বেচারা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, বিকল্পের কথা ভাবতেই পারেন না। থাক, যাকেই অফলোড করুক, আমাকে না বললেই হলো। যাবার আগের দিন এভিয়েশন সচিব বললেন,আপনি কনফার্মড। কাউকে অফলোড করতে হয় নি। একেবারে নিষ্কণ্টক আসন। আন্এমকামবারড, ডিআইটির জমির মতো। নিশ্চিন্তে যেতে পারবেন। হ্যাভ এ গুড ট্রিপ।

চার॥

প্লেন আকাশে ওঠার পর ফজলুর দিকে তাকিয়ে বললাম, যাক শেষ পর্যন্ত দু'বন্ধু এক সঙ্গে যেতে পারছি। কনফার্মেশন নিয়ে যা ঝামেলা হলো। অফলোড, আপলোড। যাত্রী নয়, যেন মালামাল। ভালো ভাষা ব্যবহার করতে পারে না এরা? ফজলু কোনো উত্তর দেয় না। সে সিলিং এর দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ফুর্তির মেজাজে বললাম, খুব চমৎকার। দুই বন্ধুর একসঙ্গে আমেরিকা যাত্রা। কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে। একটুও একঘেয়ে মনে হবে না। ফজলু তখনো নিরুত্তর। তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি সে চোখ বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে। লোকে মাথা নিচু করে ঘুমায়– দেখে এসেছি এতদিন। এই প্রথম আকাশের দিকে মানে সিলিং এর দিকে তাকিয়ে কাউকে ঘুমাতে দেখলাম। ফজলু কি সিভিল এভিয়েশনের কোনো অলিখিত আইন অনুসরণ করে এই ভঙ্গিতে ঘুমুচ্ছে অথবা মাধ্যাকর্ষণ দুর্বল হয়ে আসায় তার প্রতি তাচ্ছিল্য জানাচ্ছে? একসঙ্গে গল্প করতে করতে আমেরিকা যাবার কথা সেই-ই প্রথম বলেছিল। সূচনাটা আশাব্যঞ্জক মনে হচ্ছে না।

দিল্লিতে প্লেন অবতরণের সময় ফজলু চোখ খুলে বলল, এসে গেল? এত তাড়াতাড়ি? আমি বললাম, এটা দিল্লি। এখানে দু'ঘণ্টা থামতে হবে। বাইরে যেতে দেবে না। প্লেনেই বসে থাকার কথা বলল এয়ার হোস্টেস্। তারপর বললাম, তুই ঢাকা থেকেই

ঘুমাচ্ছিস। ডিনার মিস করলি। ফজলু অবাক হয়ে বলল, রাত সাড়ে বারটায় ডিনার দিলো? পাগল নাকি এরা? আমি বললাম, প্লেনের যাবার সময় ঠিক রাখতে পারে না, কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে দেখছি খুব মেনে চলে। সবদিকেই ভাবমূর্তি খারাপ হলে তো চলে না।

প্লেন দু'ঘন্টা না, তিন ঘন্টা টারমাকে বসে থাকল। লুফতহানসার ফ্লাইট দেরি হবার জন্য আমরা আটকে থাকলাম। আমি ইকোনোমিস্ট পত্রিকায় চোখ বুলোতে থাকি। ফজলু আবার ঊর্ধ্বনেত্রে সিলিং দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে। তার এই ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে কিনা বুঝতে পারি না। বেশ কিছুদিন থেকে নামাজ পড়তে পড়তে কপালে কালো দাগ পড়েছে তার। কে জানে, হয়তো একই সঙ্গে ঘুম এবং মেডিটেশনের একটা পদ্ধতি বার করে ফেলেছে সে। আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে সেই একমাত্র এন্টারপ্রেনিউর বলতে যা বোঝায় তাই। এন্টারপ্রেনিউরশিপ কখন কোনদিকে মোড় নেয় কিছুই বলা যায় না বলে শুনেছি। ইহজাগতিক আর পারলৌকিকের ভেদরেখা অস্পষ্ট করে ফেলে।

প্লেন দিল্লি ত্যাগের পর হোস্টেস স্ন্যাক্স নিয়ে এসে হাজির। ফজলুকে ঠেলে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললাম, স্ন্যাক্স নিয়ে এসেছে। খাবি নে? ডিনার তো মিস করলি। ফজলু বিরক্তির সঙ্গে স্ন্যাক্সের ট্রের দিকে তাকিয়ে বলল, এরা কি ভেবেছে আমরা খাবার জন্য বিদেশ যাত্রা করছি? এত খাওয়াচ্ছে কেন? বলে সে আবার সিলিং এর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজল।

অনেক রাতে ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙে গেল। হোস্টেসকে কম্বল দিতে বললাম। হোস্টেস বলল কম্বল নেই। শুনে ফজলু চোখ খুলে বাজখাঁই গলায় বলল, কম্বল নেই কেন? যা দরকার তাই-ই নেই। খালি খাওয়ান যখন-তখন। এদিকে ঠাণ্ডায় শরীরের অবস্থা কাহিল। হোস্টেস বলল, কী করব স্যার। প্যাসেঞ্জাররা ঢুকেই এক একজন দু'তিনটা করে কম্বল নিয়ে ফেলেন। তাই কম্বল নেই। শুনে ফজলু বলল, এরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাকি? রিলিফের কম্বল মনে করে হাতিয়ে নিচ্ছে! তারপর সে ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, গরম কফি দেন। কফি খেয়েই শরীর গরম রাখতে হবে। এরপর বিমানে জার্নি করলে নিজের কম্বল নিয়ে উঠব। শুনে হোস্টেস হাসি চাপতে চাপতে চলে গেল। ভোরবেলায় প্লেন যখন বুলগেরিয়ার ওপর দিয়ে যাচ্ছে বলে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন, ঠিক তখনই হোস্টেস কর্নফ্লেক্স, দুধ আর চিনি নিয়ে হাজির। বুলগেরিয়ার উপর দিয়ে যাবার সময় এটা রেগুলেশন মিল কিনা বোঝা গেল না। ফজলু সেদিকে তাকিয়ে বলল, ডিম কোথায়? ডিম?

হোস্টেস বলল, কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট স্যার। কর্নফ্লেক্স, টোস্ট, জ্যাম, জেলি, বাটার, কফি। নো এগ।

ফজলু মুখ প্রায় ভেংচে বলল, নো এগ? আমরা কি কন্টিনেন্টাল? বাঙালি। ডিম ছাড়া ব্রেকফাস্ট হয়? যান ডিম নিয়ে আসেন।

হোস্টেস বলে, স্যার প্লেনে ডিম নেই।

ফজলু রেগে গিয়ে বলে, আপনাদের কম্বল নেই, ডিম নেই। আপনাদের আছে কী?

আমি বললাম, আমরা এখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। ইইউ এখন নানা ক্ষেত্রে হারমোনাইজেশানের জন্য নিয়ম-কানুন তৈরি করেছে। মনে হচ্ছে কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট দেওয়ার পেছনে সেটা একটা কারণ। ফজলু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ডিম না দিয়ে মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে। তুই অযথা রসিকতা করে মেজাজ আরও খারাপ করে দিস না।

একটু পর প্লেনের অবতরণ শুরু হলো। নিচে সবুজ মাঠ, ছবির মত সাদা রঙ বাড়ি, মসৃণ রাস্তা খুব কাছে এসে গেল। মাঝে মাঝে খামার বাড়ি, নাতিদীর্ঘ গাছের অরণ্য, পাশে টলটলে পানি নিয়ে হ্রদ আকাশের দিকে তাকিয়ে। প্লেন নামল মসৃন গতিতে রানওয়ে দিয়ে, একটুও ধাক্কা না খেয়ে। তারপর ট্যাক্সি করে যেতে থাকল টার্মিনাল বিল্ডিং এর দিকে। ফজলু বলল, নিউইয়র্ক এসে গেল? আমি বললাম, না। ব্রাসেলস। এখানে এক ঘন্টার বিরতি। টার্মিনালে ঢুকে বাঁয়ের এস্কেলেটর দিয়ে ওপরে উঠতে যাব, এমন সময় পাশের দেয়ালে একটা বড় তৈলচিত্রের দিকে চোখে পড়ল। আবক্ষ পোর্ট্রেট, পরিচিত মনে হলো। নিচে নামটা পড়তেই চোখ উজ্জ্বল হলো, বুকের ভেতর শুনলাম স্মৃতি জাগানিয়া অনুভব। আতোয়াঁ দা সাঁ জুপেরী, ফরাসি-বেলজিয়ান বেসামরিক বৈমানিক। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সিঙ্গল ইঞ্জিন প্লেন চালিয়ে ভূ-মধ্যসাগর পার হয়ে উত্তর আফ্রিকায় ডাক হরকরার কাজ করতেন। যুদ্ধের সময় খুব ঝুঁকিপূর্ণ ছিল সেই কাজ। একদিন ডাক ভর্তি করে প্লেন নিয়ে আকাশে উঠেই তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। বৈমানিক হিসেবে সাহস এবং কর্তব্যনিষ্ঠার জন্যই শুধু সাঁ জুপেরী বিখ্যাত হন নি। তার খ্যাতি এসেছে লেখার জন্য। সংখ্যায় খুব বেশি নয়, কিন্তু যে ক'টি বই লিখেছেন তার জন্যই এখনো তিনি বিশ্বব্যাপী পাঠকদের কাছে জনপ্রিয়। কিশোরদের জন্য লেখা 'দি লিটল প্রিন্স' একটা এলেগবি এবং বড়দের জন্যও আকর্ষণীয় পাঠ। তার আকাশে উড়া এবং গন্তব্যে যাবার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'দি উইন্ড, স্যান্ড এ্যান্ড দি স্টার' এবং 'নাইট ফ্লাইট' অনবদ্য সাহিত্য কর্ম। এই দুটি বইতে যা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা তার মানবতাবাদ। 'দি উইন্ড, স্যান্ড এ্যান্ড দি স্টার' বইয়ের এক জায়গায় তাকে দেখা যাচ্ছে ট্রেনে ইউরোপের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন, থার্ড ক্লাস কমপার্টমেন্টে গাদাগাদি করে বসে থাকা গরিব উত্তর আফ্রিকান নর-নারী আর শিশুদের দেখে তিনি লিখেছেন: 'এইসব শিশুদের দেখে দারিদ্র্যের জন্য তাদের দুঃখ-কষ্ট আমাকে যত না কষ্ট দেয় তার চেয়েও বেশি পীড়িত করে এই ভাবনা যে, এদের মধ্যে কেউ মোৎসার্ট হতে পারত, কিন্তু সেই সম্ভাবনার টুটি চেপে মেরে ফেলা হয়েছে।'

সিঁড়ির গোড়াতে এক জাপানি যাত্রী গ্রাউন্ড স্টাফ মেয়েটিকে দেখে বলল, আমি বেলজিয়ামে যাব। আই ওয়ান্ট টু গো টু বেলজিয়াম। মেয়েটি হেসে বলল, ইউ আর ইন বেলজিয়াম। দিস ইজ দি ক্যাপিটাল অফ বেলজিয়াম। বেচারা! প্রথম বিদেশে এসেছে। শুধু তাই না, কোন ফ্লাইট কোথায় থামছে সে খবরও রাখে না। সেও কি ফজলুর মতো ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে চোখ এবং কান বুজে বসে থাকে অথবা ঘুমায়? আমরা এস্কেলেটর দিয়ে উপরে উঠছি তো উঠছিই। ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে আমাদের যাবার সময় বের হতে হবে Exit-B-10 গেট দিয়ে। ফজলু বলল, মনে হলে উঠতে না উঠতেই বরাদ্দ করা এক ঘন্টা শেষ হয়ে যাবে আর আমাদের দৌড়াতে হবে B-10 গেটের দিকে। আমি উঠতে উঠতে সাঁ জুপেরীর তৈলচিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন এই আকাশপ্রেমী

মানবতাবাদী মানুষটি? সান্ত্বনার বিষয়, তাঁকে ভুলে যায় নি পরবর্তী প্রজন্ম– স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছে। অবশ্যই দুঃসাহসিক বৈমানিক হিসেবে, কেননা তৈলচিত্রটি ঝুলছে এয়ারপোর্টের দেয়ালে, কোনো সাহিত্য একাডেমিতে নয়।

ডিপারচার লাউঞ্জের সামনে গোল বৃত্তের মতো খোলা স্পেসের চারদিকে দোকান সাজানো। ফরেন এক্সচেঞ্জ আর বইয়ের দোকানের পাশে রেঁস্তোরা। স্যুভেনিরের দোকানে নানা দেশের পুতুল, মিনিয়েচার মনুমেন্ট, সচিত্র তোয়ালে, টেবিল ক্লথ, পেপারওয়েট, কলম, পেন্সিল, এইসব সাজানো। কিন্তু ডিউটি ফ্রি শপই আকারে বড়। সেখানে ওয়াইন, নানা ধরনের পানীয়, সিগারেট, চকোলেট, থরে থরে সাজানো। ক্রেতার ভিড় যথারীতি সেখানেই বেশি। হিসেব করলে দেখা যাবে তারা যা কিনছে তা ডিউটি ফ্রি হলেও প্রফিট ফ্রি নয়। তাই যত লাভবান হচ্ছে বলে মনে করছে আসলে তা নয় মোটেও। কনজিউমার সোসাইটির বৈশিষ্ট্যই হলো ক্রেতাদের কন্ডিশনড রিফ্লেক্স, অবচেতনে যা রয়েছে, (লাভ করা) একটু উস্কে দিলেই হলো। সব হিসেব-নিকেশ তখন জানালা দিয়ে নিচে উৎক্ষিপ্ত হয়।

ফজলুকে দেখলাম সে ওয়াইন, চকোলেট, সিগারেট এই সব কিনে ট্রলি ভরিয়ে ফেলেছে। সে যে শপাহোলিক তা জানা ছিল না। তাছাড়া ওয়াইন? ব্যাপার কী? কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করি, হজ করে এলে সেদিন। ওয়াইন কিনেছ দেখছি। বেহেস্তে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে চাও না বুঝি? ফজলু খুব তৃপ্তির সঙ্গে বলে, ওয়াইন জামশেদের বউ লেনরের জন্য।

আমি বললাম, লেনর তো মুসলমান হয়েছে শুনেছি। ওয়াইন খায়? মানে পান করে?

ফজলু বলল, খাবে না কেন? আমেরিকান না? আর না খেলে প্রতিবেশি কাউকে দিয়ে দেবে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুই কি কিনলি?

আমি হাতের মোটা বইটা দেখালাম। ডেনিস ডে লিলোর 'আন্ডারওয়ার্ল্ড'। ফজলু নাক সিঁটকে বলল, বাংলাদেশ থেকে ব্রাসেলসে এসে একটা বই কিনলি? তোর কি মাথা খারাপ? এত কিছু রয়েছে কেনার।

আমি বইটার দিকে তাকিয়ে বললাম, বইটি বেস্টসেলার লিস্টে ছিল। এসব বইতো সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় পাওয়া যায় না। তাই কিনে ফেললাম।

ফজলু খুব সন্তুষ্ট হলো বলে মনে হলো না। বলল, জামসেদ আর তার স্ত্রীর জন্য কিছু কিনবি না? তাদের বাড়ি থাকবি। সামাজিকতা রক্ষা, সৌজন্য দেখানো এসব কি ভুলে গেলি?

আমি তার হাতের দিকে দেখিয়ে বললাম, তুই যা কিনেছিস্ দুজনের বলে চালানো যাবে।

ফজলু বলল, বাজে বকিস না। কিছু না কিনিস, চকোলেট কিনে ফেল এক প্যাকেট।

অগত্যা কি আর করা, দোকানে গিয়ে লিন্ড চকোলেটের দুই প্যাকেট কিনে নিয়ে হাতে বেরিয়ে এসে ক্যাশ মেমো ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেললাম। সেলসগার্ল দেখে হেসে বলল, তোমার দেশে এভাবেই বুঝি ময়লা ফেলো?

শুনে লজ্জা পেলাম। তুলে নিয়ে বললাম, সরি। মেয়েটা খুশি হয়ে বলল, ইউ আর ওয়েলকাম।

মানে? আই এ্যাম ওয়েলকাম টু বি সরি?

কারেন্সি এক্সচেঞ্জের কাঁচ ঘেরা কিওস্কের দুদিকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে যাত্রীরা। এক পাশের ক্যাশিয়ার মেয়েটিকে বলতে শোনা গেল, ডলার টু ডলার দিতে পারবে না। ইউরো নিতে হবে। অন্যদিকে যে লাইন তার কাছের কাউন্টারে মেয়েটি বলছে, বিশ ডলারের চেঞ্জ দিতে পারি। পঞ্চাশ ডলারের চেঞ্জ নেই। অবাক হলাম শুনে, একই কিওস্কের দুই দিকে দুই আইন। অথবা একই আইনের দুই ব্যাখ্যা। অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই কেননা ব্রাসেলস পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যুরোক্রেসির হেড অফিস। ইউরোপিয়ান কমিশন নিয়ে যত সমালোচনা তার কেন্দ্রে রয়েছে নিয়ন্ত্রণ আর লালফিতার দৌরাত্ম্য। তার অনুষঙ্গ হিসেবে যুক্ত হয়েছে বিভ্রান্তিকর নিয়ম-কানুন। মেয়ে দুটি নিশ্চয়ই ভিন্ন ক্লাসে প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

দু'জনে ডিপারচারের জন্য এক্সিট গেট B-10 দিকে গিয়ে দেখি সেখানে বিমানের যাত্রীরা বেশ জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে, লাইন বলে কিছু নেই। সামনের বেঞ্চে সাদা-কালো দাঁড়ি নিয়ে বসে আছে সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী। জিজ্ঞেস করে জানলাম তিনিও উত্তর আমেরিকা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে যাচ্ছেন। তিনি আরও জানালেন যে, সম্মেলনে যোগ দিতে কবি আল মাহমুদও যাচ্ছেন। 'ঠিকানা' পত্রিকায় এদের দু'জনের নাম দেখি নি। যাদের নাম ছাপা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. আশরাফ সিদ্দিকী, সমরেশ মজুমদার, ফেরদৌসি রহমান, ফকির আলমগীর, কনকচাঁপা, লীনা তাপসী এবং ইমদাদুল হক মিলন। মোজাম্মেল হক মিন্টুর দেয়া 'ঠিকানা' পত্রিকা ঢাকাতেই পেয়েছিলাম। মনে হয় সেখানে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ ছিল না। হাজার হোক দৈনিক পত্রিকা, তথ্য পরিবেশে ত্রুটি থাকাই সম্ভব। গিয়াস কামালকে শেষ দেখি লন্ডনে, তিনি তখন সেখানে ইকোনোমিক মিনিস্টার। নিয়োগটা বেখাপ্পা ছিল, কেননা সাংবাদিক হিসেবে তাঁর প্রেস মিনিস্টারই হবার কথা। কিন্তু এই পদটিতে তখন অন্য একজন স্থলাভিষিক্ত। অথচ গিয়াস কামাল চৌধুরী-কে তার অসুস্থতার জন্য লন্ডন দূতাবাসে নিয়োগ দিয়ে চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে হয়। এমন বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া তিনিই প্রথম নন এবং শেষ ব্যক্তিও হবেন না তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ব্রাসেলস্ ছাড়ার পর বিমান প্রয়োজনীয় উচ্চতায় উঠে যাবার পর হোস্টেস স্ন্যাক্স নিয়ে এলো। ফজলু বলল, এটাই লাঞ্চ? বিরিয়ানি দেবে না? গন্ধ পাচ্ছি। আমি বললাম, ঐ গন্ধ গতরাতের ডিনারে যে বিরিয়ানি দিয়েছিল তার। মনে হচ্ছে লাঞ্চে এর বেশি জুটবে না, খেয়ে নাও– বলে আমি খাওয়া শেষ করে ডেনিস ডে লিলোর বই খুলে বসি। সাড়ে আটশ পৃষ্ঠা একটানা পড়ে শেষ করার উপায় নেই। তবে আটলান্টিক পাড়ি দিতে দিতে বেশ সময় পাওয়া যাবে। ফজলু যদিও বলেছে দু'বন্ধু গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে, এই পথ পর্যন্ত তার গল্প করার যে নমুনা দেখলাম তাতে একা একা বই পড়েই সময় কাটানো উত্তম হবে। যা ভেবেছি, ঠিক তাই। দেখি ফজলু স্ন্যাক্স শেষ করে উর্ধ্বনেত্র হয়ে চোখ বুজে ঘুমোতে যাচ্ছে বা ঘুমোতে শুরু করেছে। দু'বন্ধু গল্প করতে করতে যাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই বাকি পথটুকুতেও। তা নাই হলো। পাশে তো আছে–

সশরীরে এবং জ্যান্ত। এটাই বা কম কি? সান্নিধ্যের কত রকম ফের আছে।

একটু পর ক্যাপ্টেনের ঘোষণা শোনা গেল। নতুন ক্যাপ্টেন এবং কেবিন ক্রু এখন এই ফ্লাইটে। যথারীতি অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি ফ্লাইট-পথ বর্ণনা করলেন ধীর উচ্চারণ, প্রায় মন্ত্রপাঠের মত। শুনতে বেশ লাগে। রোমাঞ্চ এসে যায়, মনে হয় প্লেন না, ক্যাপ্টেন না, যাত্রী হিসেবে নিজেই যেন বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার, যেন আমি নিজেই নিজের দক্ষতায়, কৌশলে উড়ে চলেছি। আমাদের প্লেন উড়ে যাবে আয়ারল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড এবং শেষে কানাডার উপকূল হয়ে নিউইয়র্কে। আটলান্টিকের উল্লেখ নেই। তাকে এড়িয়ে ভূখণ্ড ঘেঁষেঘেঁষেই যাবে বিমানের ফ্লাইট ০০৯, সব প্লেনই তাই করে– ইমারজেন্সি ল্যান্ডিং এর সুবিধার জন্য। আটলান্টিকের ওপর দিয়ে উড়ে গেলে দূরত্ব কমে, কিন্তু আপৎকালীন সময়ে ভরসা কম, পানি পতিত প্লেনকে স্বাগত জানাবার জন্য অপেক্ষা করে না।

ফজলু হঠাৎ চোখ খুলে বলল, কিরে কানাডায় যাচ্ছে বলল। ভুল প্লেনে উঠলাম নাকি? আমি জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে বললাম, কানাডার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে– সে কথা বলল। ফজলু শুনে বলল, কে জানতে চায় কোন দেশের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে। ভূগোলের ক্লাসে বসেছি? অযথা। ফজলু অসন্তুষ্ট হয়ে একটা কথা সব সময় বলে– অযথা। ভূখণ্ডের পাশ ঘেঁষে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে তাকে শোনাতে সে শংকিত হয়ে সিলিং, ফ্লোর, দুপাশ এবং সামনের দিকে যতদূর চোখ যায় সব দেখে উদ্বিগ্ন স্বরে বলে, প্লেনটা খারাপ নাকি? ক্রটিপূর্ণ? ইমারজেন্সি ল্যান্ডিং এর কথা ভাবছে কেন? আমি বললাম, স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর। সব প্লেনই এমন করে উড়ে সমুদ্র এলে। শুনে ফজলু কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে চোখ বুজলো। কিছুপর হোস্টেসের কাছে পানি চেয়ে পানি দেওয়ার পর চোখ বুজেই পানি খেয়ে সে গ্লাস ফেরত দিলো। হোস্টেস অবাক হয়ে বলল, তিনি কি অসুস্থ? আমি স্বর নামিয়ে বললাম, একটা কানে অপারেশন করেছে। কম শুনতে পায়। হোস্টেস চলে গেলে ফজলু বলল, মেয়েটা কি বলল, তুই কি বললি আমি শুনতে পেয়েছি। মনে হচ্ছে সিঙ্গাপুরের ডাক্তার ভালভাবেই অপারেশন করেছে। ষোলশ ডলার খরচ করে আমেরিকা যাচ্ছি এই কান দেখাতে? অযথা।

চার॥

ফজলু চোখ বুজে যথারীতি উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘুমুচ্ছে, না ঘুমের চেষ্টা করছে বোঝা যায় না। আমি ডেনিস ডে লিলোর *আন্ডারওয়ার্ল্ড* পড়তে থাকি। কাহিনির শুরু নিউইয়র্কে বেজ বল খেলা দিয়ে। ডজারস্ আর ইয়াঙ্কিদের মধ্যে খেলা শুরু হয়েছে। কয়েকটি ছেলে টিকিট না কেটে দৌড়ে বেড়া ডিঙ্গিয়ে স্টেডিয়ামে ঢুকেছে। প্রধান চরিত্রের সলিলকি বা মনোজাগতিক বর্ণনার কৌশল গ্রহণ করেছেন লেখক। স্টেডিয়ামে অন্যদের মধ্যে সাবেক প্রেসিডেন্ট হাবার্ট হুভার, ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা এইসব সুপরিচিত চরিত্রকে দর্শকের আসনে উপবিষ্ট দেখা যায়। হাভার্ট হুভারের হাতে এসে পড়ে একটা কাগজ, যেখানে শিল্পী ব্রুগেলের 'দা ট্রায়াম্ফ অফ ডেনের' ছবিতে কঙ্কাল হেঁটে যাচ্ছে, বসে আছে। এভাবে একটা সুররিয়েল আবহ সৃষ্টি হয়েছে, সেই সঙ্গে মেটাফরের ব্যবহারও স্পষ্ট। শুরুতেই উপন্যাসটির উত্তর-আধুনিক চরিত্রের আভাস দিয়ে দেন লেখক। যে অনবদ্য গদ্যের জন্য ডে লিলোর খ্যাতি, তার উদাহরণ এখানে পাতায় পাতায়। প্রথম অধ্যায়ের পর ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ডে ভবিষ্যতে নিয়ে পাঠককে বলা হলো যে, প্রথম দৃশ্যের কিশোরদের মধ্যে একজন বিয়ে করে স্ত্রী এবং মাকে নিয়ে থাকছে। এরপরের অধ্যায়ে আবার ফ্লাশব্যাকে অতীতে গিয়ে কৈশোরের কাহিনির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। ন্যারেটিভ এইভাবে সামনে পেছনে এগুতে থাকে, একের পর এক অধ্যায়ে। অতীতের কথা আছে, কিন্তু মূল লক্ষ্য সমকালের আমেরিকা। আমেরিকা যাবার সময় এমন একটা উপন্যাসই তো পড়া সমীচীন। দুই মলাটের ভেতর অনেক কিছু জানা যায়। আর লেখক যদি হয় ডেনিস ডে লিলোর মত প্রথম সারির একজন, তাহলে পড়ার আকর্ষণ আরও বাড়ে। কাকতালীয়ভাবে কেনা হলেও বইটি গাইডেরও কাজ করবে।

হোস্টেস স্ন্যাক্‌স নিয়ে এলো। ফজলুকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললাম, লাঞ্চের দ্বিতীয় কিস্তি মনে হচ্ছে। ফজলু মুখে বিরক্তি এনে বলল, অযথা কাঁটাচামচ নষ্ট করছে। কে খাবে এ সব? বিরিয়ানি হলে কথা ছিল। বলে সে গভীর শ্বাস নিলো। বিরিয়ানির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না এখন। তারপর আমার হাতের বই দেখে বলল, আ বাপ!। এত মোটা। প্লেনের ওজন বাড়িয়ে ফেললি দেখছি। আমি বললাম, এটা রিজনেবল এমাউন্ট অফ রিডিং ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে পড়ে। আপত্তি করে নি দেখে। ফজলু বলল, সবাই অমন সাইজের একটা করে বই নিয়ে প্লেনে উঠলে কি রিজনেবল এমাউন্ট থাকত?

আমি বললাম, না। কিন্তু সবাই বই নিয়ে প্লেনে ওঠে না।

ফজলু বলল, বইয়ের বিষয়টা কী, পড়ে বলে দিস্। আমার অত বড় বই পড়ার ধৈর্য নেই। তারপর পিঠের কাছে বালিশ ঠিক করে নিতে নিতে বলল, তোর আর বালিশ লাগবে না। ঐ বইতেই চলবে।

প্লেন কানাডার উপকূলে এসে গেলে হোস্টেস ট্রলি ঠেলে খাবার নিয়ে এল। এবার আর স্ন্যাক্‌স না। ভাত, মুরগি, গরুর মাংস। ফজলু চোখ খুলে বলল, আবার খাওয়া? এত খাওয়াচ্ছে কেন? মোটা-তাজা করতে চায়? তারপর খাবারের দিকে তাকিয়ে বলল, খাওয়া যায়। দেশি খাবার মনে হচ্ছে। স্ন্যাক্‌স না দিয়ে আগে এটা দিলেই তো পারতো। অযথা সময় নষ্ট করে। আয় খাওয়া যাক। তারপর ন্যাপকিন খুলতে খুলতে বলল, এটাকে কী নাম দিয়েছে? লাঞ্চ, স্ন্যাক্‌স না ডিনার? আমি বললাম, মনে হচ্ছে ডিনার। বাংলাদেশ টাইম ফলো করছে। সেখানে এখন রাত হবে বোধ করি। ফজলু বাইরে তাকিয়ে বলে, এখানে এখনো দিন। সবকিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পেট সামলাতে পারলে হয়।

আমি খেতে খেতে বাইরে তাকাই। চমৎকার উজ্জ্বল রোদ। আকাশ ধোয়া-মোছা, ঝকঝক করছে। নীল রঙে মসৃণপেলবতা। মাঝে মাঝে সাদা মেঘ ধূয়োর মত উড়ে যাচ্ছে। প্রায় আঠারো ঘণ্টা আমরা প্লেনে যাত্রা করছি, কিন্তু দিন ফুরায় না। মজার ব্যাপার– ক্লান্তিও লাগে না। আমেরিকা যাওয়ার সময় এই যাত্রাটা বেশ আরামপ্রদ। স্নায়ুর ওপর চাপ দেয় না। বেশ একটা ফুর্তির মেজাজে সময় কাটানো যায়। গন্ডগোল বাধে ফেরার সময়। তখন সময়ের যে পরিবর্তন সেটা ধাতস্থ হয় না। লন্ডনে পৌঁছেই অবস্থা কাহিল। ঢাকা নামতে হয় মুহ্যমানের মত, প্রাণশক্তি রহিত অবস্থায়। আমার সব সময় তাই হয়। অন্যদেরও নিশ্চয়ই একই অভিজ্ঞতা। শরীরের

কলকব্জা সবারই এক যখন।

খাওয়া শেষ হলো। যেন সঙ্কেত পেয়ে প্লেন নিচে নামতে শুরু করল। একটু পর সাদা মেঘের পর্দা সরিয়ে নিচে দেখা দিলো আটলান্টিকের নীল পানি, উপকূল রেখা, ঢেউয়ের ফেনা, বাড়িঘর, রাস্তা, গাড়ির লাইন। আমি বললাম, নিউইয়র্ক এসে গেল মনে হচ্ছে। ফজলু তার সিট সোজা করে নিয়ে কোমরে বেল্ট বাঁধল। বাঁধতে বাঁধতে বলল, দেখেছিস কাণ্ড। ভাত মাংস খাবার পরই পেট ফুলে উঠেছে। বেল্ট আগের মত বাধা যাচ্ছে না। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি। বিমানের ফ্লাইট ০০৯ খুব মসৃণ গতিতে অবতরণ করল, ঠিক ব্রাসেলসে যেমন করেছিল। টারমাকে ট্যাক্সি করে যেতে থাকল শব্দ করে, মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দিয়ে। ইউনাইটেড, জাপান এয়ারলাইন্স, কেএলমের? প্লেন দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজের কাছে। জেএফকের চেহারা দু বছর আগে যা দেখেছি কিছুই বদলায় নি। ভাগ্য ভালো, বিমান ফ্লাইটের যাত্রীদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করে নি, যা মাঝে মাঝেই করে থাকে বিভিন্ন এয়ারপোর্টে। ব্রিজ দিয়ে হেঁটে গেলাম আমরা তাপমাত্রায় কোনো পরিবর্তন অনুভব না করেই। কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ইমিগ্রেশন কাউন্টারের যে লাইনে দাঁড়ালাম, সেখানে আমাদের সামনে লম্বা দাঁড়িওয়ালা, আলখাল্লা পরা এক বাঙালি দাঁড়িয়ে। ইমিগ্রেশনের বিশালবপু (এদের প্রায় সবাই এমন আকারের হয়ে থাকে কেন কে জানে? ইনটিমিডেড করার জন্য? সাইকোলজিক্যালি উইক করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে?) লোকটি গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল, হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম টু আমেরিকা? লোকটি উত্তর দিল, আই এ্যাম এ রিলিজিয়স লিডার। ইমিগ্রেশনের লোকটি বলল, ইয়েস। বাট হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম? দাঁড়িওয়ালা লোকটি এবারও বলল, আই এ্যাম এ রিলিজিয়স লিডার। ইমিগ্রেশনের লোকটি পরামর্শের জন্য তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে গেল। আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম। ফজলু বিরক্ত হয়ে বলল, এই যে ভাই। কারণটা বললেই তো হতো। রিলিজিয়াস লিডার সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু কেন এসেছেন তা বলবেন না? জানেন তো এ দেশে ঢোকায় কত কড়াকড়ি। রিলিজিয়াস লিডার বললেই এরা সিল মেরে দেবে পাসপোর্টে? লোকটি বলল, আমি তবলীগ করতাম আইছি। হেইডা কইলে হ্যারা বুঝব? শুনে ফজলু নিজের মনে বলে, দুনিয়ায় কত ধরনের লোক। আমেরিকার লোকজন তবলিগের বক্তৃতা শুনতে বসে আছে? ওদের নিজেদেরই কত রিলিজিয়াস লিডার। প্রেসবাইটেরিয়ান, একিসপেলিয়ান, ব্যাপ্টিস্ট, মেথডিস্ট। আরও কত। তাদের ফেলে এর কথা শুনতে আসবে কে? অযথা।

ইমিগ্রেশন অফিসার ফিরে এসে হাসি মুখে দাঁড়িওয়ালার হাতে পাসপোর্ট দিয়ে বলল, অলরাইট। ইউ ক্যান গো। হ্যাভ এ নাইস টাইম। শুনে ফজলু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, ধর্মের ব্যাপারে এরা উদার। ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্যই তো ইউরোপ থেকে ইমিগ্র্যান্টরা এসেছিল এদেশে।

আমরা ইমিগ্রেশন পেরিয়ে লাগেজ নেবার জন্য কনভেয়ার বেল্টের পোর্টের দিকে যাই। সেখানে যাত্রীতে লোকারণ্য। উদ্বিগ্ন হয়ে বেল্টের দিকে তাকাচ্ছি, সেই সময় আইডি কার্ড বুকে ঝুলিয়ে এক বাঙালি যুবক ফজলুর কাছে এসে বলল, আপনি নিশ্চয়ই সচিব সাহেব। আপনাকে নিতে এসেছি। ফজুলর শরীরের জন্য বেশ হোমড়া-চোমড়া দেখায়। প্রটোকলের যুবকটি বিনা দ্বিধায় তাকেই আমার স্থলাভিষিক্ত করেছে। ফজলু বিব্রত হয়ে বলল, না, না। আমি না। ঐ যে সচিব সাহেব। আমি তার সঙ্গে এসেছি। ছেলেটি অপ্রস্তুত হয়ে আমাদের সঙ্গে লাগেজ খুঁজতে থাকে। ফজলু বলে, আপনারা খোঁজেন। হাই আমার সুটকেস চেনে। আমি বাইরে গিয়ে দেখে আসি জামশেদ এসেছে কিনা। প্রটোকল অফিসার বলে, আপনার সুটকেস আপনাকেই সনাক্ত করতে হবে কাস্টমসের সামনে। এরা খুব কড়া এ ব্যাপারে। ড্রাগ স্মাগলিং এর জন্য। বলতে না বলতে এক দশাসই শরীরের নিগ্রো দড়ি বাঁধা দুটো কুকুর নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকল। কুকুর দুটো ক্ষুধার্তের মত সুটকেস, ব্যাগেজ শুকছে আর লেজ নাড়ছে। ফজলু সেদিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে কিছু বলল। নিশ্চয়ই গুষ্ঠি উদ্ধার করছে– মাদক পাচারকারীদের, পুলিশের, না কুকুরের তা বোঝা গেল না।

কাস্টমস পেরিয়ে ট্রলিতে সুটকেস ঠেলে নিয়ে বসে বাইরে অপেক্ষমান লোকজনের ছোট-খাট ভিড়ের কাছে এসে জামশেদকে দেখা গেল না। প্রটোকল অফিসার ভিড়ের মধ্যে দেখতে দেখতে বলল, জামশেদ নামে একজন এখানেই ছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তারপর ভিড়ের ওপাশে বাইরে তাকিয়ে বলল, বাইরে আছেন। দেখা গেল জামশেদ বাইরে একটা কংক্রিট ব্লকের ওপর বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে খুব নিশ্চিন্তে সিগারেট খাচ্ছে। অন্য হাতে একটা পেপার ব্যাগ। ছাই ফেলার জন্য? সে একবারও ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখল না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রাস্তায় গাড়ি আসা-যাওয়ার দিকে, যেন আমরা ঐ পথ দিয়েই আসব। আমরা ট্রলি নিয়ে বাইরে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াতেও তার খেয়াল সম্বিত এলো না। ফজলু থাবার মত তার হাত জামশেদের কাঁধে রেখে উল-াসের সঙ্গে বলল, শালা। এই সম্ভাষ জামশেদকে আবিষ্কার করতে পারার জন্য, না আমেরিকায় পদার্পণ করার আনন্দে, তা বোঝা গেল না। ফজলু বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নিকট আত্মীয়তাসূচক ঐ সম্বোধন করে থাকে।

উৎসাহের আতিশয্যেই হোক অথবা সারপ্রাইজ দেবার জন্য, ফজলু তার সুটকেস ভর্তি ট্রলি বাইরে আনে নি। প্রাথমিক সম্বোধন ও কুশল বিনিময়ের পর সে যখন আবার ভেতরে যেতে চাইলো, গেটের গার্ড বলল, নো। তুমি বাইরে বেরিয়ে এসেছ। এই গেট দিয়ে যেতে পারবে না। ঘুরে অন্য গেট দিয়ে যেতে হবে। শুনে ফজলু ভ্রুকুটির সঙ্গে তাকিয়ে থেকে হাঁটতে যাবে, এই সময় প্রটোকল অফিসার বলল, আপনারা এখানে থাকুন। আমি নিয়ে আসছি। ফজলু জামশেদের পাশে বসে সিগারেট ধরিয়ে রাস্তায় গাড়ি আসা-যাওয়া দেখতে থাকল। একটু পর একটা গাড়ি এসে থামল সামনে! ভেতর থেকে ক্রাচ নিয়ে নামলো গৃহিণী ধরনের একজন, এক হাতে ক্রাচের ওপর ভর করে। সামনে এসে বলল, এ্যাম আই লেট? জামশেদ বলল, নো। দে জাস্ট এরাইভড। তারপর ফজলু আর আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বলল, মিট মাই ওয়াইফ, লেনর। ফজলু ক্রাচের দিকে তাকিয়ে বলল, হোয়াট হ্যাপেনড? লেনর জানালো, সিঁড়ি থেকে পড়ে ক'দিন আগে পা ভেঙে ফেলেছে। আমি ফজলুকে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, নোটিশ দিচ্ছে যেন ওদের বাড়িতে বেশি দিন না থাকি। ফজলু বলল, আরে না। বলেছি না, এদের দুটো ঘর খালি, বিড়াল শুয়ে থাকে।

লেনর খোঁড়া পায়ে ক্রাচ নিয়ে কী করে গাড়ি চালিয়ে এলো, এটা যখন ভাবছি, সাদা গাড়িটা সাময়িক পার্কিং এ রেখে বেরিয়ে এল খর্বকায় ধূসর রঙের এক তরুণ যাকে অনায়াসেই বাঙালি বলে সনাক্ত করা যায়। কাছে এলে জামশেদ পরিচয় করিয়ে দিল, তার ভাইয়ের ছেলে রেজা, তাকে সে আমেরিকায় এনে সিটিজেনশিপ করে দিয়েছে এবং পরে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। রেজা একটু বেশি বয়সে (দশ কি বারো) এদেশে এলেও এখন টিপিক্যাল মার্কিনি উচ্চারণে কথা বলে। চাল-চলনেও এ দেশীয় ভাব। সে এসেই তাড়াতাড়ি আমাদের সুটকেস, ব্যাগেজ ইত্যাদি গাড়ির বুটে তুলে নিতে থাকল। আমরা তাকে সাহায্য করলাম। বইয়ের প্যাকেট ছিল কয়েকটা। আমার লেখা বই। জামশেদের পরামর্শে আনা। সে বলেছিল যে, সাহিত্য, সংস্কৃতি উৎসব উপলক্ষে একটা বইমেলাও হয়, সেখানে বাংলা বই বিক্রি হয়। আমি বই আনলে আমারগুলোও বিক্রি হবে। বই বিক্রির ব্যাপারে আমার আস্থা বা উৎসাহ কোনটাই ছিল না। তবু ফজলুর উৎসাহে শেষ পর্যন্ত এনেছি। জামশেদ দেখে বলল, মাত্র এই কটা? আরও আনলে পারতেন। এখানে বাংলা বইয়ের খুব চাহিদা। আমি বললাম, বেস্ট সেলার লেখক নই আমি। লাইন দিয়ে আমার বই কিনতে আসবে না ক্রেতারা। জামশেদ সন্তুষ্ট হলো না শুনে। সে একটা তেল কোম্পানিতে বিক্রয় বিভাগে কাজ করে অবসর নিয়েছে। তার মধ্যে সেলসম্যানশিপের চরিত্রগুণ এখনো বজায় রয়েছে, সেটা বোঝা গেল। প্রোডাক্ট গুণে যাই হোক, সেলস পিচ দিয়ে যে কোনো মাল খরিদ্দারের হাতে তুলে দেওয়া যায়, বোধ করি এই বিশ্বাস তার এখনো অটুট।

রেজা তার মা লেনরকে নিয়ে চলে গেল সাময়িক পার্কিং রুটে ট্রাফিক পুলিশের হামলা হওয়ার আগে। হামলাটা হয় খুব ভদ্র এবং সূক্ষ্মভাবে। ট্রাফিক ওয়ার্ডেন (প্রায়ই বিশালবপু কৃষ্ণাঙ্গী) বেড়াতে বেড়াতে এসে উইন্ডশিল্ডের ওয়াইপারের নিচে রেখে যায় ট্রাফিক টিকিট। অর্থাৎ জরিমানার নোটিশ। একবার টিকিট পেয়ে গেলে সেটা আর প্রত্যাহার করানোর উপায় নেই। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক টিকিট পেলে একজন ড্রাইভার তার গাড়ি চালানোর লাইসেন্স হারায়। এটা মস্ত বড় শাস্তি, কেননা এ দেশে যত্র-তত্র ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখিয়ে অনেক সমস্যা পার হওয়া যায়। এর প্রমাণ একটু পরই আমরা পেলাম।

জামশেদ আমাদের নিয়ে মূল পার্কিং লটে চলল। সেখানে তার গাড়ি রাখা আছে। আমরা ধীরে-সুস্থে সেখানে গিয়ে গাড়িতে ওঠার পর জামশেদ বলল, সর্বনাশ। ফজলু বলল, কী হলো? জামশেদ বলল, পার্কিং লটের টিকিট সাদা গাড়িতে ছেলের কাছে রয়ে গিয়েছে। রেজা সেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে। এখন মহা-বিপদে পড়া গেল দেখছি। জামশেদ চিন্তিত মুখে গাড়ি চালিয়ে নিগর্মন পথে চেক-পোস্ট বক্সের কাছে এলে এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক টিকিট কালেক্টর তার কাছে টিকিট চাইলো। জামশেদ সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ যে সাদা গাড়ি চলে গেল কিছুক্ষণ আগে, তার ভেতর রয়ে গেছে। কৃষ্ণাঙ্গদের রসিকতা জ্ঞান প্রবাদপ্রতিম। সে হেসে বলল, একটু আগে অনেক সাদা গাড়ি গিয়েছে। তোমারটা চেনার উপায় আছে? তাছাড়া চিনলেই বা কি, টিকিট তো দেখাতে দেখাতে যায় নি। জামশেদ বলল, আমার কাছে টিকিট নেই। বুঝতেই পারছো, টিকিট কেটেই ঢুকেছি। যুবকটি পেছনে জমতে থাকা গাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখাও। জামশেদ তাড়াতাড়ি গাড়ির গে-াব কমপার্টমেন্ট থেকে লাইসেন্স বার করে দেখাল। যুবকটি দেখে দ্রুত কিছু লিখে নিল তার নোট বইতে। হয়ত রিপোর্ট করবে অথবা পরে নোটিশ দেবে টিকিট নিয়ে এসে জমা দেওয়ার জন্য। যাই হোক, আটকে রেখে অথবা জরিমানা করে সমস্যার সৃষ্টি করল না দেখে খুশি হলো জামশেদ। কাঠের ব্যারিয়ার তোলা হয়েছে, জামশেদ গাড়ি বার করছে সেই সময় ব্যাকড্রাইভ করে রেজা গাড়ি কাছে নিয়ে এসে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে টিকিট দিলো জামশেদের হাতে। কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটি বলল, তোমার ছেলে যে ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ করে এতদূর ব্যাকড্রাইভ করে এলো এর জন্য সে একটা টিকিট পেতে পারে। অবশ্য সেটা আমার দেওয়ার কথা না, ট্রাফিক ওয়ার্ডেনের। তাকে দেখছি না। তোমার ছেলের ভাগ্য ভালো। ভবিষ্যতে সে যেন এমন না করে সে কথা বলে দাও। জামশেদ হেসে বলল, ভবিষ্যতে আমিই নিজের টিকিট হাতছাড়া করব না।

বেশ একটা ছোটখাটো এ্যাডভেঞ্চারের পর গাড়ি হাইওয়েতে এসে মসৃণ গতিতে অগ্রসর হলো। বাইরে সূর্যকরোজ্জ্বল বিকেল, উপরে সুনীল আকাশ। দুপাশে সিক্স লেন, রাস্তার পাশে সবুজ ঘাসে মোড়া অল্প ঢেউ খেলানো মাঠ, মাঝে মাঝে গাছপালা। ছড়ানো ছিটানো বাড়ি-ঘর। মনেই হয় না নিউইয়র্কে এসে পৌঁছেছি। স্কাই স্ক্র্যাপারের একটা চূড়াও দেখা যাচ্ছে না। তবে রাস্তায় গাড়ি যাচ্ছে শোঁ শোঁ করে, স্রোতের মত। নানা রঙ আর আকার সেই স্রোতের ভেতর। গাড়িতে বসে বাইরের দৃশ্য আর শরীরের ভেতর ছড়িয়ে পড়া গতির আবেগে ঢাকার রাস্তায় যাওয়া-আসার স্মৃতি এখন মনেই পড়তে চায় না। আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনে আমাদের মত নবাগতদের আবির্ভাবের জন্য কোনো ঢেউ ওঠে না, ছন্দপতনও ঘটে না। নির্বিকার হয়ে গ্রাস করে নেয়, যেমন করে বড় হাঙর ছোট ছোট মাছ মুখের ভেতর পুরে ফেলে। যারা আসে, যতদিনের জন্যই হোক, এদেশের বর্তমানের ধাবমান জীবনের গতির বেগে এবং ছন্দে পেছনের জীবনকে মনে করার সুযোগ পায় না, সময় থাকলেও। ইউরোপ তো বটেই, আমেরিকা তার বিরামহীন গতিময় জীবনের জন্য বর্তমানকে এত বেশি জাগ্রত করে রাখে যে, অতীত জীবনের স্মৃতি বিব্রত হয়ে দ্রুত আরও পেছনে চলে যায়। যখন কেউ তুলনা করে দুই ধরনের এই জীবন-যাপনের ছন্দ, পার্থক্যটা এতো স্পষ্ট আর মোটা দাগের হয়ে দেখা দেয় যে বিশ্বাসই হতে চায় না। বিদেশ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর আবার জীবন-যাপনের পুরনো দৈনন্দিনতায় যার অভাব সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ে তা হলো গতি। অন্নদাশঙ্কর রায় 'পথে-প্রবাসে' তে ইউরোপের জীবনে এই গতির কথা বারবার উলে-খ করে স্মৃতিমেদুর হয়েছেন। দেবেশ রায়ের 'ইউরোপা' বইতেও দেখা যায় স্বদেশে ফিরে গতির অভাব দেখে একই আক্ষেপ করেছেন। বিদেশ প্রত্যাগত সবার মধ্যেই এই অনুভূতি জাগে, কেউ লিখে জানায়, কেউ শুধু অনুভবেই সীমাবদ্ধ রাখে।

জামশেদ সামনে তাকিয়ে ফজলুকে জিজ্ঞেস করে, কেমন ছিল যাত্রা তোমাদের? ফজলু প্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, চমৎকার। সারাপথ দু' বন্ধু গল্প করতে করতে এলাম, তাই না? বলে সে আমার দিকে তাকায়। আমি নিরুত্তর থাকি।

অরুণোদয় থেকে অস্তাচলের পথে

আলী যাকের

পর্ব - ১

কোন সে প্রত্যূষ, আজ এই পশ্চিমাকাশে সূর্য হেলে পড়া বেলায়, আমার চেতনায় দেখা দেয় ? আমি ফিরে যাই সেই সকালে আবার। নাদু ভাইয়ের কোলে আমি। সামনে একটা খাঁচায় বন্দী চিতা বাঘ। খাঁচাটা বেশ ছোট। একটা বাঘের ঘর হতে পারে না কোনোভাবেই। তারই মধ্যে ঘোরাফেরার চেষ্টা করছে অবিরত। নাদু ভাই আমাকে খাঁচার একেবারে কাছে নিয়ে যায়। বাঘটা ধরা পড়েছে গতকালই সন্ধ্যাবেলায়। রাগে ফুঁসছে। নাদু ভাই আমাকে একেবারে বাঘটার মুখের কাছে নিয়ে গেল। বাঘটি মহা ত্যক্ত হয়ে বিশাল একটি হালুম দিল। আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। এইটিই বোধহয় আমার জীবনের একেবারে আদি স্মৃতি। এর আগের কিছু ছবি হয়তো মাথায় আসে যায়। অনেকটা প্যাঁজা তুলোর মতো। শরতের মেঘের মতো। কিন্তু ঐ চিতা বাঘের হালুম কখনও ভোলার নয়। জায়গাটা ছিল তখনকার কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর মহকুমার আমঝুপি নামের একটা গ্রামে। আমার বাবা তখন মহকুমা হাকিম, আর নাদু ভাই তাঁর আর্দালি। এই একটি বিশেষ পদ ছিল সেকালে, আর্দালি। অর্থাৎ একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার বিশেষ সহায়তাকারী। আজকাল পিওন বলে যাঁদের সম্বোধন করা হয়। আমার বাল্যকালে এঁদের সবাইকে ভাই বলে ডাকতাম। অসাধারণ সব লোক ছিলেন এঁরা। আমার বাবা মা'র চেয়ে কম দেখভাল করতেন না আমাদের। কেবল দেখভাল কথাটি বললে বোধহয় একটু কম করে বলা হয়। কেমন যেন 'কর্তব্য' ধরনের একটা বিস্বাদ পাওয়া যায় শব্দটিতে। প্রায় নিজের সন্তানের মত এঁরা

আমাদের দেখতেন।

এরপরের স্মৃতি মাদারিপুরের। সেই দিনই আমরা পাকিস্তানি হয়ে গেলাম। ১৪ই অগাষ্ট ১৯৪৭। স্পষ্ট মনে আছে বাবা স্যুট পরা, একটা স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। পুলিশ ব্যান্ডের সাথে সাথে মার্চ করে খাকি পোশাক পরা তাবৎ পুলিশ সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাবা সালাম নিচ্ছেন। মনে পড়ে বাবাকে মনে হয়েছিল ঈশ্বরের মত ক্ষমতাবান। তারপর আরও একটি ঘটনা। আমার একটা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি গাড়ি ছিল তখন। কাঠমিস্ত্রির বানানো। চারটি কাঠের চাকা লাগানো ছিল চারপাশে। একটি দড়ি লাগানো সামনে। ঐ দড়ি ধরে টানা যেত। ঘড়ঘড় আওয়াজ হতো। বেশ মজা লাগত। সাধারণত আমার বড় ভাই (ভাইয়া) ঐ গাড়ির দড়ি ধরে টানত। তো একদিন বিকেলে ভাইয়া ঘড়ঘড় শব্দ তুলে গাড়ি টানছিলেন। সেই শব্দ শুনে একটা কালো ষাঁড় প্রায় উন্মত্ত হয়ে আমার গাড়ির দিকে ছুটে আসে। ভাইয়া ষাঁড়ের উন্মত্ততা দেখে দৌড়ে পালিয়ে যায়। ষাঁড়টি গাড়ির কাছে পৌঁছে ফোঁস, ফোঁস শব্দ করতে থাকে এবং লেজ নাড়তে থাকে পেন্ডুলামের মত। কিছুক্ষণ পরে আর কোনো শব্দ না পেয়ে ষাঁড়টি আস্তে আস্তে দূরে সরে যায়। এই সমস্তটা সময় আমি গাড়ির ওপর চুপচাপ বসেছিলাম। টু শব্দটিও করি নি। আমার বেঁচে যাওয়া দেখে ভাইয়া নিরাপদ দূরত্ব থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। তাঁকে দেখে আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। সেই জীবন, সে কতবছর আগের প্রায় ভুলেই গেছি। তবে ঘটনাগুলো পরিষ্কার মনে আছে আজও।

আমার স্মৃতি সম্বন্ধে যদি কিছু লিখতে হয় তা শুরু হয়েছে আরও কয়েক বছর পরে, বাবা যখন খুলনায় বদলি হয়ে এলেন। বাবা থাকবার জন্যে একটা ছোট্ট কিন্তু সুন্দর বাড়ি পেয়েছিলেন। খুলনা পুলিশ লাইনের ঠিক উল্টো দিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, সেই বাল্যকালের পর অনেকবারই যেতে হয়েছে খুলনায়। এবং ঐ শহরে গিয়ে যে ঠিকানাতেই থাকি না কেন রিকশা করে কিংবা পায়ে হেঁটে একাধিকবার ঐ বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করেছি। এবং প্রতিবারই যেন ফিরে গেছি সেই বাল্যকালে । অনেক খণ্ড খণ্ড স্মৃতি মনে এসেছে। যেন কোন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে লাফিয়ে উঠে এসে উপস্থিত হয়েছে একেবারে দুই চোখের সামনে। ঐ বাড়ির সামনেই পুলিশ লাইন সংলগ্ন একটা গলি চলে গিয়েছিল ভেতরদিকে। সেই গলির মুখে একটা ছোট্ট মুদি-দোকান ছিল। সেই দোকানে এক আনা পয়সা দিলে এক টুকরো গুড় পাওয়া যেত। কোনো সময় মা আমার কোনো কাজে খুশি হয়ে যদি এক আনা পয়সা আমায় বকশিশ দিতেন, দৌড়ে চলে যেতাম সেই দোকানে, এক টুকরো গুড় কিনতাম, খেতে খেতে চোখ বুঁজে আসতো। স্বর্গসুখ কাকে বলে সেই স্বাদ যেন পেতাম ঐ গুড়ের টুকরোর মধ্যে। অমন মিষ্টি আর জীবনে কখনও খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে আমার মিষ্টির প্রতি দুর্বলতার কথা। ইংরেজিতে যাকে বলে Sweet Tooth, আমার ছিল তাই বাল্যকাল থেকেই। আরও অনেক পরে আমাদের দল যখন নাটক করতে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন শহরে গিয়েছে, সেখানকার নাট্যবন্ধুদেরকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করতাম আচ্ছা তোমাদের শহরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মিষ্টি কী ? তারপর হৈ হুল্লোড় করতে করতে সবাই মিষ্টি খাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়তাম রাস্তায়। এখন অবশ্য মিষ্টি খাবার কথা ভাবাও প্রায় পাপ। আমার রক্তে মিষ্টির আধিক্যে আমি আজ মিষ্টিহীন জীবনযাপন করছি। যাক গে সে কথা। ফিরে যাই খুলনার গুড়ের টুকরোয়। ঐ মিষ্টি ছিল আমার খাওয়া শ্রেষ্ঠ মিষ্টি।

খুলনায় আমরা অর্থাৎ আমি, আমার ছোট বোন এবং পাশের বাড়ির নাজমা সারাদিন নানারকম দুষ্টুমি করতাম। সেটা মোরব্বা চুরি থেকে শুরু করে, পাশের বাড়ির কিচেন গার্ডেন থেকে গাজর এবং মুলো চুরি, পাড়ার বন্ধুদের সাথে সাতচাড়া খেলা নিয়ে ফাইট, কিং-কং খেলায় সহ-খেলোয়াড়দের পিঠে ভীষণ জোরে টেনিস বল ছুঁড়ে দেয়া এইসব। খুলনায় পুরোনো একটা সার্কিট হাউজ বিল্ডিং ছিল যশোর রোডের ধারে বিশাল মাঠের একপাশে। সেই সার্কিট হাউজের সামনে একটা এরোপ্লেনের কংকাল পড়েছিল। ঐ প্লেন নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিধ্বস্ত হয়েছিল কাছে পিঠে কোথাও। বৃটিশরা ঐখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আমরা যখন সেই প্লেনের কংকাল আবিষ্কার করি তখনো তার হাড়গোড় সব ক্ষয়ে যায় নি। গদিহীন সিটের খাঁচা ছিল তখনো। তারই ওপরে বসে প্লেন চালানোয় মগ্ন হতাম কত বিকেলে। মনে হতো সারা বিশ্ব যেন ঘুরে বেড়াচ্ছি প্লেনে চড়ে। সেই প্লেনের ফাঁকফোকর দিয়ে নানারকমের বুনো লতাগুল্ম মাথা উঁচিয়ে তাকাতো আকাশের দিকে। মনে পড়ে, সেই লতাগুল্মের মাঝে একটা ঝকঝকে হলুদ কচুফুল ফুটেছিল। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোতে ইঁটের পাঁজার মধ্য দিয়ে মাথা উঁচিয়ে ওঠা রক্তকরবী ফুল আবিষ্কার করেছিলেন। সেই আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা আমাদেরকে এক অসাধারণ নাটক দিয়েছে ঐ ফুলের নামেই। আমার কিন্তু ঐ গাঢ় ঝকঝকে হলুদ কচুফুল দেখলেই তা খেতে ইচ্ছে করতো। ঐ প্লেনের কংকালের ভেতরে বসে খেলায় আমার নিত্য সঙ্গী ছিল আমার বোন ঝুনু। ঝুনুর অনুপ্রেরণায় এবং আমার লোভের বশবর্তী হয়ে কচরমচর করে ঐ ফুল খেয়েছিলাম একবার। মনে আছে গলা ফুলে ঢাঁই হয়ে

কুষ্টিয়ায় আমার সেই বাল্যকালে নিসর্গের সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ ঐ তীব্রতা পেতনা যদি আমার উদর পূর্ণ না থাকত। বয়সের তোয়াক্কা না করেই বোধের উন্মেষ হতে পারে, তবে বুদ্ধির স্ফুরণ হয় কিনা তা বলতে পারব না। কুষ্টিয়া পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ছিল একটা ছোট্ট শহর। সদ্যই এই শহরটি দেশ বিভাগের পর কৃষ্ণনগর জেলার মহকুমা থেকে বেরিয়ে এসে জেলা শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে। তবে আমরা যখন কুষ্টিয়ায় ছিলাম তখনও প্রত্যন্ত বাংলার একটি ছোট শহরের চরিত্র ছিল কুষ্টিয়ার। যত না বাড়িঘর তার চেয়ে অনেক বেশি গাছ-পালা।

গিয়েছিল। লেবু, তেঁতুল ইত্যাদির সাথে মায়ের হাতে মারও খেতে হয়েছিল প্রচুর। সেই মারের চেয়েও ভয়ংকর ছিল কচুফুলে কণ্ঠরোধ করা সেই বেদনা। মনে পড়ে বাবা-মার সাথে সরকারি লঞ্চে সুন্দরবন গিয়েছিলাম একবার। বাবা পাকা শিকারী ছিলেন। তাঁর ছিল একটা অত্যন্ত নামজাদা বিলেতি কোম্পানির তৈরি দোনলা বন্দুক। বাবা অনেকগুলো হরিণ শিকার করেছিলেন সেই যাত্রায়। হরিণ শিকার বোধহয় বৈধ ছিল তখন। আমার মনে পড়ে, দারুণ উল্লসিত হয়েছিলাম আমরা সবাই। আজ যখন জীবনানন্দ দাশের 'ক্যাম্পে' কবিতাটি পড়ি, "ক্যাম্পে শুয়ে শুয়ে কোন এক হরিণীর ডাক শুনি, কাহারে সে ডাকে "! হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। হরিণের জন্য প্রাণ কাঁদে। হরিণীর জন্য প্রাণ কাঁদে। জীবনের দুই তৃতীয়াংশ পেরিয়ে এসে অনেক অতীত ভাবনা অথবা কাজ নিয়ে গ্লানিবোধ হয়। এটাই বোধহয় নিয়ম।

খুলনার সেই বাল্যস্মৃতি সম্পূর্ণ হবে না যদি কয়েকজন মানুষের কথা স্মরণ না করি। এঁদের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন তারিকুল আলম। পেশায় সাংবাদিক। একজন টগবগে যুবক। প্রায়ই আমাদের বাসায় আসতেন। বাবা তাঁকে স্নেহ করতেন। বলতে গেলে তাঁর কোলে, পিঠে কেটেছে আমার অনেকদিন। পরে, তিনি যখন ঢাকায় নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ অধিকর্তা ছিলেন তখন তাঁর সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হই আমি। তাঁর স্ত্রী আভা আলম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একজন সেরা ধ্রুপদী সংগীত শিল্পী ছিলেন। (অভিনেত্রী সাবেরী আলম, নাট্য নির্মাতা প্রয়াত আহির আলমের মা)। তাঁর গাওয়া কেদার রাগে খেয়াল আমার প্রিয় গানগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। আমার বাল্যকালের আরেক প্রিয় মানুষ ছিলেন এ.কে.এম.মুসা। তিনি একজন খুব নামজাদা এবং প্রভাবশালী উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে অবসরগ্রহণ করেছিলেন। আমরা যখন খুলনায় ছিলাম তখন তিনি তরুণ সি.এস.পি হিসেবে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের কাজে খুলনায় ছিলেন এবং এই প্রশিক্ষণের কাজে যুক্ত ছিলেন বাবার সাথে। মুসা ভাইয়েরও কোলে পিঠেই থাকতাম আমি। আবিদ ভাই, বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রাণপুরুষ, তাঁরও বাড়ি ছিল খুলনায়। তিনিও আমাদের বাসায় আসতেন। রাস-ভারি মানুষ ছিলেন। আমার বড়ভাই এবং দিদির সঙ্গে সখ্য ছিল। আমি দূর থেকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে থাকতাম তাঁর দিকে। মা-দিদির বিনোদনের জন্যে ছিল সিনেমা হল 'নীলা'। এখন যেটার নাম পিকচার প্যালেস। সেখানে বসে বসে তাঁরা নানারকম ছবি দেখতেন। এসবই ছিল কলকাতার বাংলা ছবি। মাঝে মধ্যে আমার জেদ চড়ে যেত। আমি বাবার কোনো পিওনের হাত ধরে সিনেমা হলে পৌঁছে যেতাম। ভাবটা এমন যেন আমাকে একলা ফেলে যাওয়ার জন্য মাকে শাস্তি দিচ্ছি। অধিকাংশ ছবিই আমার বোধগম্য হতো না। আমি আবার বাসায় ফিরে আসতাম। আমাদের বাসা থেকে নীলা সিনেমা হল বেশ কাছেই ছিল। অতএব হেঁটেই যাওয়া আসা করা যেত। বাবা অফিস থেকে একটা গাড়ি পেতেন, তবে দাপ্তরিক কাজ ছাড়া গাড়ি ব্যবহার করা হতো না। মা দিদি সাধারণত রিক্সা করেই শহরের মধ্যে যাওয়া আসা করতেন। তবে বছরে একবার কি দুবার বাবা যখন ট্যুরে যেতেন শহরের বাইরে এবং ঐদিনই ফিরে আসতেন তখন আমাদের সুযোগ হতো গাড়ি চড়ার। খুব মজা হতো তখন। আমার মা খুব ভালো পরোটা বানাতে পারতেন। সেই সঙ্গে থাকত মুরগির মাংস। সারাটা দিন বড় আনন্দে কাটত।

বাবা কুষ্টিয়ায় এলেন এরপর। কুষ্টিয়ায় আমার বোধবুদ্ধির উন্মেষ ঘটে বললে

বাড়িয়ে বলা হবে না। এই একটি ব্যাপার আছে যা সকলের বেলায় এক সময়ে বা একই পরিস্থিতিতে হয় কিনা বলা মুশকিল। বুদ্ধির সাথে হয়ত মানুষের বয়সের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে কিন্তু বোধের সম্পর্ক ? মনে হয় সেটা বোধহয় সম্ভব নয়। প্রসঙ্গ যখন উঠলই তখন বিষয়টি সম্বন্ধে আরও দুচারটি কথা বলতে চাই। সুকান্তের সেই বিখ্যাত লাইন নিশ্চয়ই অনেকের মনে আছে, "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়"। তাই তার কাছে পূর্ণিমার চাঁদকে মনে হয়েছিল ঝলসানো রুটি। বোধের সঙ্গে মনের যেমন একটি প্রগাঢ় সম্পর্ক আছে তেমনি দেহেরও একটি সম্পর্ক আছে অবশ্যই। কিন্তু লক্ষ্য করা সম্ভব হবে যে চাঁদ যতই ঝলসানো রুটি বলে তাঁর কাছে মনে হোক না কেন, ঝলসানো রুটির কথা মনে করে কবিতাকে 'ছুটি' দেওয়ার অন্তমিল সম্বন্ধে কিন্তু তিনি সচেতন ছিলেন ঠিকই। অর্থাৎ তাঁর দারিদ্র্য বা ক্ষুধা তাঁকে কাব্যবিমুখ করতে পারে নি। তবুও বলব কুষ্টিয়ায় আমার সেই বাল্যকালে নিসর্গের সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ ঐ তীব্রতা পেতনা যদি আমার উদর পূর্ণ না থাকত। বয়সের তোয়াক্কা না করেই বোধের উন্মেষ হতে পারে, তবে বুদ্ধির স্ফুরণ হয় কিনা তা বলতে পারব না। কুষ্টিয়া পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ছিল একটা ছোট্ট শহর। সদ্যই এই শহরটি দেশবিভাগের পর কৃষ্ণনগর জেলার মহকুমা থেকে বেরিয়ে এসে জেলা শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে। তবে আমরা যখন কুষ্টিয়ায় ছিলাম তখনও প্রত্যন্ত বাংলার একটি ছোট শহরের চরিত্র ছিল কুষ্টিয়ার। যত না বাড়িঘর তার চেয়ে অনেক বেশি গাছ-পালা। শহরের ঠিক পাশ ঘেঁষে বয়ে গেছে গড়াই। বর্ষায় প্রমত্ত তার রূপ আর শুকনো মৌসুমে বয়ে যায় একেবারেই ক্ষীণধারায়। মাঝে মধ্যে দু' একটি গভীর খাদ। সেখানে দিব্যি সাঁতার কাটা যায়। ভাইয়া খুব ভালো সাঁতার কাটতে জানতেন, সেই বাল্যকাল থেকেই। একবার আমি আর আমার ছোটবোন তাঁকে পাকড়াও করলাম। বললাম, আমাদেরকেও নিয়ে চলো সাঁতার কাটতে। আমরা তখনও সাঁতরানো বিদ্যাটি আয়ত্ত করতে পারি নি। আমাদের জোর দাবির মুখে ভাইয়া রাজী হলেন। চৈত্র মাসের সেই শুকনো নদীর মাঝে মাঝে খাদের পানি একেবারে ঘন নীল । সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ছিলাম সেই পানির দিকে। ভাইয়া তরতর করে নেমে গেলেন পানিতে। একেবারে মাঝখান পর্যন্ত সাঁতরে গিয়ে আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, পানিতে নেমে এসো। ভয়ে হিম হয়ে গেলাম। এক পাও সরলো না। যেন স্থাণু হয়ে গেছি । ভাই এগিয়ে এসে কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে বললেন, কই এসো? আমাদের অবস্থান সেই পূর্ববৎ। ভাইয়া বললেন, বুঝেছি এভাবে হবে না. তারপর ওপরে উঠে এসে আমি কিছু বুঝবার আগেই খপ্ করে দু'হাত ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সেই জলার মধ্যখানে। খাবি খেতে খেতে তলিয়ে গেলাম পানির গভীরে। মনে হচ্ছিল মরে যাচ্ছি। হঠাৎ পায়ের নিচে ঠেকল শক্ত বালুর চর। দুই পা দিয়ে সজোরে ধাক্কা দিলাম। ভেসে উঠলাম ওপরে। তখন দুই হাত এবং পা ক্রমাগত চলছে। আমি দিব্যি ভেসে থাকছি। এইভাবে সাঁতার কাটার বিদ্যা অর্জন করা হয়ে গেল। আমার বোনের দুর্ভাগ্য, ভাইয়া দয়াপরবশ হয়ে ওকে ছুঁড়ে ফেলেন নি। আজ পর্যন্ত সে সাঁতার কাটতে পারে না।

আমার কুষ্টিয়ার স্মৃতি বৈচিত্র্যময়। এখন ভাবলে অবাক হতে হয় যে আমাদের বাল্যকালে কত সাধারণ বিষয়ও আমাদেরকে উৎফুল্ল করতো। আমরা বন-বাদার ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। এক এক দিন হাঁটতে হাঁটতে আবিষ্কার করে ফেলতাম নতুন, নতুন বন। এখন বুঝি সেগুলো তো আফ্রিকার জঙ্গল ছিল না। ছিল আমাদেরই চিরচেনা আম, কাঁঠালের বন। মাঝে মধ্যে দু'একটা জারুল, সোনালু, বেগুন গাছও দেখা যেত। গড়াইয়ের তীর ধরে হাঁটলে হিজল, বরুন (যাকে সাধারণত গ্রামের মানুষ বইন্যা বলে ডাকে) এইসব গাছও দেখা যেত । এই বৃক্ষের রাজ্যে প্রবেশ করলে প্রথমেই একটা কেমন বুনো গন্ধ পাওয়া যায় । তারপর প্রকারভেদে গাছে ফুলের ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ। আমি এখনও গ্রামে বেড়াতে গেলে হিজল ফুলের মৌসুমে, হিজল গাছের নিচে বসে থাকি। এইসব বনে বনে ছিলো আমাদের বিচরণ। ঐ সময়ে গোয়ালন্দ থেকে ঢাকা মেইল নামে একটা ট্রেন কলকাতা যেত কুষ্টিয়ার ওপর দিয়ে। ঐ ট্রেনে কুষ্টিয়া থেকে মায়ের সঙ্গে আমরা ভাইবোনেরা কলকাতা গেছি বেশ কয়েকবার। কলকাতা আমাদের কাছে তখন ছিলো স্বপ্নের শহর। ঐ শহরে রাস্তা ঘাট, নিয়নের আলো, পার্ক আর লেক, ট্রামে ঘুরে বেড়ানো, চিড়িয়াখানা, নিউমার্কেটের আইসক্রীম, ক্যাডবেরি চকোলেট এই সমস্তই বাল্যকালে আমাদের জন্য ছিল প্রবল আকর্ষণ। আরও আকর্ষণ ছিল হুগলী নদীর (যাকে গঙ্গা বলেন অনেকেই) পাড়ের ট্রাম ঘাটের রাস্তায় ফিটন ঘোড়ার গাড়ি করে ঘুরে বেড়ানো, নদীর ধারে ফুচ্‌কা খাওয়া। কলকাতায় গেলেই ট্রামে চড়ে হাওড়া স্টেশনে যাওয়া ছিল আমাদের জন্য একটি বিশেষ আকর্ষণ। ট্রাম যখন ঝমঝম্ করতে করতে হাওড়া পুলের ওপর দিয়ে যেত তখন আমাদের সেকি উত্তেজনা! পার্ক সার্কাসে ছিল আমার নানা বাড়ি। পার্ক সার্কাসের পার্কে আমরা বিকেলে ফুটবল, ক্রিকেট খেলতাম। বালীগঞ্জ লেকেও আমাদের একটি অতি প্রিয় জায়গা ছিল। আমরা ওখানে সাঁতার কাটতে যেতাম প্রায়ই। এর জন্যে অনেক নিগৃহীত হয়েছি আমার মামার কাছে। কলকাতা, কুষ্টিয়া এবং আমার বাল্য-কৈশোর সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প আছে, যা বলব এর পরের কিস্তিতে ।

শিল্পগুরু সফিউদ্দীন আহমেদ

মাহমুদ আল জামান

বাংলাদেশের চিত্রকলার ভুবনে সফিউদ্দীন আহমেদ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো দেদীপ্যমান। দীর্ঘদিনের একাগ্র শিল্পসাধনার মধ্যে দিয়ে এই শিল্পীপুরুষ বাংলাদেশের শিল্পের ভুবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ ও দীপিত করেছেন। তিনিই এদেশের ছাপচিত্রের জগতে অনন্যসাধারণ এক শিল্পগুরু। সমকালীন চিত্রের ভুবনে প্রধান শিল্পীও বটে। তাঁর সৃজনী উদ্যম, শিল্পিত মানস ও শিক্ষাব্রতী হৃদয়ের স্পর্শে আলোড়িত এবং সিক্ত হয়ে এদেশের অগণিত শিল্পী তাঁদের শিল্পীসত্তাকে আলোকাভিসারী করে তুলেছেন। শিল্প ও সুন্দর এই দুটি শব্দ যে অর্থযোজনা করে তাঁর চরিত্র মাধুর্য ও শিল্পসত্তার সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। একটি সময়ের বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধও তাঁর চরিত্রের সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে। সেজন্য তিনি স্বতন্ত্র, চলনে- বলনে ও পোশাকে– ব্যক্তিগত এক বিজন দ্বীপের মতো। বাংলাদেশের চিত্রকলাকে আন্তর্জাতিক মানে ও মর্যাদায় যে-কজন হাতেগোনা শিল্পী প্রতিষ্ঠা করেছেন সফিউদ্দীন আহমেদ তাঁদেরই একজন।

তাঁর সকল সৃষ্টি মাধ্যমে ড্রইং–ই বিশেষ মর্যাদা, ভিন্ন আদল ও মাত্রা নিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। ড্রইং তাঁর যেকোনো সৃষ্টির বীজ হয়ে ওঠে এবং তাঁর নির্মাণের বোধের

সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

সফিউদ্দীন আহমেদ ২০০৯ সালের ২৩ জুন সাতাশি বছরে পদার্পণ করেছেন। এই জন্মদিনকে উপলক্ষ করে তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবনে অনুরাগীজনদের এক সম্মিলন হয়েছিল। সম্মিলনে সফিউদ্দিনের সহকর্মী, ছাত্র ও চিত্রানুরাগীরা এই বর্ষীয়ান শিল্পীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন।

বাংলাদেশের শিল্পজগতের একজন পথিকৃৎ হিসেবে তিনি এখনো নানাভাবে আমাদের শিল্পভুবনকে ঋদ্ধ করছেন। এখনো তাঁর মন ও জীবন নানা শিল্প-জিজ্ঞাসায় আলোড়িত হয়।

গতবছর জন্মদিন উপলক্ষে বেঙ্গল গ্যালারি তাঁর ড্রইংয়ের একটি নির্বাচিত প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। এই প্রদর্শনীটি শিল্পী সফিউদ্দীনের কাজ উপলব্ধির জন্যে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে হয়ে উঠেছিল এক অনন্য ঘটনা। পরে এই প্রদর্শনীটি ঢাকার বেঙ্গল গ্যালারি ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে কলকাতার হো চি মিন সরণির রবীন্দ্রঠাকুর কেন্দ্রে প্রদর্শিত হয়েছিল। কলকাতার শিল্পানুরাগীরাও তাঁর রেখার মেধাবী সাবলীলতায় মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন।

সফিউদ্দীনের এত কাজ একসঙ্গে পর্যবেক্ষণ করাও হয়ে উঠেছিল বিরল অভিজ্ঞতা। নানা যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নিলেও একক প্রদর্শনীতে এত নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় ড্রইং দেখে কলকাতার শিল্পানুরাগীরা আলোড়িত হয়েছেন। হারিয়ে যাওয়া এক সময় যেন তাঁদের চোখের সামনে উজ্জ্বলতা নিয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি কলকাতায় শিক্ষা গ্রহণকালে শিল্পীসমাজে শ্রদ্ধার এক আসন অর্জনে সমর্থ হন এবং চল্লিশের দশকেই তিনি ছাত্র থাকাকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। এ শুধু ড্রইং প্রদর্শনী ছিল না। ড্রইং বলতে সাধারণভাবে যা বলা হয়ে থাকে এ-প্রদর্শনী সেই বলয়ে আবদ্ধ ছিল না এবং একে গৎবাঁধা রেখাচিত্রের সীমানায় বিবেচনা করা হয় নি। এ প্রদর্শনী হয়ে উঠেছিল সফিউদ্দীনের দীর্ঘ মানসযাত্রার এক বিরল উপস্থাপনা।

তিনি দীর্ঘদিন থেকে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শয্যাশায়ী বলে দুটি প্রদর্শনীর কোনো অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকতে পারেন নি। সফিউদ্দীনের ঢাকা ও কলকাতায় এই প্রথম একক প্রদর্শনী নানা কারণে ছিল তাৎপর্যময় সাংস্কৃতিক ঘটনা। তিনি দেশে কোনো একক প্রদর্শনী করেন নি বলে শিক্ষার্থী ও শিল্পানুরাগীরা তাঁর কোনো কাজ একসঙ্গে কোনোদিন দেখতে পারেন নি। সেদিক থেকে অনেকের জন্যে ছিল বিরল অভিজ্ঞতা।

তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী হয়েছিল লন্ডনে নিউ ভিশন আর্ট গ্যালারিতে, ১৯৫৯ সালে। তিনি তখন উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্যে লন্ডনে গিয়েছিলেন। এচিং, ড্রাইপয়েন্ট এবং অ্যাকুয়াটিন্টে তিনি তখন দক্ষতা অর্জন করেন। ঢাকা ও কলকাতার দুটি প্রদর্শনীতে লন্ডনে করা কিছু কাজ ছিল। সৃজনের বিষয় হিসেবে তিনি লন্ডনে বেছে নিয়েছিলেন দেশীয় বিষয়। জাল, নৌকা, সেতু আর বন্যা। তাঁর উদ্ভাবনী কৌশল ও সৃজনী শক্তির যে স্ফূরণ হয়েছিল শিল্পানুরাগীদের হৃদয় ও মনে তা স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল।

সফিউদ্দীন আহমেদ শিল্পীজীবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করেছেন এবং সকল মাধ্যমের কাজে তাঁর আশ্চর্য দক্ষতা রয়েছে। উৎকর্ষে ও সংখ্যার বিবেচনায় তাঁর সৃষ্টিও কম তাৎপর্যবহ নয়। অথচ নিজে নিভৃতচারী ও প্রচ্ছন্নে থাকতে ভালোবাসেন বলে অজস্র কাজের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও দেশে কোনো প্রদর্শনী করেন নি।

ড্রইং বা রেখা যেকোনো শিল্পীর সৃজনে গতিপথ নির্মাণ করে। রেখাই হয়ে ওঠে যেকোনো শিল্পীর জন্যে মৌলিক বিষয়। রেখার ছন্দ ও সাবলীলতা যেকোনো শিল্পীর সৃজনী উৎকর্ষে ছাপ রেখে যায়। বিংশ শতাব্দীর আলোড়ন সৃষ্টিকারীদের সৃষ্টিতে রেখার গুরুত্ব ও সৃজনময়তায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি। রেখা যে সফিউদ্দীনের শিল্পযাত্রা ও সাধনায় মৌল বিষয় সেকথা তিনি দু'একটি সাক্ষাৎকারেও আমাদের জানিয়েছেন। রেখাবিদ্যাকে চর্চার জন্যে যেকোনো শিক্ষার্থীকেই খুব পরিশ্রম করতে হয়। শিল্পী সফিউদ্দীনও রেখাকে আয়ত্ত, গতিশীল ও চিত্রে মাধুর্যময় এবং অর্থবহ করবার জন্যে নিরন্তর চেষ্টা করেছেন। রেখার চর্চাকে আরও প্রাণময় করবার জন্যে তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই খুব পরিশ্রম করেছেন।

সফিউদ্দীন কলকাতা আর্ট ইশকুলে শিক্ষা গ্রহণকালে নৈষ্ঠিক ছাত্র হিসেবে বৃহত্তর শিক্ষকমণ্ডলীর কাছ থেকে জীবন ও শিল্পের পাঠ নিয়েছেন। সেজন্যই বোধকরি তাঁর ভিতর শিল্পের যে অনল জ্বলেছিল তার ভেতর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে বুদ্ধিবাদী চর্চার অনুষঙ্গ। এই বুদ্ধিবাদিতা, নাগরিকতা ও নির্মোহতা তিনি অর্জন করেছিলেন কলকাতায় শিক্ষা গ্রহণকালে। কলকাতা চল্লিশের দশকে শিল্প-সাহিত্যের ভুবনে যে-আধুনিকতা–জিজ্ঞাসার ছাপ ফেলেছিল, তা তিনি মনেপ্রাণে অনুধাবন করেছিলেন এবং সে জন্যই তিনি জীবনব্যাপী লালন করেছেন প্রাখর্য, নির্লিপ্তি ও নাগরিকতা। এই গুণ তাঁকে আজীবন চালিত করেছে। তাঁর মনীষার দীপ্তি ভিন্ন এবং সৃজন ভুবনের শৃঙ্খলা ও তাপ সম্পূর্ণ আলাদা

মেরুর। বাংলাদেশের শিল্পের ভুবনে এই গুণাবলি দুর্লভ। তিনি যখন ছাত্র তখনকার সময়ের শিক্ষায় রেখার ধীশক্তি ও বৈভব এবং মর্মকে চিত্রবিদ্যাচর্চায় বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হতো। এই শিক্ষার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল আধুনিক নাগরিকতা। এই ভিন্নতাই সমকালীনদের থেকে তাঁকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে।

তিনি ছাপাই ছবি ও চিত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও ড্রইংয়ের অমিত সম্ভাবনাকে সকল মাধ্যমেই কাজে লাগিয়েছেন। ঢাকা ও কলকাতার সাম্প্রতিক দুটি প্রদর্শনীতে চল্লিশের দশকে করা তাঁর কিছু ড্রইং ছিল। চল্লিশের দশক থেকে এ-শতাব্দীর প্রারম্ভে করা তাঁর ড্রইংয়ের নির্বাচিত কাজ দেখে এই শিল্পগুরুর ধারাবাহিক উত্তরণকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা গেল। গত সাত দশক ধরে তিনি ড্রইংকে কীভাবে যত্নসহকারে চর্চা করেছেন তা এই দুটি প্রদর্শনীতে মনোগ্রাহীভাবে ধরা পড়েছে।

কিছু রেখা তাঁর ছাপচিত্র ও চিত্রকলার জন্যে পরিকল্পিত হলেও ড্রইং হিসেবে এগুলোর আলাদা শিল্পমূল্য আছে। ঝড়, বন্যা, মানবদেহ স্টাডি, মাছধরা, জাল, গুণটানা, শরবত বিক্রেতা, ফল বিক্রেতা, বাদাম বিক্রেতা, ছাপাখানাসহ নানা বিষয়কে উপজীব্য করে তিনি ড্রইং করেছেন।

আজীবন শিক্ষাব্রতী, শিল্পধ্যান নিমগ্ন ও নিভৃতচারী সফিউদ্দীন ড্রইংয়ে যে কত দক্ষ এবং ড্রইং তাঁর সৃষ্টিভুবনে যে কতভাবে ছাপ রেখে যায়, প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া এমন কিছু নিদর্শন দেখে আমরা তাঁর শৈল্পিক শক্তিমত্তা সম্পর্কে নতুন করে জ্ঞান আহরণ করেছি। এখানে জীবনের নানা অনুষঙ্গ, ভঙ্গি, নানা মুখ, রমণীদেহের সুডৌল ছন্দ, ফল বিক্রেতা, ধীবর, নদী, শ্রমজীবী মানুষের নিরন্তর জীবনসংগ্রাম, মাছ ও জাল তাঁকে যেভাবে আলোড়িত করেছে তা তিনি সৃজনখেলায় ধরে রেখেছেন। যেকোনো শিক্ষার্থী ও শিল্পানুরাগী তাঁর ড্রইংয়ের আবেগ ও কাব্যধর্মী ব্যঞ্জনা দেখে সফিউদ্দীনকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। শিল্প শিক্ষার্থীদের জন্যে এই প্রদর্শনী হয়ে উঠেছিল শিল্পশিক্ষার জন্য বিশেষ ফলপ্রসূ। শিক্ষার্থীরা দলবেঁধে তাঁর কাজ দেখেছেন। রেখার শক্তিমত্তা নিয়ে কথা বলেছেন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেছেন। সফিউদ্দীন নব্বুইয়ের দশকের শেষ দিকে ও এই শতাব্দীর সূচনায় চারকোল ও ক্রেয়নে বেশ কিছু ড্রইং করেছেন। কালো রং নিয়ে তাঁর নিরীক্ষাপ্রবণ মন সর্বদাই জিজ্ঞাসা-উন্মুখ ছিল। সেজন্য ছাত্রাবস্থা থেকেই কালো রঙের প্রতি তাঁর মোহ জন্মেছিল। এই কালো সিরিজের কাজও ছিল প্রদর্শনীতে। কালো রং কখনো তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর কুশলী হাতে। গহনকালো এখানে এক অর্থযোজনা করেছিল। কালো রংও যে কতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং আলোর অধিক হয়ে যায় এই রেখাগুলো যেন তারই প্রমাণ। গতানুগতিকতামুক্ত এসব ড্রইংয়ে তিনি চিত্রের গুণাবলি সঞ্চার করেছেন। ড্রইংয়ে এ-ধরনের নিরীক্ষা খুব একটা দেখা যায় না। রেখার সাবলীল ছন্দের মধ্যে তীব্র ও তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করা যায় বিষয়ের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য। ফর্মপ্রধান এই সৃষ্টিগুচ্ছে তাঁর চিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপও প্রতিফলিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের চিত্রসাধনায় এই রেখাসমূহ বিভাসঞ্চারী হয়ে উঠেছে। সফিউদ্দীন আহমেদের সকল মাধ্যমকে উপলব্ধির জন্য এই রেখাসমূহের তাৎপর্য অসীম বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

পঞ্চাশের দশকে তিনি লন্ডনে (১৯৫৬-৫৮) চিত্রচর্চা ও শিক্ষাগ্রহণ করেন। পাশ্চাত্যে এই শিক্ষাগ্রহণ আধুনিকতার নব্যবোধ, শেকড়-সন্ধানী শিল্পিত চিত্রের বিষয়, তাঁর শিল্পিত মনীষা ও শিল্প-কুশলতার গুণে তাঁর প্রথম লন্ডন প্রদর্শনীতেই চিত্রানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

চল্লিশের দশকে তিনি যখন কলকাতা আর্ট কলেজের ছাত্র, তখন থেকেই তাঁর স্বতন্ত্র শিল্পীসত্তা ও বিশিষ্টতা শিল্পানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রাবস্থা থেকেই শিল্পের অনলে নিজেকে দগ্ধ করে কুশলী ও দক্ষ চিত্রী হয়ে উঠেছেন তিনি। এই সময়ে মুসলিম সমাজে চিত্রকলার চর্চাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো না। তবুও তিনি বিরুদ্ধ স্রোতে যাত্রা এবং শিল্পিত মানসকে সমৃদ্ধ করেই চিত্রকলার ভুবনে নিজের আসনকে দৃঢ় করেছিলেন।

এমন শয্যাশায়ী হওয়া সত্ত্বেও চিত্রকলার ভুবনকে ঋদ্ধ করে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন। শিল্পচর্চার নানা বিষয় নিয়ে তিনি ভাবেন। শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবার জন্যে নিয়মিত যেতেন তাঁদের প্রদর্শনীতে। শিল্পে সমর্পিত এই মানুষটির যে-কোনো সৃষ্টিতেই বহুভাবনার গুঞ্জন ও আলোড়ন খুব সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। সংবেদনশীল ও অনুভূতির তীব্রতাও প্রাধান্য বিস্তার করে আছে তাঁর সৃষ্টিগুচ্ছে।

তাঁর মানসভুবন গড়ে উঠেছে ও তৈরি হয়েছে মূলত শিল্পের সৌন্দর্যবোধ, আদর্শবাদিতা এবং মুক্তিবুদ্ধির চেতনায়। আলাপচারিতায় সে-কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। সফিউদ্দীনের চরিত্রের অন্তর্গত এই বৈশিষ্ট্য তাঁর অন্তর্মুখিতায়ও এক মাত্রা সংযোজন করে। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর বোধ, বিশ্বাস ও শিল্পের অঙ্গীকারে ব্যতিক্রমী বিষয় হিসেবে

চিহ্নিত হয়ে আছে।

সফিউদ্দীনের শিল্পিত পথচলাকে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর অঙ্গীকারের এই ধরনকে উপলব্ধি করা খুবই জরুরি। ছাত্রজীবনে বামপন্থায় তাঁর নিমজ্জন হয়েছিল। সেজন্যই ছাত্র ফেডারেশনের ১৯৪৫ সালের ক্যাটালগে একটি ছবিও মুদ্রিত হতে দেখি।

জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে মিলে তিনি গড়ে তোলেন নতুন শিল্প শিক্ষালয়। যে-শিক্ষালয় এবং নানা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হয়ে উঠবে মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পূর্ব-বাংলায় একটি আধুনিক ও বাঙালি রুচি নির্মাণের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। সফিউদ্দীন বয়সের দিক থেকে কামরুল হাসানের কিঞ্চিৎ সিনিয়র। বাংলাদেশের চিত্রকলার ইতিহাসে পথিকৃতের এবং দেশের অগ্রগণ্য শিল্পীদের মধ্যে তিনি অন্যতমও। তিনি চিত্রকলার নানা মাধ্যমে বহু ধরনের কাজ করেছেন। বিষয়বৈচিত্র্যে এসব সৃষ্টি সৃজনশীলতায় এবং উৎকর্ষে অসাধারণ। চল্লিশের দশকেই, তিনি যখন ছাত্র তখনই, তিনি সর্বভারতীয় একটি পুরস্কার অর্জন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর। কলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সময়েই তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ভারতের কলারসিকদের। উড এনগ্রেভিং, এচিং এবং ড্রাই পয়েন্টে তিনি তখনই সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন। জীবনের প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন অসাধারণ জীবনঘনিষ্ঠ এক তেলরং কাজের জন্যে। চল্লিশের দশকের মধ্যপর্যায় থেকে তাঁর জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্রসমাজ আয়োজিত প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্র কলারসিক ও চিত্রামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তখন থেকে তিনি তাঁর সৃষ্টি নিয়ে কেবলই এগিয়ে গেছেন। আর পিছে ফিরে তাকাতে হয় নি তাঁকে। অসাধারণ সব শিক্ষক পেয়েছিলেন। আর ছাপাই ছবির কথা উঠলেই এই বয়সেও তিনি স্মরণ করেন তাঁর মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর ছাত্র রমেন চক্রবর্তীকে। সফিউদ্দীন আহমেদের জন্যে তাঁর স্টুডিওর দরজা সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। ক্লাসের পরে দিনের পর দিন তাঁরা আলাপ করেছেন ছাপাই ছবির সূক্ষ্ম করণকৌশল ও আলোছায়ার নির্মাণ নিয়ে। এমনকি নিজের স্টুডিও-গৃহের মেশিনও তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন যুবক সফিউদ্দীনের জন্যে।

এ-প্রসঙ্গে তিনি একজন শিক্ষকের কথাও স্মরণ করেন। আজকের খ্যাতনামা শিল্পী প্রকাশ কর্মকারের পিতা প্রহ্লাদ কর্মকার, তিনিও ছিলেন তাঁর শিক্ষক। কাঁকুরগাছিতে তাঁর স্টুডিও ছিল। বন্ধু আদিনাথ আর তিনি নিয়মিত যেতেন তাঁর স্টুডিওতে কাজ করতে।

সমকালের অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদের জন্ম ১৯২২ সালের ২৩ জুন, কলকাতার ভবানী-পুরে। বিশের ও তিরিশের দশকে ভবানীপুর এক অভিজাত এলাকা হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বাবার নাম মতিনউদ্দিন আহমেদ। তাঁর পিতামহ ডা. আমিন উদ্দিন আহমেদ। বেচু ডাক্তার নামেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন তাঁর মৃত্যুর পর ভবানীপুরের বাড়ির সামনের সড়কের নাম রাখল বেচু ডাক্তার লেন। এই স্বীকৃতি সহজেই উপলব্ধি করা যায় তিনি এই এলাকায় কত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। পারিবারিক পরিমণ্ডলে ধর্মের প্রভাব ছিল; নিকটাত্মীয়রা ভবানীপুরে যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর পিতা এই মসজিদেরই পরিচালনায় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারী; আপিস ছুটির পর এই মসজিদের পরিচালনায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী হন নি।

সফিউদ্দীনের মানস গঠিত হয়েছে দেশভাগের পূর্বে চল্লিশের দশকে শিল্পের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে। তিরিশ আর চল্লিশের দশকে কলকাতার শিল্পাঙ্গনের ভাবাকাশে কত ঘটনা যে ঘটে গেছে তা শিল্পে আগ্রহী মানুষমাত্রই অবহিত আছেন। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট, গগন ঠাকুর, অবন ঠাকুর, নন্দলাল বসুর সৃজনী উৎকর্ষ শিল্পের জগৎ সংসারকে কতভাবেই না নাড়া দিয়েছে। তরুণ সফিউদ্দীন বাল্য ও কৈশোরে এইসব আলোড়ন সৃষ্টিকারী শিল্পপ্রয়াসকে লক্ষ্য করেছেন গভীর আগ্রহে। শিল্প ও সাহিত্যে আধুনিকতা নতুন অবয়বে এই সময়ে স্ফুরিত হয়েছিল। শিল্পীসমাজ গতানুগতিকতার বৃত্ত ভেঙে নতুন শিল্পাদর্শে নিজেদের সঞ্জীবিত এবং নতুন ভাবনা ও সৃজনে তাঁদের সৃষ্টিকে বিন্যস্ত করেছিলেন। এই সময়ের শিক্ষার্থীরা বঙ্গীয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণ থেকে জীবন ও শিল্পের রস আহরণ করেছিলেন। একপর্যায়ে আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন মুকুল দে। আর মুকুল দে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণের সঙ্গী।

সফিউদ্দীন আহমেদ কলকাতা আর্ট ইশকুলে (১৯৩৬-৪২) অধ্যয়নকালে ড্রইংকে বিশেষ যত্নসহকারে আয়ত্ত করেছেন, সে-কথা আগেই বলেছি। সেজন্য সুদূর সাঁওতাল পরগণা *দুমকা* আর গঙ্গা নদী-তীরবর্তী অঞ্চল তাঁর নৈমিত্তিক বিচরণের ক্ষেত্র ছিল। দলবেঁধে শিয়ালদা স্টেশনে যেতেন। দুচোখ ভরে দেখতেন অগুনতি ও অসংখ্য মানুষ। মানুষের নানা অভিব্যক্তি তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতো। সহপাঠী

আদিনাথ মুখার্জী, মুরলীধর টালী ছিল নিত্যসঙ্গী। আর সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন দেবকুমার ও রণেন আয়নি দত্তকে। মানুষ ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং ড্রইং করার জন্যই তিনি এসব অঞ্চলে নিয়মিত যেতেন। এ নিরন্তর ড্রইংচর্চা শিল্পী সফিউদ্দীনের চিত্রকলাকে পরবর্তীকালে সমৃদ্ধ করেছে এবং শিল্পসুষম ও শিল্পরস গুণে বলীয়ান করেছে। এ-ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলতেন তাঁর প্রাণপ্রিয় শিক্ষক রমেন চক্রবর্তী ও অকালপ্রয়াত আরেক শিক্ষক আবদুল মঈন।

সফিউদ্দীন সার্থক চিত্রী ও সফল প্রিন্টমেকার তো বটেই, অসাধারণ সংবেদনশীল শিক্ষকও। শিক্ষার্থীদের তিনি পরম মমতায় ছাপ ছবির করণকৌশল শিখিয়েছেন। এই মাধ্যমের অভিজ্ঞতা, শিল্পিত প্রকরণ, পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানের ধারণা শিল্পের রূপ ও রস সৃষ্টির জন্যে যে কত অপরিহার্য বারংবার সে-কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ভারত ও পাশ্চাত্যের ছাপাই ছবির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

এখনো এই সাতাশি বছর বয়সেও মনের দিক থেকে তিনি তরুণ এবং সর্বদা অতৃপ্তবোধ তাঁকে তাড়া করে বলে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অবশেষে একটি পর্যায়ে এসে কাজটি শেষ করেন। একটি কাজ নিয়ে আত্মমগ্ন ভাবনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে অতিক্রম করেন তিনি। মানুষ, প্রকৃতি, সমাজ ও পরিপার্শ্ব কোনোকিছুই উপেক্ষণীয় হয় নি তাঁর চিত্রগুচ্ছে। সেজন্যে তাঁর কাজ গভীরতা সঞ্চারীও বটে।

শিল্পী সফিউদ্দীন এচিং আর উড এনগ্রেভিংয়ের জন্যে বিখ্যাত হলেও তিনি কিন্তু প্রথম সম্মান পেয়েছিলেন তেলচিত্রের জন্য। ছাপচিত্রের সকল শাখায় তাঁর নৈপুণ্য ও শিল্পকুশলতা ঈর্ষণীয় হলেও ছাপাই ছবির পাশাপাশি তিনি তেলরঙের কাজও করেছিলেন তখন। তাঁর চিত্রকর্মে বাস্তবধর্মিতা প্রাধান্য পেলেও দুর্লভ এক সারল্য ও প্রাণময়তা যেন মূর্ত হয়েছিল এক অন্তর্লীন আবেগে। এ-সময়ে করা তাঁর একটি ছবি–বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে চারটি নৌকা। জেলেরা কোনোটিতে দাঁড়িয়ে, কোনোটিতে বসে মাছ ধরছে। একটি ছবিতে দুজন প্রায় নগ্ন চাষি, নিচু হয়ে পাট আছড়াচ্ছে। হাঁটু ভেঙে কোমর বেঁকিয়ে তারা দাঁড়ানো। পেছনে সোনালি পাটের স্তূপ। দুটি স্টাডিতেই কড়া রঙের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু রঙের ব্যবহার এতোই সুসামঞ্জস্য যেন বাস্তব পরিবেশটাই ফুটে উঠেছে। আলোছায়া, লাইন ও কম্পোজিশনের জ্ঞানে শিল্পিত এক আমেজ সৃষ্টি করেছে। ছোট ক্যানভাসেও যে রং ও রেখা কত প্রাণময় হতে পারে যারা এ দুটি ছবি প্রত্যক্ষ করেছেন তারা বিষয়টি সম্পর্কে খুব ভালো করেই অবহিত হয়েছেন।

দেশ বিভাগের পর তিনি চলে এসেছিলেন ঢাকায়। এ-সময়ে তাঁর কাজে কিছুদিনের জন্যে ছেদ পড়েছিল। একটি স্কুলে ড্রইং শিক্ষকের চাকরি নিলেন। পরে বন্ধু জয়নুল আবেদিনের অনুরোধে আর্ট স্কুল গড়বার প্রয়াসেও যুক্ত ছিলেন। ব্রত হিসেবে নিলেন শিক্ষকতা; আর্ট কলেজের সঙ্গে সেই যে যুক্ত হলেন সে থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেন নি। অবসর গ্রহণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আর্ট ইনস্টিটিউটের তাঁর কক্ষ ছিল শিল্পবিষয়ক আলোচনার ও শিক্ষা গ্রহণের এক আলোকিত কেন্দ্র।

আগেই বলেছি, নিজের ভেতর সারাক্ষণ এক অতৃপ্তিবোধ তাড়া করে বলে আশ্চর্য এক প্রত্যয়ে তিনি কাজ করে গেছেন। সেজন্যে তিনি যতক্ষণ না মনে করেন ছবি পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করেছে, ততক্ষণ সে-ছবিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়, সৃষ্টির অপূর্ণতা ও পূর্ণতা আনয়নে ক্রমাগত কাজ করেই গেছেন। সে চিত্র হোক, কিংবা তাম্রতক্ষণ। যদিও এখন তিনি দুর্ঘটনাজনিত কারণে শয্যাশায়ী তবুও কোনো শিক্ষার্থীকে তিনি শিল্পশিক্ষা দিতে এতটুকু পিছপা হন না। সৃষ্টি সম্পর্কে লব্ধজ্ঞান দিতে সর্বদা তাঁর হৃদয়-মন উন্মুখ।

তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন ১৯৫৬ সালে তাম্রতক্ষণে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্যে। সেখানে অধ্যয়নই যেন তাঁর সৃষ্টিতে এক নতুন মাত্রা সঞ্চারিত করেছিল। পাশ্চাত্যের ছাপাই ছবির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো ছাত্রদের অবহিত করা হতো এখানে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। পেয়েছিলেন উন্নত হৃদয়মনের এক শিক্ষক। কয়েক বছর ধরে সফিউদ্দীন ব্যস্ত রইলেন বিলেতে শিক্ষাগ্রহণে। ভবিষ্যতে যে-পথ তিনি নেবেন মনে মনে তারই প্রস্তুতি চলছিল তখন। ছাপাই ছবি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করেছিলেন কলকাতা আর্ট ইনস্টিটিউটেও। রমেন চক্রবর্তী ও মুকুল দে-র কাছে শিক্ষা গ্রহণকালে তাম্রতক্ষণ সম্পর্কে গহনসন্ধানী ও জিজ্ঞাসা-উন্মুখ হয়ে উঠেছিল এ শিল্পীর হৃদয়। এ সময়েই ছাপচিত্রের শিল্পগুরু হেটার এচিং, অ্যাকুয়াটিন্ট ও এনগ্রেভিংয়ে নতুন মাত্রা সঞ্চার করে ছাপাই ছবিকে শিল্পের মর্যাদা ও ছন্দময় করে তুলেছিলেন। শৈল্প কুশলতা ও নানা ধরনের পরীক্ষা এ সময়ে ছাপাই ছবিকে উন্নত শিল্প পর্যায়ে নিয়ে যায়। লন্ডনের শিক্ষা তাঁর হৃদয়-মনকে প্রসারিত করেছিল এবং তাম্রতক্ষণ ও ছাপাই ছবির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো তিনি নতুন করে অনুভব করছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় পঞ্চাশের দশকে

ছাপাই ছবি পরিশীলিত বোধ নিয়ে শিল্পভুবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। পিকাসো-মাতিসসহ বিংশ শতাব্দীর আলোড়ন সৃষ্টিকারীরা ছাপাই ছবিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। লন্ডনে এই সময়ে বিভিন্ন গ্যালারি ও মিউজিয়ামে তাঁদের কাজ পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর শিল্পীমন এই প্রত্যক্ষণে যে শিল্পবোধ অর্জন করে যা তাঁকে আস্থা ও প্রত্যয়দীপ্ত করে তোলে। নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন তখন থেকেই। এমনকি তাম্রতক্ষণের পর এসিডের ব্যবহারের তারতম্যে যে ফল পাওয়া যায় – তা পরীক্ষা করে দেখেন। জলের নিনাদ তাম্রতক্ষণটি এ পরীক্ষারই ফল। লন্ডনের ইনস্টিটিউটেই শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন হেটোরের ছাত্র মার্লিন ইভান্সকে।

পারিবারিক ধর্মীয় আবহে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল। তিনি যখন কলকাতা আর্ট ইশকুলে শিক্ষা গ্রহণ করছেন তখন বন্ধুবৃত্তের মধ্যে বামপন্থায় বিশ্বাসী কয়েকজনকে তিনি পান। তিনি সরাসরি এ বামপন্থায় অঙ্গীকার করেন নি বটে তবে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার আসন ছিল। সেজন্য তাঁর বামপন্থার প্রতি এক ধরনের ঝোঁকেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

বিদেশে পাড়ি দেওয়ার আগেই তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন চারপাশের জীবনকে। জীবন থেকে শুষে নিচ্ছিলেন অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে ১৯৫৬ সালের ভয়াবহ বন্যার দুঃসহ অভিজ্ঞতা তাঁর সত্তায় প্রভাব ফেলেছিল। এই বন্যায় তাঁর স্বামীবাগের গৃহটি প্লাবিত হয়ে ঘরের ভেতর উঠেছিল কোমর জল।

লন্ডনে শিক্ষা গ্রহণকালে ইউরোপীয় সমকালীনদের মৌলিক কাজ দেখার সুযোগ তাঁর ভেতর গ্রহণ-বর্জনের এক বোধ সৃষ্টি করে। তাঁর মানসে জাগ্রত হয় গ্রহণের বোধ। ইউরোপ ভ্রমণ, সমকালীন খ্যাতিমানদের এত কাজ পর্যবেক্ষণ করার পরও তিনি কিন্তু দেশ, সমাজ ও তাঁর চোখে দেখা নানা বিষয় থেকে সরে আসেন নি। সেজন্যে দেশে ফিরে তিনি যখন তেলরঙে কাজ করছেন, তখনো তিনি জীবনের বাস্তব দিককেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বাস্তব ইমেজ, নৌকা ও পাল, ট্র্যাডিশনাল মোটিফের ছায়া পড়েছে তার কাজে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও বিন্যস্ত তাঁর কাজ। প্রতিটি বিন্দু, প্রতিটি রেখা ভেবেচিন্তে আঁকা। এক ধরনের বিবিক্তি ফুটিয়ে তোলাই যেন তাঁর উদ্দেশ্য।

> তাঁর তেলরঙের কাজে যেন নির্জন, আত্মসমাহিত রূপেরই খাঁটি প্রতিফলন হয়েছে। সফিউদ্দীন আহমেদ এই সাতাশি বছর বয়সেও নিত্য সৃষ্টিশীল। যদিও একটি দুর্ঘটনার ফলে তিনি পায়ে আঘাত পাওয়ায় দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী। অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে পায়ে। এই সময়ে তিনি অধ্যয়ন করেছেন এবং বাংলাদেশের চিত্রকলার উন্নয়ন ও বিকাশের সমস্যা, অন্তরায় ও সম্ভাবনা নিয়ে সর্বক্ষণ ভেবেছেন।

তাঁর তেলরঙের কাজে যেন নির্জন, আত্মসমাহিত রূপেরই খাঁটি প্রতিফলন হয়েছে। সফিউদ্দীন আহমেদ এই বয়সেও নিত্য সৃষ্টিশীল। একজন আধুনিক চিত্রকরের মতো তাঁর রয়েছে সজীব মন ও জাগর জিজ্ঞাসা। চিত্রকলায় ঐতিহ্য, আধুনিকতার স্বরূপ ও দেশীয় আত্মপরিচয়ের সমস্যা নিয়ে তিনি অনুক্ষণ ভাবেন।

সফিউদ্দীন আহমেদের সৃষ্টির ফসল অফুরন্ত এবং তাঁর চিত্রেগুচ্ছে রয়েছে অসামান্য জীবন উপলব্ধির নতুন মাত্রা ও গহন-গভীর জিজ্ঞাসা। তবু তিনি যেন একান্তভাবে প্রচ্ছন্নেই রয়ে গেলেন। মাঝেমধ্যেই আমার এমন জিজ্ঞাসা জাগে। সে কি কেবল এজন্য যে, তাঁর শিল্পিত স্বভাবে, রুচিস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের মধ্যেই আছে এক ধরনের বিনয়। এই বিনয়ই তাঁকে সমগ্র জীবন চালনা করেছে এবং সর্বক্ষণ তাঁর ভেতর যে-অতৃপ্তিবোধ তাড়া করে ফিরছে–আরও পরিশীলিত হোক সৃষ্টি কিংবা আরও জীবনলগ্ন, অধিক শিল্পসুষমামণ্ডিত –এই বোধ তাঁকে প্রচ্ছন্নে রেখেছে। এ বোধ হয় বড় এক শিল্পীপুরুষের বিনয়। এই বিনয়ই সমাজজীবন থেকে আজ অপসৃত। অনুকরণীয় এই বিনয় নিয়েই তিনি কতভাবেই না অনুজ চিত্রীদের দীক্ষিত করতে চেয়েছেন। উত্তরকালের সৃজনধারায় তাঁর সৃজনী উৎকর্ষ ও আদর্শবাদিতা অনিঃশেষ প্রেরণা সঞ্চারিত করতে সমর্থ হলে এদেশের চিত্রকলা উচ্চতর পর্যায়ে উন্নত হবে সন্দেহ নেই।

পাহাড়ি জনপদ : চার জলরঙ স্কেচে

হাফিজ রশিদ খান

এক

শ্রমঘনিষ্ঠ আদিবাসী নারী

পার্বত্য-অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। পরিবার এবং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এখানকার নারীরা সমাজে এবং পরিবারে তাদের অস্তিত্বকে জীবনের পক্ষে অর্থবহরূপে ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ অবস্থানে আসীন। ঐতিহ্যবাহী সমাজের চাষাবাদ প্রথা এবং তার শ্রমঘনিষ্ঠ কাজে পার্বত্য নারীসমাজ সেই আদ্যিকাল থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সামাজিক মূল্যবোধ ও কৃত্যসমূহ লালনে যেকোনো সমাজের নারীর মতোই এখানকার নারীও পালন করে আসছে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিক-নির্দেশনাসমূহ–যা সে শৈশব থেকে অর্জন করে বড়দের কাছ থেকে, বড়দের চালচলন থেকে। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ আদিবাসীর জাতিসত্তা, যেমনঃ ম্রো, চাক, খিয়াং, খুমি, তন্‌চংগ্যা, লুসাই, পাংখোয়া, বম, ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমা সমাজ পুরাকালীন সমাজব্যবস্থার বৃত্তে বেড়ে উঠেছে এবং সেকারণে পার্বত্য সমাজকে তাদের পরম্পরাগত কৃত্যসমূহ থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। এই সামাজিক কৃত্যসমূহ পালনে ওখানকার নারীদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ভারতীয় শাস্ত্র ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো নারীকে উচ্চমর্যাদা দান করেছে। কারণ নারী না বাঁচলে তো মানবজাতিই বাঁচবে না। এখানকার ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধে নারী তাই একদিকে আদ্যাশক্তির আধার, অন্যদিকে পুরুষের সমান মর্যাদার ভাগিদার। কেননা নারী পৃথিবীর জীবনচক্রকে গতিবান ও উচ্চগুণসম্পন্ন করে তুলতে সৃষ্টির প্রথম থেকেই বিশেষ তাৎপর্য ও সৌন্দর্য যোগ করে চলেছে।

বাংলাদেশের পার্বত্য-অঞ্চলে সেই প্রাচীন সময় থেকে এই চলমানকাল পর্যন্ত জীবনধারাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে রাখতে পার্বত্য নারীসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য

বাস্তবতারূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তারাই গৃহের শান্তি, গৃহের আলো, ঘরের অন্নসংস্থানের প্রধান নিয়ামক। নীরবে-নিভৃতে এই নারী শত ঝড়-ঝঞ্ঝাটকে মোকাবিলা করে জীবনের সুবিপুল তাৎপর্যকে বিকশিত করে তোলে। আনন্দ ও মমতাকে প্রতিষ্ঠিত করে রুক্ষ ও আনন্দহীন পৃথিবীর কঠিন বুক চিরে।

এর পক্ষে একটি সহজ উপমা যোগ করা যায়। পার্বত্য অঞ্চলের নিবিড় গ্রামগুলোতে এক ধরনের সতেজ ও সাবলীল পরিবেশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যখন ঘন বৃক্ষশোভিত পায়ে চলা পথে ভ্রমণ বা অবস্থানের প্রয়োজন হয়। এই পরিবেশকে একেবারে সাধারণ স্তরে বিবেচনা করলে মাতৃময়ী মমতা বা চেতনার মতো মনে হয়। বর্তমান বিপন্ন পরিবেশে এই মাতৃময়ী চেতনার পক্ষে জোর আওয়াজ উঠেছে বনাঞ্চল সংরক্ষণের জন্যে। বনায়নের পক্ষে এই জাগৃতি প্রকৃতির স্বাভাবিকতাকে তার নিজস্ব মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে চায়। কল্যাণময়ী নারীর মতো প্রকৃতির এই ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের সময়ের সুধিসমাজ থেকে শুরু করে বিশ্বসংস্থাগুলোও আজ তৎপর হয়ে উঠেছে। আজ তাই আমরা পার্বত্য-অঞ্চলেও লক্ষ করি নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের স্রোত। আধুনিক রাষ্ট্র নারীর ক্ষমতার মূলশক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে তার উদ্বোধন, তার প্রকৃত পরিচর্যায় বিপুল অবদান রেখে চলেছে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারে। যার অনিবার্য ঢেউ লেগেছে পার্বত্য-অঞ্চলেও। এখানকার নারী সমাজ এখন আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন হয়েছে নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে। তার সন্তানের নিটোল বেড়ে ওঠার ব্যাপারে। শিক্ষার আলোয় সে নিজেকে যেমন গড়ে তোলার পথ পেয়েছে, দেশের, সমাজের ভবিষ্যত সম্পদ শিশুদেরও সঠিক পরিচর্যার আলোক পেয়েছে। শিক্ষার এই ফলশ্রুতিতে পার্বত্য-অঞ্চলে প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে, শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। সেইসঙ্গে যোগ হয়েছে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার চেতনা ও সমাজের আগামী সম্পদ শিশুর জীবনরক্ষার চেতনা।

আমাদের পৃথিবীর জন্যে অপরিহার্য মানবসম্পদ রক্ষা ও পরিচর্যায় অন্যান্য নারীর মতো পার্বত্য নারীও আজ অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। এ নিশ্চয় গর্ব ও গৌরবের বিষয়। এ সত্য সময়ের বাস্তবতার কারণেই আমাদের স্বীকার করতে হবে। সেই সংগে মানবসম্পদ সংরক্ষণ ও তার যথার্থ পরিবীক্ষণ যেন বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সমতা ও সুচিন্তার ভিত্তিতে হয়–তাও গভীরভাবে ধর্তব্যের বিষয়, তাতে সন্দেহ নেই।

দুই

একটি চাকমা পরিবার ও শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা

একটা ছোট্ট ঝিরি বা পর্বতগাত্র থেকে নেমে আসা জলধারা। বয়ে-চলার নিঃশব্দতায় যেন সিঁধেল চোর। মালুম হয় না পরিমিত জল আছে কোথাও। আর কোমর-ডুবিয়ে স্নান করবার একটা চমৎকার আয়োজন–সে তো আন্দাজের বাইরেই। চারদিকে গলা-বাড়ানো ঝোপের কেমন একটু আদুরে-আদুরে শীতল আমেজ। পোকা আর ঝিঁঝিঁদের সুচিক্কণ কনসার্ট। কান পেতে শোনা আর তাতে হারিয়ে যাওয়ার খেসারত হিসেবে বকাঝকা খাওয়া। বকাঝকাটা মং ঞো হ্লা অং বাবুর। মারমা জনগোষ্ঠীর একজন প্রাণখোলা মানুষ, যিনি ওই কোমর-ডুবানো জলের কল্লোলে গোসল সারতে লেগেছেন বেশ ঝটিতি কায়দায়। ভেজা গামছাটা কাঁধে ফেলে ঝিরি থেকে পাড় বেয়ে এখন উঠে যাচ্ছেন কিরণচন্দ্র তালুকদার বাবুর উঠোনের দিকে–বেড়াতে এসেছি যে চাকমা ভদ্রলোকের বাড়িতে। তাঁর উঠোনের চারপাশে নানা অনামা কুসুম আর চারাগাছের সবুজ সম্মোহন। মাঝখানে পাতা আছে লাল আর সাদা প্লাস্টিকের দড়ি দিয়ে বোনা চারখানা মোড়ার সুন্দর আসন। দাওয়ায় একটা নিঃসঙ্গ সাদা বাল্ব জ্বলছে। তা থেকে ছিটানো হালকা আলো মোড়াগুলোকে আলোকিত করে ক্রমশ যেন কুয়াশা আবহে হারিয়ে যেতে চাচ্ছে দূরের পার্বত্য ছায়ায়।

বেতবুনিয়ার তরুণ সেগুন আর রূপসী চিবিদ গাছের ছায়াময় মখমল জলের স্পর্শে দ্রুত মুখ ধুয়ে ঞো হ্লা বাবুর পিছু নেয়া আমি একজন মগ্ন অতিথি এখানে। চলি আর ভাবি : অসহ্য রকমের শান্ত আর সার-সার সেগুন গাছের কাজল-কাজল পাতাদের ভিড়ে এই ছিমছাম পাড়ায় একটি ঘরের জীবনধারায় এমন জীবন্ত পবিত্রতা বুলিয়ে দিল কে? আর ঘরের মানুষগুলোর মনোগত চিন্তায় ঝকঝকে 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র আবেদন জানতে আগ্রহ হলো আমার। আগেই বলেছি, এটি একটি চাকমা পরিবারে ক্ষণিক ও আন্তরিক পর্যটনের সামান্য খুঁটিনাটি মাত্র।

অন্ধকারের হালকা আঁচড় লাগা সন্ধ্যায় এ-ঘরে যখন প্রথম প্রবেশ করি বিকেলের সোনাঝরা প্রহরে-ক্লান্ত-একটি খুব সাধারণ চৌকিতে কবি শামসুর রাহমানকে কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদে নিঃসঙ্গ শুয়ে থাকতে দেখি। ইতোপূর্বে রাহমান আমার অপঠিত-এমন তো নয় মোটে। তবে কী এমন দেখছি আজ এখানে, রাঙামাটির এই নির্জন উপত্যকায়? চোখে চাঞ্চল্য বয়ে চলেছে আমার এই চাকমা পরিবারের লোকজনের জন্যে। আমরা দু'জনসহ আরও তিনটি প্রাণীর অবস্থিতি এখানে। প্রৌঢ় কিরণচন্দ্র তালুকদার–অবসর নেয়া সরকারি কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তা, তাঁর সহধর্মিণী সঞ্চিতা চাকমা, তাঁদের তরুণীকন্যা শুভ্রা তালুকদার। আর জেনে যাই আমি–ওই গ্রন্থটি কিরণবাবুরই সংগৃহীত। নিজস্ব অবকাশে পাঠ করেন একা-একা। গান শুনেন। কবিতা আর গান আর মাঝে মধ্যে নগর

চট্টগ্রামের নার্সারিগুলোতে চারাগাছ কিংবা ফুলের স্তবক সরবরাহে সময় মাতিয়ে রাখেন। কানে কিছুটা খাটো। স্বাস্থ্যল মুখাবয়ব আর শরীরের ত্বক বাদামি উজ্জ্বল।

সেই প্রথম-প্রবেশের আগ্রহের সুবাদেই প্রথমত গ্রো হ্লা বাবুর উচ্ছ্বাসে স্থির হয়েছিল শামসুর রাহমান থেকে পাঠ হবে তিনজনে। অতএব ঝিরির কোল থেকে গ্রো হ্লা বাবুর পিছু-পিছু এসে বসা হলো উৎফুল্ল, ছোট-ছোট কুয়াশাবিন্দুমাখা মোড়াগুলোতে। ক্ষুধার যথোচিত সুরাহায় আর পার্বত্য সুরার আতিথেয়তায় এখানে শামসুর রাহমান উচ্চারিত হলেন বাঙালি আর চাকমা আর মারমা জিহ্বায়। মং গ্রো হ্লা অং আর কিরণচন্দ্র তালুকদারের বাংলা উচ্চারণে 'ট' কিছুটা 'ত' 'ড়' কিছুটা 'দ' 'প' কখনো-সখনো 'ফ'-এ শ্বাসাঘাত ফেললেও আমারও তো কিছুটা তথৈবচ অবস্থা। মাঝে-মাঝে প্রমিত উচ্চারণ আমাকেও বেশ ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে, টের পাই। সমস্যার বিষয় অভিন্ন হওয়ায় আর সকলের উদাসীনতা ওদিকটায় বেশ ব্যাপক থাকায় অন্যদিকে মনোযোগ দেয়া গেল, দেখি : একটু দূরে ঘরের দাওয়ায় বসা ওই তরুণীটিই শুভ্রা তালুকদার রাহমানের 'ইলেক্ট্রার গান' আবৃত্ত হচ্ছে যখন যথাসাধ্য সিদ্ধ মনন ও উচ্চারণের সৌহার্দ্যে - সে কান পেতেছে :

কান পেতে থাকি দীপ্র কণ্ঠ শোনার আশায়,
কাকের বাসায় ঈগলের গান কখনো যায় কি শোনা ?
ক্রাইসোথেমিস, অবুঝ তন্বী, দূরে সরে থাকে,
বিকচোন্মুখ শরীরে এখন লায়ারের ঝংকার।
নিহত জনক, অ্যাগামেনন, কবরে শায়িত আজ।

আমার মনের পটে ভেসে ওঠে তখন এক মহান পুরুষের সুঠাম শরীর। পাকিস্তানি উপনিবেশিক শোষণ-ত্রাসন থেকে দীর্ঘ সাংগ্রামিক জীবনের ধারায় যিনি জাতিকে স্বাধীনতার সোনালি প্রভাতে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। আর নিজে আকণ্ঠ গরল-সুধায় নীলকণ্ঠ হলেন স্বজাতি মারকাস-ব্রুটাস আর অ্যাজিস্থাসের ষড়যন্ত্রে।

গ্রিক পুরাণের ট্রয়যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক আগামেনন আর বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু কীভাবে যেন একাকার হয়ে গেলেন এখানে, এই এক পার্বত্য চাকমা পরিবারের ফুলভরা আঙিনায়। চেতনা যেন দারুণ বিহ্বলতায় পিতৃভূমি বাংলাদেশের জন্যে হু- হু করে ওঠে হঠাৎ। পারি না কী আমরা সকল রক্তের ঋণ শুধতে সকল ব্রুটাস আর অ্যাজিস্থাসের চিহ্ন ক্ষয়ে-ক্ষয়ে শাশ্বত বাংলার সমন্বয়ী সোপানে একত্র হতে? ঠিক, আজ যেমন একজন দেশপ্রেমী কবির কাব্যের সুবাদে তিন জাতি - মারমা, চাকমা ও বাঙালি একই সুরে, একই অনুভবে দীর্ঘক্ষণ অনুরণিত, স্পন্দিত হলাম!

তিন

মুণ্ডি : আদিবাসী চটপটি

মুণ্ডি, বান্দবানের মারমা আদিবাসী সমাজে প্রচলিত একটি আটপৌরে শব্দ। এর বাংলা অর্থ : চাউল থেকে তৈরি চিকন পিঠা। লম্বাকৃতির ভেজা চাউলের গুঁড়োকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে একটি পাত্রে রাখা হয়। পাশেই শোভা পেতে থাকে ঝাঁঝালো গুঁড়ো মরিচ, মশলা, সর্ষেতেল আর তেঁতুলগোলা জল। মোটামুটি এ-নিয়েই মুণ্ডি।

আদিবাসী পাড়াগুলোতে খুব জনপ্রিয় খাদ্যবস্তু এটি। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে নির্বিশেষে বেশ মজা করে এর স্বাদ গ্রহণ করা হয়। পাড়ার ভেতরে কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘরেই শুধু মুণ্ডি'র খোঁজ মেলে। এ-দৃশ্য প্রাত্যহিকের বেলায়। এছাড়া বিশেষ দিনে, যেমন : মেলা, হাটবাজার আর ধর্মীয় উৎসবগুলোতে প্রকাশ্যেও মুণ্ডি বিক্রি হয়। আদিবাসী বয়স্ক পুরুষ ও নারীদেরই মুণ্ডি বেচতে বেশি দেখা যায়।

মুণ্ডি খেতে চাইলে তাড়াহুড়োর কোনো সুযোগ নেই। বিক্রেতার সামনে, ডানে-বাঁয়ে পাতা ছোট-ছোট পিঁড়িগুলোতে অথবা চেয়ার-টেবিলে ধীরে-সুস্থে বসে মুণ্ডির জন্যে ফরমায়েশ দিতে হবে। মারমাভাষী বিক্রেতা অনেক সময় বাংলা বোঝে না। অতএব আশ্রয় নিতে হয় চট্টগ্রামী উপভাষার। সম্বোধনে 'অবঙ্গি' এই শব্দটা থাকলে কিছুটা পক্ষপাত মিললেও মিলতে পারে। ওই মারমা শব্দটির অর্থ : দাদু বা দাদি। ভিড়ের ভেতরে গিয়ে 'অবঙ্গি, মুণ্ডি দ' বললেই জবাব : বইয়ে না তুই (তুমি বসো বাবা)! কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়া-ওঠা মাঝারি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে উল্লিখিত ঝাল-টকের সমাহারে মুণ্ডি উপস্থিত। ঝাঁজালো গুঁড়ো মরিচের পরিমাণটা একটু বেশিই ওতে দেয়া হয়। কেননা এটিই মুণ্ডি'র মূল আকর্ষণ।

মুণ্ডি খাওয়া চলবে আর রুমাল বা টিস্যু কাগজ দিয়ে চোখমুখ মোছামুছিও চলবে। এটি খুব পরিচিত দৃশ্য। ছেলেমেয়েদের কোলাহলও এর সংগে একটি অন্যমাত্রা যোগ করে দেয়। ওই কোলাহল আসলে মুণ্ডি'র রসনা ছোঁয়া উল্লাসও বটে। পার্বত্য-অঞ্চল, বিশেষ করে বান্দরবানের মারমাপ্রধান এলাকায় এই মুণ্ডি বেশ পাওয়া যায়। মুণ্ডিকে পাহাড়ি চটপটি বলতে চাইলেও খুব একটা ভুল হবে, মনে হয় না। এত আসলেই চটপটিরই আদিরূপ!

চার

বদলাচ্ছে পাহাড়ের দৃশ্য

বদলে যাচ্ছে পাহাড়ের দৃশ্যপট। অরণ্যশোভিত পাহাড়ি

জনপদে এখন লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। এ পরিবর্তন বাইরের দিকে যেমন, অন্তরের দিক থেকেও কম নয়। কারণ আজ প্রয়োজনের তাগিদে নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধা ও চাহিদাগুলো পার্বত্য জীবনেও সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ যেন অনিবার্য পরিণতি। একে রোধ করার কোনো উপায় নেই। পাহাড়ি মানুষের ভবিষ্যত বংশধর-রা শহর ও পাহাড়ি জীবনাচারে তেমন পার্থক্য আর অদূর ভবিষ্যতে হয়তো খুঁজে পাবে না। অমোঘ ও অনিবার্য নিয়মে পরিবর্তিত হচ্ছে সব, হবে পার্বত্য জীবনও। 'ছায়া-সুনিবিড়, শান্তির নীড়' চিরায়ত পাহাড়ি গ্রাম আর বেঁচে নেই বর্তমানে। কোকিলের কুহুতান কিংবা জুমিয়া চাষির গানের সুরে আজকাল আর পাহাড়ি গ্রামগুলো জেগে ওঠেনা। পাহাড়ের মানুষ আজকাল আর পায়ে হেঁটে হাটবাজারে যায় না। সামান্য পথ হলেও চড়ে বসে চাঁদের গাড়িতে, কদাচিৎ টেম্পু বা ধাবন্ত বাসে। ডাবের বদলে ওরা এখন খায় কোক-ফান্টা-পেপসি-আরসি কোলার রস। ভাতের বদলে খাচ্ছে রুটি-পরোটা-ডালভাজি, নানা তেলসিদ্ধ খাবার। ডাবা বা ছিবদাঙের বদলে ওরা বিড়ি-সিগারেট তো ধরেছে অনেক আগেই। গ্রামে-গ্রামে গজিয়ে ওঠেছে ব্যাঙের ছাতার মতো চায়ের দোকান, খোলা দহলিজ। শহুরে, আধা-শহুরে টাউট-বেপারি, দালাল, মধ্যস্বত্বভোগী, ফড়িয়া, চোর-জোচ্চোর, খুনি, পকেটমার, জুয়াড়ি, নেশাখোর, নীল ছবি, বারবনিতা-প্রায় সবশ্রেণির আঞ্জাম একরকম জবরদখল করেছে এখন পাহাড়ি জনপদ।

বলা যায়, ওখানকার গ্রামগুলো এখন আর নেই কোলাহলমুক্ত, শান্ত, কিংবা ধ্যান-গম্ভীর। নানারকম টানা-পোড়েন, অভাব-অনটন আর হাহাকারে পাহাড়ের সাধারণ মানুষের জীবন এখনও দুর্বিষহ। পার্বত্য কিশোর-কিশোরীরা এখন শহরে চাকরি করে গার্মেন্টসে। জীবন-সংগ্রামের জটিল, আঁকাবাঁকা, অদৃশ্য স্রোতের ঘূর্ণিপাকে পড়ে শহরে যায় ওরা বাসে বাদুড় ঝোলা হয়ে। প্রতিনিয়ত ও দ্রুত পরিবর্তনশীল এ পাহাড়ি জীবনযাত্রাকে সকলের মেনে নিতে হচ্ছে অতঃপর।

প্রকৃতপক্ষে পাহাড়ের গ্রামগুলোর রয়েছে অন্তহীন সমস্যা। সমস্যা যেমন জটিল, তেমনি তা সহজেই নিরাময়যোগ্য নয়। সরকার শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যাপক জোর দিলেও এখনও পার্বত্য অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। জনগোষ্ঠীর ক্রমাগত চাপে জর্জরিত পাহাড়ি গ্রামগুলো সম্পূর্ণ গ্রামের পর্যাপ্ত খাদ্য এখন যোগান দিতে পারছে না। বছর-বছর জুমজমির খাণ্ডাংশের উৎপাদিত ফসল জুমিয়া পরিবারকে বাৎসরিক খাবার যোগান দিতে পারছে না। নিরক্ষর, অশিক্ষিত এবং পিতৃতান্ত্রিক পেশায় জড়িত জুমিয়া কৃষকরা সহজেই বিকল্প কাজের ধারাকেও চিহ্নিত করতে পারছে না। বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব, সেনিটারি সমস্যা, অধিক সন্তান প্রসব, ভগ্নস্বাস্থ্য, কাজের অভাব, টাউট-বাটপারদের মাস্তানি, শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া, আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি, সময়মতো কৃষিঋণ না পাওয়া, উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চনা, বিদ্যুতের অভাব, মান্ধাতার আমলের চিকিৎসা ব্যবস্থা, দুর্গম যোগাযোগ, অসুস্থ ও দলাদলিতে পরিপূর্ণ রাজনীতি, চড়াসুদে ধার নেয়ার মধ্য দিয়েই পাহাড়ি জীবনব্যবস্থা চলছে ধুঁকে ধুঁকে।

অসুস্থ রাজনীতির প্রভাবে পাহাড়ের আবহমান ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হচ্ছে। পাহাড়ের নেতারা থাকেন বড় শহরে, আসেন তারা কালেভদ্রে পাজেরো বা অন্য দামি গাড়ি হাঁকিয়ে। আদিবাসী কোমলমতি ছেলেমেয়েদের মনে কুটিল রাজনীতির বীজ ঢুকিয়ে তারা আবার হাওয়া হয়ে যান। এদিকে ওই রাজনীতির বিষবৃক্ষে হানাহানি, দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে ওরা। লাশ পড়ে পাহাড়ের কোণে, ঝোপের ধারে। কেউ জানে না কেন হচ্ছে এমন হত্যাকাণ্ড। মা-বাবা-আত্মীয়স্বজন দেখছে তাদের সুবোধ ছেলেটি হঠাৎ খুন হয়ে যাচ্ছে। এ এক বিষাক্ত পরিবেশ। অন্যদিকে বিভিন্ন বিদেশি সাহায্য সংস্থা ওখানে মেলেছে বিভিন্ন প্রকল্প আর সাহায্য-সহায়তার ডালপালা। এতেও ঘটছে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। একশ্রেণির যুবক-যুবতি মোটা অঙ্কের চাকরির সুবাদে বদলে যাচ্ছে দ্রুত-চালচলন, পোশাক, ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। তারা আলগা চালচলনে অন্য সুবিধাবঞ্চিতদের ঈর্ষার উদ্রেক করছে।

এখানে গড়ে ওঠেছে নানামাত্রিক বিভাজন। সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই বরাবর রপ্ত করছে ভাল-ভাল চাকরি-বাকরিগুলো আর পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তিহীনরা শিক্ষাগত ও অন্যান্য গুণাবলি সত্ত্বেও পিছিয়ে পড়ছে। এক দুর্বিষহ অবদমনের ভেতর কাটছে ওদের দিনকাল। অন্যদিকে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রেও এখানে লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। পাহাড়ের শিশুদেরও এখন আর স্কুলে বা বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় না, তারা যায় এখন কিন্ডারগার্টেনে। প্রায় ঘরে এখন ডিশ কানেকশান, ভিসিডি ক্যাসেটের ছড়াছড়ি। ফোক গানের পাশাপাশি পাহাড়ের ছেলেমেয়েরা ঝুঁকছে এখন বোম্বের ছায়াছবির গানের দিকে। ওরা হারিয়ে ফেলতে বসেছে নিজেদের গান, সুরের মায়াজাল। আর যারা ওদের মধ্যে একটু সংবেদনশীল, যারা চায় পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে, তারা যেন আগন্তুক। অথচ সময়টা-দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক সবদিক থেকে ওদেরই অনুকূলে। যারা আলোকপ্রাপ্ত ওখানে, তবে কী তারা পরদেশি? এ-রকম অবস্থায় পাহাড়ের মানুষের জন্যে দরকার প্রাতিষ্ঠানিক ও নান্দনিক শিক্ষা।

প্রফেসর আহমদ হাসান দানী এক প্রজ্ঞাবান জ্ঞানের সাধক

আবদুল মমিন চৌধুরী

দক্ষিণ এশিয়ার প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং বহুভাষা বিশারদ আহমদ হাসান দানী ২৬ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এ উপমহাদেশ একজন অনন্যসাধারণ পণ্ডিতকে হারাল। এ শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইসলামাবাদের কায়েদে আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস প্রফেসর ড. দানী ট্যাক্সিলা ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান সিভিলাইজেশনস্ এবং ইসলামাবাদ জাদুঘর–এর পরিচালক ছিলেন। জীবনের ৮৯তম বছরেও এই মানুষটি ছিলেন কর্মমগ্ন; মৃত্যুর পূর্বে মাত্র কয়েক মাস অসুস্থ ছিলেন। দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি জ্ঞানচর্চাকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর মুখ্য করণীয় হিসেবে। জ্ঞানের জগতের নব নব দিগন্ত উন্মোচনে তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল প্রবাদপ্রতিম। বাংলাদেশেও আমরা অধ্যাপক দানীকে বিশেষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব এই কারণে যে, এখানে দানী তাঁর কর্মময় জীবনের এক দশকেরও কিছু বেশি সময় কাটিয়েছেন, আর সে সময়টা ছিল তাঁর প্রতিভার বিকাশকাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায়, তদানীন্তন ঢাকা জাদুঘর (যা পরবর্তীকালে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে) পরিচালনা ও মানোন্নয়নে তাঁর উদ্ভাবনাময় তৎপরতা, তদানীন্তন এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান পরে (যা পরিণত হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ) প্রতিষ্ঠায় ও প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকে এর পরিচর্যায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জ্ঞানচর্চার প্রতি গভীর অনুরাগ ও প্রজ্ঞার ছোঁয়ায় ঢাকায় এক দশকের অবস্থানকালে তিনি যে তরুণ শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলেছিলেন তাঁরাই পরে বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর ও এশিয়াটিক সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠানে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন।

জন্মসূত্রে কাশ্মিরী ড. দানীর জন্ম ১৯২০ সালের ২০ জুন ব্রিটিশ ভারতে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়া-শুনা শেষ করেছিলেন ১৯৪৪ সালে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে। সংস্কৃত বিষয়ে বি. এ. স্নাতক ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি এম. এ. পড়ার সময় বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ এ. এস.

আলতেকারের ছাত্র ছিলেন। তিনিই বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রথম মুসলমান ছাত্র, তার উপর সংস্কৃত বিষয়ে, যা মুসলমান ছাত্ররা পড়তই না। ড. দানীর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৪৫ সালে। তিনি যোগদান করেন তদানীন্তন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে। যোগদানের পর পরই বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার মার্টিমার হুইলারের তত্ত্বাবধানে তিনি তক্ষশীলা ও মহেনজোদারো খননকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। ১৯৪৭-এর পর তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন এবং পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলে তাঁকে বদলি করা হয়; কর্মস্থল হয় তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজশাহী।
রাজশাহীতে অবস্থানকালে তিনি বরেন্দ্র জাদুঘরের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি অধ্যাপনার পেশা বেছে নেন এবং সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এই এক যুগেরও কিছু বেশি সময়ে ড. দানী একাডেমিক বিশ্বে নিজের স্থান করে নিতে উদ্যোগী হন। লন্ডনের স্কুল অব অরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ থেকে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করে তিনি পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৬ সালে। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'প্রিহিস্ট্রি এন্ড প্রোটো-হিস্ট্রি অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'। ১৯৬০ সালে তাঁর থিসিসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। ১৯৫৮- ৫৯ সালে গবেষণা বৃত্তি নিয়ে তিনি আবার লন্ডনে যান এবং এবার তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ভারতীয় লিপিতত্ত্ব। তাঁর গবেষণার ফল (ইন্ডিয়ান পেলিওগ্রাফি) ইংল্যান্ডের ক্লেরেন্ডন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। ভারতীয় লিপিতত্ত্বের উপর এই প্রামাণ্য গ্রন্থটি এখনও সমাদৃত এবং কয়েকবছর আগে ভারতে এর দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।
ঢাকায় অবস্থান কালে তিনি বাংলার মুসলিম যুগের ইতিহাস, স্থাপত্য শিল্প ও লিপি নিয়ে গবেষণায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। এ সময়কালে তাঁর প্রকাশনার মধ্যে 'বিবলিওগ্রাফি অব দি মুসলিম ইন্‌সক্রিপসন্‌স অব বেঙ্গল' (১৯৫৭) এবং 'মুসলিম আর্কিটেক্‌চার ইন বেঙ্গল' (১৯৬১) উল্লেখযোগ্য। ঢাকার ইতিহাস নিয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেন, যার দ্বিতীয় ও বর্ধিত সংস্করণ বের হয়েছিল ১৯৬২ সালে (ঢাকা: এ রেকর্ড অব ইট্‌স চেঞ্জিং ফর্চুন্‌স)।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা জাদুঘরের পরিচালকের দায়িত্বও দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ঢাকা জাদুঘর (তদানীন্তন অবস্থান ছিল নিমতলি প্রাসাদের বারদুয়ারীতে) সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হতো। ঢাকা জাদুঘরকে একটি উন্নতমানের জাদুঘরে পরিণত করতে এবং এর সংগ্রহ বর্ধনে তিনি সব সময় সচেষ্ট ছিলেন।

> নিঃসন্দেহে বলা চলে আহমদ হাসান দানী ছিলেন এ উপমহাদেশে প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও আদি সংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে প্রথম সারির এক ব্যক্তিত্ব। জ্ঞানচর্চায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় পরবর্তী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণে এবং জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে তাঁর অবদান এ উপমহাদেশের কেন সারা পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজ চিরদিন স্মরণ রাখবে

ঢাকায় অবস্থানকালে প্রফেসর দানীর আবাস ছিল জাদুঘরের পাশেই একটি ছোট্ট বাড়িতে (তার অস্তিত্ব এখন বিলীন) এবং তাঁর দিনের অধিকাংশ সময় কাটত জাদুঘরের পাঠাগারে এবং নিমতলি প্রাসাদের প্রবেশ তোরণে অবস্থিত 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান'-এর অফিস কক্ষে। এখানে অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে, ঢাকায় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির (স্যার উইলিয়াম জোন্‌স প্রতিষ্ঠিত) আদলে একটি জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে প্রধান চালিকাশক্তি ছিলেন আহমদ হাসান দানী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পরই তিনি এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকদের (যাঁর মধ্যে ছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর এ. এম. হবিবুল্লাহ, ডক্টর সিরাজুল হক, ডক্টর আবদুল হালিম প্রমুখ) একত্রিত করে ১৯৫২ সালের ৩ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করেন 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান' নামে প্রতিষ্ঠানটি। এর জন্মলগ্ন থেকেই দানী ছিলেন এর প্রধান চালিকাশক্তি ও সাধারণ সম্পাদক। ঢাকায় অবস্থান কালে দানী এই প্রতিষ্ঠানটিকে লালন করেছেন, সহযোগীদের জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, সোসাইটির সদস্যপদ বৃদ্ধি করেছেন এবং এর প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ঢাকার বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে এমন এক পর্যায়ে রেখে গিয়েছিলেন যে, সে অবস্থা থেকে

ফুলে ফলে কলেবরে বৃদ্ধি পেয়ে সেই প্রতিষ্ঠানটিই এখন বাংলাদেশের অন্যতম জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দানীর কর্মমুখর জীবনের এটি একটি জীবন্ত স্বাক্ষর। আমৃত্যু তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে গর্ব বোধ করতেন। এই সোসাইটি দানীকে স্বর্ণপদক প্রদান করে ১৯৮৬ সালে এবং ফেলোর সম্মানে ভূষিত করে ১৯৬৯ সালে।

ঢাকায় অবস্থানকালে দানী বহু গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধান করেছেন, তার মধ্যে আবদুল করিমের 'সোসাল হিস্ট্রি অব দি মুসলিম্‌স ইন বেঙ্গল' এবং মঈনউদ্দীন আহমদ খানের ফরায়েজি আন্দোলনের উপর গবেষণা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

ঢাকা থেকে ১৯৬২ সালে তিনি পেশোয়ার চলে যান। পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রত্নতত্ত্বের প্রতি তাঁর অনুরাগই হয়তো তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। পাকিস্তানেই তিনি জীবনের বাকি অংশ কাটিয়েছেন। ঐ অঞ্চলে তিনি বহু প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য পরিচালনা করেছেন। তিনি পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে রেহমান ঢেরিতে প্রাক্-সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন উন্মোচন এবং দির অঞ্চলে ইন্দো-গ্রিক প্রত্নস্থল উদ্‌ঘাটন করেন। এছাড়া তিনি বেশ কয়েকটি গন্ধার শিল্প-কেন্দ্র উদ্‌ঘাটন করেছেন পেশোয়ার ও সোয়াত উপত্যকায়। আশির দশকে তিনি পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের সুউচ্চ পর্বতাঞ্চলে নবোপলীয় যুগের পর্বতগাত্রের লিপি ও চিত্র উদ্‌ঘাটন করেন। নব্বই-এর দশকে দানী ইউনেস্কোর অধীনে চীনে মরূ-অঞ্চলের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সিল্ক রোড অভিযানের বিশেষজ্ঞ দলের নেতৃত্ব দেন।

এছাড়া মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সাথে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক স্থাপনের পর দানী তাঁর গবেষণার বিষয় হিসেবে মধ্য এশিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং মধ্য এশিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর কর্মময় জীবনের শেষ দু'তিন বছর শারীরিক কারণে তিনি কিছুটা স্থবির হয়ে পড়েন। তবে জীবনের প্রায় ছয় দশক ধরে এতো কর্মমুখর থাকতে খুব কম পণ্ডিতকেই দেখা যায়।

দানীর গবেষণা কর্ম ও প্রকাশনা সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। তিনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে (১৯৫৮-৫৯), অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে (১৯৬৯), পেন্‌সিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটিতে (১৯৭৪) ও ম্যাডিসনের উইস্‌কন্‌সিন্‌ ইউনিভার্সিটিতে (১৯৭৭) ভিজিটিং প্রফেসর বা ফেলো হিসেবে সমাদর লাভ করেছেন।

পাকিস্তান সরকার ২০০৪ সালে তাঁকে 'Distinguished National Professor' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছে। অবশ্য এর আগে হিলাল-ই-ইম্‌তিয়াজ (২০০০); আইযায-ই-কামাল (১৯৯২); সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৬৯) প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় সম্মাননা তিনি লাভ করেছেন। ফ্রান্সের লিজিয়ন-অব-অনার (১৯৯৮), ইউনেস্কোর এরিস্টটল সিলভার মেডেল (১৯৯৭), জার্মানির অর্ডার অব দি মেরিট (১৯৯৬) এবং ইতালির নাইট কমান্ডার (১৯৯৪) প্রভৃতি আর্ন্তজাতিক সম্মাননা দানীর গৌরবের অর্জন। তাঁর প্রকাশনার তালিকা দীর্ঘ। যে প্রতিভার প্রথম বিকাশ ঘটেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে, তার বহুল প্রসার ঘটেছিল পেশোয়ার আর ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে। একাধারে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্যশিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে বহুবিদ অঞ্চলের অতীত উদ্‌ঘাটনে দানী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ইউনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত বিশাল গবেষণা কর্ম *History of Humanity* এর তৃতীয় খণ্ডে J. P. Mohen এর সাথে যৌথ সম্পাদকের ভূমিকায় অবদান রাখার সম্মান দানী পেয়েছিলেন।

দানীর পাণ্ডিত্যের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল তাঁর বহু ভাষা-জ্ঞান। সংস্কৃতের পাশাপাশি বাংলা, হিন্দি, আরবি, ফার্সি জ্ঞান তাঁকে সাহায্য করেছে ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের গবেষণায়। কাশ্মিরী, মারাঠি, পশ্‌তু, পাঞ্জাবি, সেরাইকি, সিন্ধি, তামিল ও উর্দু ভাষায় ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। এছাড়া ফরাসি, স্প্যানিশ ও জার্মান ভাষাও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তুর্কিসহ মধ্য এশিয়ার অন্যান্য ভাষাতেও তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ভাষাতত্ত্বের ভিত্তি অত্যন্ত জোরালো ছিল বলেই দানী অতি সহজেই একটি নূতন ভাষা আয়ত্ত করতে পারতেন।

নিঃসন্দেহে বলা চলে, আহমদ হাসান দানী ছিলেন এ উপমহাদেশে প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও আদি সংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে প্রথম সারির এক ব্যক্তিত্ব। জ্ঞানচর্চায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় পরবর্তী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণে এবং জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে তাঁর অবদান এ উপমহাদেশের কেন সারা পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজ চিরদিন স্মরণ রাখবে। ঢাকায় তাঁর জীবনের প্রথম বিকাশ এবং ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাংলাদেশের সুধী সমাজও দানীকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। দানীর মৃত্যুতে এ নিবন্ধের রচয়িতা বিশেষভাবে মর্মাহত ও শোকাহত। দানীর মতো শিক্ষাগুরুর হাত ধরেই বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তার প্রবেশ ঘটেছিল। সারাজীবন দানীর ছাত্র বলে পরিচয় দিয়ে যে গৌরব সে বোধ করেছে তা বলে বোঝানো কষ্টকর।

ড. ওয়াজেদ মিঞা
রাজনীতি নিস্পৃহ একটি সুন্দর মনের মানুষ

অজয় রায়
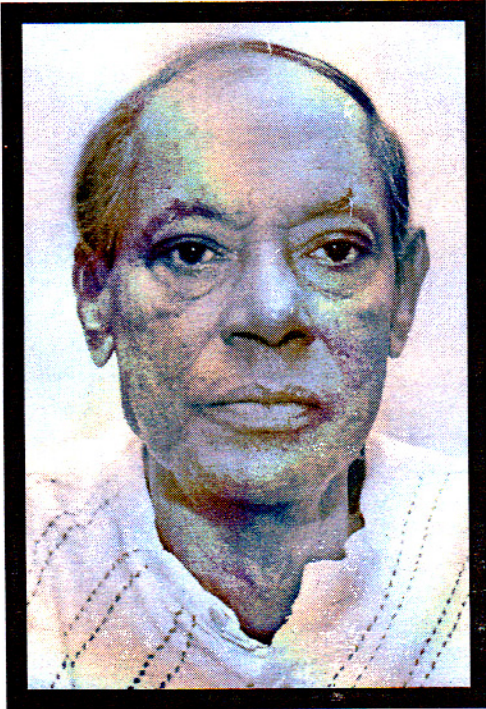
যা মনে হচ্ছিল অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটল– দেশের একজন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ড. এম ওয়াজেদ মিঞা আর আমাদের মাঝে নেই। তার ডাক নাম ছিল সুধা মিঞা। ৯ই মে, ২০০৯, শনিবার বিকেল ৪-২৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

বেশ কয়েকদিন ধরেই পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হচ্ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিঞা গুরুতরভাবে অসুস্থ। তিনি নানা জটিল রোগে ভুগছেন– ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, এজমা, জটিল কিডনি সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরপরই তিনি অচৈতন্য অবস্থায় চলে যান যা থেকে তাঁর চেতনা যথার্থ অর্থে আর ফিরে আসে নি। ডাক্তারদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি সেদিন শয্যাপার্শ্বে ক্রন্দনরতা বিষাদের প্রতিমা প্রিয়তমা স্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মুখেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

ড. ওয়াজেদ শুধু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী বা 'জয় ও পুতুলে'র বাবা নন, নিজ গুণেই ছিলেন গুণান্বিত ও স্বপরিচয়ে খ্যাত। তাঁর কালে তিনি ছিলেন দেশের একজন বড় মাপের তাত্ত্বিক নিউক্লিয় পদার্থবিদ (Theoretical Nuclear Physicist), তবে 'পরমাণু বিজ্ঞানী' নামেই তিনি দেশবাসীর কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। 'পরমাণু বিজ্ঞানী' এই অভিধাটি তিনি নিজেই নামের সাথে সংযুক্ত ও জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। আমার মনে আছে বেশ কয়েক বছর আগে

একবার তাঁকে বাংলাদেশ পদার্থবিজ্ঞান সমিতির সাধারণ সম্পাদক অথবা সভাপতি পদে দাঁড় করান তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা। প্রস্তাবক ড. ওয়াজেদকে 'পরমাণু বিজ্ঞানী' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই শুরু, আমৃত্যু তিনি এই অভিধায় নিজেকে তুলে ধরেছেন, তাঁর বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরাও তাঁকে সেভাবেই আখ্যায়িত করেছেন গত কয়েক দশক ধরে। পরমাণু বিজ্ঞানীর ইংরেজি করলে বলতে হয় 'Atomic Scientist, the scientist who made contribution to atomic research.' প্রসঙ্গত একটি কথা বলি, আমরা বাংলায় যাকে বলি অণু সেটি আসলে হল 'মলিকিউল' (Molecule), আর এ্যাটম (Atom) হচ্ছে পরমাণু। একাধিক পরমাণু মিলে তৈরি হয় 'মলিকিউল'। আমার সাথে তাঁর ছিল দীর্ঘ দিনের স্নেহসিক্ত মধুর সম্পর্ক। একদিন রসিকতা করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি নিজেকে 'পরমাণু বিজ্ঞানী' বলে পরিচয় দাও কেন ? ড্যালটন, রিডবার্গ, হার্জবার্গ, সামেরফিল্ড, রাদারফোর্ড, থমসন, বর্ণ, বোর যে অর্থে পরমাণু বিজ্ঞানী তুমি তো সেই অর্থে পরমাণু বিজ্ঞানী নও; তুমি তো আসলে নিউক্লিয় বিজ্ঞানী বা Nuclear Scientist, বড়জোর বাংলায় বলা যেতে পারে 'পরমাণুকেন্দ্রীক-বিজ্ঞানী'। ওর অফিসেই কথা হচ্ছিল। হো হো করে হেসে উঠে বলেছিল, 'ওর চাইতে ভাল বাংলা আর খুঁজে পেলাম না স্যার, কিন্তু দেখুন সবাই কেমন শব্দটিকে মেনে নিয়েছে। বাংলা ভাষাতে একটা সুন্দর শব্দ চালু করার কৃতিত্ব তো আমাকে দেবেন ?' ওর দেখাদেখি আণবিক শক্তি কমিশনের অনেক বিজ্ঞানীও নিজেদের নামের আগে এ শব্দটি লাগাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ধোপে টেকে নি। পরমাণু বিজ্ঞানী– শব্দটি ওয়াজেদকেই মানায়, আর কাউকে নয়। প্রিন্সিপ্যাল শব্দটি জনাব ইব্রাহিম খাঁর নামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল আমাদের কালে। বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন প্রিন্সিপ্যাল আগেও এসেছেন, পরেও গেছেন। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল বলতে ইব্রাহিম খাঁকেই বোঝাত, একেবারে আদি অকৃত্রিম বহুব্রীহি সমাস। ওয়াজেদের ব্যাপাবটিও তাই ছিল।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট শেখ পরিবারের সাথে, বিশেষ করে তখনকার আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের সাথে পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে ছাত্রলীগের প্রথম সারির এক জন কর্মী হিসেবে ওয়াজেদ যখন ফজলুল হক হলের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিল, ১৯৬১-৬২তে। সেই পরিচয় ক্রমে নিকটতর হয়েছে– এই উদ্দীপনাময় তরুণ মেধাবী ছাত্রটি নিশ্চয় শেখ মুজিবকে আকৃষ্ট করেছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আওয়ামী লীগের কোনো নেতার মাধ্যমে বেগম মুজিবের কাছে তাঁদের আদরের হাসুর ভবিষ্যৎ স্বামী হিসেবে ওয়াজেদের কথা বলা হয়। শেখ সাহেব তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারাগারে বন্দী। আমার মনে হয় এর পর আর সময় ক্ষেপণ হয় নি। বিয়ের কিছুদিন আগে হঠাৎ করেই একদিন বিভাগে এসে এ নিয়ে আমার মত জানতে চাইল। আমি কিছুক্ষণ ভেবে বলেছিলাম, ' দেখ এ বিয়ে সাধারণ দুটি পরিবারের মধ্যে নয়, এজন্য তোমাকে হয়ত অনেক বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। তোমাদের দাম্পত্য জীবনতো আর পাঁচটা সাধারণ দম্পতির মতো হবে না। আবার তোমার ভাগ্যের দ্বারও খুলে যেতে পারে। তার ওপর রয়েছে তোমার একাডেমিক জীবন। সবদিক ভেবে সিদ্ধান্ত নিও।' আমি সরাসরি কোনো মতামত দিই নি। তবে সবশেষে বলেছিলাম, "তোমার পরিবারের যদি মত থাকে তাহলে আর অসম্মতি করো না, go ahead।" আমি শেখ হাসিনাকে তো দূরের কথা, শেখ সাহেবকেও ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না, যদিও তাঁর মুক্তির জন্য আমরা আন্দোলনে নেমেছি। যতদূর মনে পড়ে ১৯৬৭'র শেষ দিকে হাসিনা-ওয়াজেদ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়– আগরতলা ষড়যন্ত্রের আসামী রূপে কারাগারে থাকা শেখ মুজিবের আশীর্বাদ নিতে পরদিন নবদম্পতি জেল গেটে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর হাসুঅন্ত প্রাণ শেখ মুজিব নিশ্চয় সেদিন ওদের জন্য কামনা করেছিলেন অকল্পনীয় সুখ আর শান্তি। ওয়াজেদ সেদিনের কথা মনে রেখে বারবার আমাকে বলেছিলেন, শেখ সাহেব তাকে সেদিন যে উপহার দিয়েছিলেন তা তিনি কোনোদিন হাতছাড়া করেন নি।

ওয়াজেদের কয়েকটি দিক আমাকে মুগ্ধ করে। প্রথমত সে ছিল সে সময়কার অত্যন্ত এক মেধাবী ছাত্র। উঠে এসেছিল রংপুরের এক অখ্যাত গ্রাম নিবাসী সাধারণ পরিবার থেকে। গ্রামীণ এই সরল মনটি সে আজীবন ধরে রেখেছিল, যদিও

> সফল গবেষকের পাশাপাশি ড. ওয়াজেদ ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। স্বাধীনতা উত্তর কালে বাংলাদেশ পদার্থবিদ্যা সমিতির ও পেশাজীবী বিজ্ঞানীদের সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, এছাড়া অনেক জনকল্যাণমূলক সংগঠনের সাথেও সে যুক্ত থেকেছে।
>
> নিউক্লিয় পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে দেশে বিদেশে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল।

ওয়াজেদেরও একটি স্বপ্ন সাধ ছিল – সেটি হল বাংলাদেশ পরমাণু কমিশনের অধীনে সাভার কমপ্লেক্সকে সত্যিকার অর্থেই পরমাণু গবেষণার সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা, যেমনটি ভারতীয় আণবিক কমিশন করতে পেরেছে সেদেশে। অন্য সাধ ছিল ব্রিটিশ (ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি) ও ভারতের মডেলে দেশে একটি জাতীয় ভৌত গবেষণাগার গড়ে তোলা

গ্রাম্যতাকে সে বহুকাল আগেই অতিক্রম করে এসেছিল। যদিও সে সমাজসচেতন, সে অর্থে রাজনীতি সচেতন ছিল, ছাত্র রাজনীতির সাথে একসময় সম্পৃক্ত হয়েছিল, কিন্তু তাহলেও ছাত্র রাজনীতি তাঁর ছাত্রত্বকে গ্রাস করে নি। সক্রিয় রাজনীতি থেকে সব সময় দূরে ছিল। ৬২'র শিক্ষা আন্দোলনে তার সরব ভূমিকা ছিল, কয়েকমাসের জন্য কারার অন্তরালেও গিয়েছিল। কিন্তু আন্দোলন শেষে ছাত্রত্বে ফিরে এসেছে, ফিরে এসেছে ল্যাবরেটরিতে। অথচ সে ইচ্ছে করলেই শেখ মণি, রাজ্জাক, রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরীর মত বাঘা বাঘা ছাত্রনেতা হতে পারত, সে মেধা ও মনন, সে পরিপার্শ্ব ও পরিবেশ এবং সুযোগ তাকে হাতছানি দিয়েছিল। কিন্তু ছাত্র রাজনীতির মোহ ও রোমান্টিকতা তার স্কলারশিপকে গ্রাস করতে পারে নি। ওয়াজেদ অক্লেশে ফিরতে পেরেছে ল্যাবরেটরিতে – লাইব্রেরিতে, শ্রেণীকক্ষে। পরবর্তীকালেও ড. ওয়াজেদ তার এই রাজনীতি নিস্পৃহতা বজায় রাখতে পেরেছিল। ও যে রাজনৈতিক পরিবারের সাথে যুক্ত হয়েছিল, সে চাইলে রাজনীতিতে আসতে পারত, বিশেষ করে অবসর নেবার পর। সে কিন্তু কখনও রাজনীতিবিমুখ ছিল না, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের সাথে সে ছিল আজীবন যুক্ত। পাঠকের অনেকের হয়তো মনে থাকবে যে, ১৯৯৯ সালের পর অবসরজীবন কালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সমকালীন রাজনীতি ও দেশের অবস্থা নিয়ে অনেক সুধী সমাজের সমাবেশে তার অনেক শক্ত শক্ত বক্তব্য-মন্তব্য আওয়ামী লীগ সরকারকে, বিশেষ করে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বেশ বিব্রত করেছিল। ড. ওয়াজেদ মিঞার এসব কথা তখনকার বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা ও তার দলের অর্বাচীন নেতা-কর্মীরা সরসে বেশ উপভোগ করতেন। আগেই বলেছি ওয়াজেদের এসব সত্য উক্তিতে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। একদিন এক আওয়ামী নেতা আমাকে সংক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'স্যার আপনার ছাত্র ড. ওয়াজেদ এসব কী শুরু করেছেন? ওকে একটু সামলান। যেন ওয়াজেদ কচি শিশু!' আওয়ামী লীগ অবশ্য তাদের নিজের মত করে ওকে সামলিয়েছিল। এর পর থেকে ওয়াজেদকে আর জনসমক্ষে বেশি দেখা যেত না। মোটামুটি নিভৃতচারীই হয়ে পড়েছিল। অবশ্য তখন থেকে নানা অসুখে বিসুখে শরীরটাও ভাল যাচ্ছিল না।

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত ওয়াজেদ ছিল ষাটের দশকের গোড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় আমার শিক্ষকতা জীবনের প্রথম দিকের ছাত্র। সম্ভবত ১৯৫৮-৫৯ সালে ও পদার্থবিদ্যায় ১ম বর্ষে ভর্তি হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে ২য় বর্ষে ওদের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক ক্লাশ নিয়েছিলাম। অনার্স ও এম.এসসি দুটিতেই ও প্রথম শ্রেণী পেয়েছিল। ওদের ব্যাচটি ছিল খুবই তুখোড় ও বুদ্ধিদীপ্ত– বিশেষ করে ওদের মধ্যে চারজনের, ও ছাড়া ফরহাদ ফয়সাল, শামসুজ্জামান মজুমদার আর পার্ট ওয়ান থেকে আসা অমল, ওদের কথা আজও আমার দিব্যি মনে আছে। কাজেই মেধা তালিকায় কার কি অবস্থান ছিল আজ আর মনে নেই। সম্ভবত ও আর ফয়সাল প্রফেসর ইন্নাস আলীর সাথে এম. এসসিতে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় থিসিস করেছিল; অন্যদিকে শামসুজ্জামান মজুমদার আর অমল আমার সাথে ইলেকট্রন স্পিন রেজোন্যান্স নিয়ে কাজ করেছিল। সে দিনের চমৎকার দিনগুলোর কথা মনে পড়লে চিত্ত উদাস হয়ে ওঠে।

পাস করার পরপরই ১৯৬৩ সালে ঢাকায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত আণবিক শক্তি কেন্দ্রে ও জুনিয়র বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেয়। সম্ভবত পরের বছরই কমিশনের বৃত্তি নিয়ে লন্ডনে চলে যায় উচ্চশিক্ষার্থে। ইম্পিরিয়াল কলেজ থেকে ডি. আই. সি করে লন্ডনের ডারহাম কলেজ থেকে তাত্ত্বিক নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যায় পিএইচ. ডি করে ১৯৬৭ সালের শেষ দিকে দেশে ফিরে ঢাকায় আণবিক শক্তি কেন্দ্রে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দিয়েছিল।

এ সময় ১৯৬৮-৬৯ গণ আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন, ছয়দফা

বাস্তবায়নের দাবিতে এবং সর্বোপরি, শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করার আন্দোলন। কেমন করে জানি এই গণ আন্দোলনে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। একজন সরকারী কর্মচারী হিসেবে সবদিক বজায় রেখে ওয়াজেদ গোপনে গোপনে এই আন্দোলনের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করতে থাকে। কমিশনের বিজ্ঞানীদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলে।

২৫শে মার্চের ক্র্যাক ডাউনের পর মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস কাল শেখ পরিবারের সাথে ওয়াজেদকেও অবরুদ্ধ ঢাকায় বন্দী জীবন যাপন করতে হয়েছিল।

সফল গবেষকের পাশাপাশি ড. ওয়াজেদ ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ পদার্থবিদ্যা সমিতির ও পেশাজীবী বিজ্ঞানীদের সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, এছাড়া অনেক জনকল্যাণমূলক সংগঠনের সাথেও সে যুক্ত থেকেছে।

নিউক্লিয় পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে দেশে বিদেশে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। যতদূর জানি, নিউক্লিয়াসের গড়ন ও নিউক্লিয় বর্ণালী বিষয় ছিল তার গবেষণার বিষয়। দেশে বিদেশে প্রকাশিত তার গবেষণা প্রবন্ধগুলি বিদগ্ধ মহলের প্রশংসা পেয়েছিল। সেদিক থেকে তাঁকে আমরা আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানী হিসেবে চিহ্নিত করতেই পারি। কর্মজীবনে গবেষণার পাশাপাশি সে প্রথমে ঢাকা আণবিক শক্তি কেন্দ্রের পরিচালক এবং পরে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিল। এই পদ থেকেই সে ১৯৯৯ সালে অবসর গ্রহণ করে ৫৭ বছর বয়সে। অবসর গ্রহণের মাস কয়েক আগে ও এসেছিল আমাদের ল্যাবে রসায়নবিদ খন্দকার মোকররম হোসেনের স্মৃতিতে তৈরি মোকররম হোসেন বিজ্ঞান ভবনে। প্রসঙ্গক্রমে বলেছিল, 'আমি ২/১ মাসের মধ্যে অবসরে যাচ্ছি, তখন অনেক সময় পাব গল্প করার, বই লেখার, স্মৃতি চারণের।' আমি রসিকতা করে বলেছিলাম, 'তোমার অসুবিধা কি ? তুমি চাইলে যতদিন খুশি কমিশনের চেয়ারম্যান থাকতে পার। তোমার স্ত্রী প্রধানমন্ত্রী।' ওয়াজেদ নিশ্চুপ ছিল। আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। না, ওয়াজেদের চাকরির এক্সটেনশন হয় নি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে থাকা আওয়ামী লীগ সরকার তা করে নি, যদিও বিজ্ঞান মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাব এসেছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। এটি ভাল না খারাপ হয়েছে সে প্রসঙ্গে যাওয়ার অবকাশ নেই, এ প্রবন্ধে। শুধু এটুকু বলি যে, ড. ওয়াজেদের আগেও কমিশনের কোনো চেয়ারম্যানের চাকরির এক্সটেনশন হয় নি। তখনকার প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই ঐতিহ্যটি অতিক্রম করেন নি।

গবেষণার পাশাপাশি সে বেশ ক'টি উন্নত মানের পাঠ্য-পুস্তক রচনা করেছিল। স্মৃতি থেকে যতদূর মনে পড়ে সেগুলি হচ্ছে :

1. Fundamentals of Electricity and Magnetism
2. Fundamentals of Thermodynamics
3. Elements of Nuclear Physics
4. Super Conductivity

প্রথম দুটি পুস্তক বি. এসসি অনার্স স্তরের। দ্বিতীয় বইটি তার নিজের ক্ষেত্রের। ৪র্থ বইটি তার শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে না। এটি লেখার পেছনে একটি ছোট্ট শানে নজুল আছে। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে হঠাৎ করেই পশ্চিমের একটি দেশে উচ্চ তাপমাত্রায় এক ধরনের সিরামিক কমপ্লেক্সে অতিপরিবাহিতা আবিষ্কৃত হয় এবং সাথে সাথেই বিস্ময়ের সাথে সারা বিশ্বে এই গবেষণা ছড়িয়ে পড়ে। আমার পরম সুহৃদ ও সহকর্মী বিশিষ্ট বস্তুবিজ্ঞানী ড. সুলতান আহমদের উৎসাহে আমরা দু'জনে আমাদের গবেষণাগারে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করি এবং সাত আট মাসের মধ্যেই সাফল্য আসে। ড. ওয়াজেদ তখন সম্ভবত ঢাকা আণবিক কেন্দ্রের পরিচালক। কয়েকদিন পরে আমি তাকে বিষয়টি জানালে ও সোৎসাহে আমাদের ল্যাবে আসে। এ থেকেই তার উৎসাহ জাগে অতিপরিবাহিতার ক্ষেত্রেও। তারই ফলে অতিপরিবাহিতার ওপর একটি চমৎকার বই।

আগেই বলেছি ওর সাথে ছিল আমার প্রীতির সম্পর্ক। ও মাঝে মাঝেই চলে আসত আমাদের ল্যাবরেটরিতে, সাথে নিয়ে আসত মাঝে মাঝে ওর দু' একজন জুনিয়র বিজ্ঞানী। ওদের গবেষণা কর্মে সহায়তা দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করত। ফলে আণবিক কেন্দ্রের সাথে আমাদের ল্যাবের একটি সহযোগিতামূলক হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওর কেন্দ্রের বেশ ক'জন বিজ্ঞানী আমার তত্ত্বাবধানে এম. ফিল., পিএইচ. ডি. করেছিল। শেষের দিকে ও আর আসতে পারত না, তবে ছাত্র-ছাত্রী পাঠাত। ও তখন কমিশনের চেয়ারম্যান। দেখা হলেই বলতো, 'স্যার এখন আমি সারাদিন ফাইলের নীচে ডুবে থাকি।'

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সময় শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে নিয়ে ড. ওয়াজেদ মিঞা জার্মানীতে একটি গবেষণা ফেলোশিপ নিয়ে অবস্থান করছিল। এর ফলে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে তাঁরা বেঁচে যান। পরবর্তীকালে ওয়াজেদ শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের দিল্লীতে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেশে তখন বৈরি

পরিবেশ শেখ পরিবারের জন্য। ভারত সরকারের এই বদান্যতার কথা ওয়াজেদ একাধিকবার কৃতজ্ঞতার সাথে আমার কাছে উল্লেখ করেছে। জাতির জনকের সপরিবারে মৃত্যুর পর, ওয়াজেদের ওপর একটি অলিখিত দায়িত্ব পড়েছিল শেখ পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যদের রক্ষা করা। ড. ওয়াজেদ মিঞা এ গুরুদায়িত্ব সাফল্যের সাথে পালন করেছিল, এজন্য জাতির তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আমার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সবসময় উষ্ণ ছিল, ছিল স্নেহসিক্ত; ও আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত যা তার কথোপকথনে প্রকাশ পেত। ড. ওয়াজেদের সাথে আমার শেষ দেখা হয় বছর দুয়েক আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে। বঙ্গবন্ধু কন্যাকে সেনা সমর্থিত ড. ফখরুদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেদিন বন্দী করে, তার ৩-৪ দিন পরে ড. ওয়াজেদ গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি সেখানে তার সাথে দেখা করি। মুমূর্ষু এবং প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ২/১টি কথা হয়েছিল মাত্র। দুর্বল শরীরে মাথায় হাত দিতেই চোখ মেলে তাকিয়ে আমাকে ওয়াজেদ বলেছিল, "স্যার, আপনি এসেছেন ? আমার জন্য দোয়া করবেন।" এই ছিল তার সাথে আমার শেষ কথা। এবারও স্কয়ার হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু বোধ্য কারণেই দেখা সম্ভব ছিল না।

অনেকবার ভেবেছিলাম দীর্ঘদিন ধরে জটিল রোগে আক্রান্ত প্রিয় ছাত্রটিকে দেখতে যাব, কিন্তু সুধাসদনের বেড়া ডিঙিয়ে সেখানে পৌঁছানো আমার মত নিরীহ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাই বিরত থেকেছি। আমার কেমন যেন সব সময় মনে হতো সুধাসদনের রাজনৈতিক ডামাডোলে ও অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী নেতাদের সমারোহে এই নিভৃতচারী মানুষটি বড্ড একা, অসহায় না হলেও, বড্ড নিঃসঙ্গ।

২৫শে মার্চের পাক আর্মির ক্র্যাক ডাউন পরবর্তী একটি ঘটনার উল্লেখ করে আমার এই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় দাড়ি টানব। যতদূর মনে পড়ে দিনটি ছিল মার্চের ৩০ বা ৩১। পাক আর্মির ভয়ে আত্মগোপন করে ইস্কাটনে আমার এক ছাত্রের বাসায় আশ্রয় নিয়েছি। রাত সাড়ে আটটার দিকে সান্ধ্য আইন আবার বসবে- তাই সিগারেট কিনতে এক গলির দোকানে উপস্থিত হয়েছিলাম। সেখানেই অপ্রত্যাশিতভাবে ওয়াজেদের সাথে দেখা- দুজনে দুজনকে দেখে ভূত দেখার মত অবস্থা। "স্যার আপনি এখানে ?" আমার হতভম্ব প্রতিক্রিয়া, "ওয়াজেদ তুমি ?" সেও সিগারেট কিনতে বেরিয়েছিল। কাছেই শেখ হাসিনাকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। দুজনেই দুজনকে সাবধান করে বললাম "এভাবে বের হওয়াটা ঠিক হয় নি।" জোর করে বাসায় নিয়ে গেল, "বঙ্গবন্ধু কন্যা হাসিনাকে দেখে যাবেন না।" হাসিনা তখন আসন্ন প্রসবা। জোর করে চা খাওয়ালো ঐ দুঃসময়েও। সপ্রতিভ তরুণী হাসিনাকে আশীর্বাদ করে তার শুভকামনা করে দ্রুত ডেরায় ফিরে এলাম, কারণ কারফিউ সমাগত। সেদিনই শেখ হাসিনাকে প্রথম দেখলাম। সেদিন কী ভেবেছিলাম এই সপ্রতিভ মেয়েটিই হবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ?

শেষ কথা

আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন মহল থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, তার নামে দেশে একটি বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা করা হোক। প্রস্তাবকারীরা কি জানেন তাঁরা কী চাইছেন? ঐ প্রস্তাবিত ভবনে কী থাকবে ? এ প্রসঙ্গে আমার একটি ছোট্ট প্রস্তাব আছে, তাহলো- কমিশনের চেয়ারম্যান হওয়ার আগ পর্যন্ত ড. ওয়াজেদ মিঞা ঢাকা আণবিক শক্তি কেন্দ্রের সাথে, এর গবেষণার সাথে, সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল সেই বিজ্ঞানী জীবনের শুরু থেকে। জীবনের শেষ দিকে এই কেন্দ্রের পরিচালকও হয়েছিলেন। আণবিক শক্তি কমিশনের অধীনে 'ঢাকা আণবিক শক্তি কেন্দ্রটিকে' তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা হোক : "ড. ওয়াজেদ মিঞা ঢাকা পরমাণু কেন্দ্র"। এতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়।

প্রসঙ্গত দুটি কথা বলি। ওয়াজেদেরও একটি স্বপ্ন সাধ ছিল- সেটি হল বাংলাদেশ পরমাণু কমিশনের অধীনে সাভার কমপ্লেক্সকে সত্যিকার অর্থেই পরমাণু গবেষণার সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা, যেমনটি ভারতীয় আণবিক কমিশন করতে পেরেছে সেদেশে। অন্য সাধ ছিল ব্রিটিশ (ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি) ও ভারতের মডেলে দেশে একটি জাতীয় ভৌত গবেষণাগার গড়ে তোলা, এটি আমারও দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সাধ- যেখানে দেশের বরেণ্য বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য সকল সুযোগ ও সুবিধার অস্তিত্ব থাকবে। এ নিয়ে ওয়াজেদের সাথে নানা সময়ে দীর্ঘ আলোচনা হতো। আমি এই বয়সেও এর জন্য কাজ করতে রাজি আছি।

শিক্ষক হয়ে প্রিয় ছাত্রের শোকগাথা লিখতে হবে কোনদিন ভাবি নি। ক্ষমতার খুব কাছাকাছি থেকেও ক্ষমতা তাকে স্পর্শ করে নি - ক্ষমতা থেকে দূরে থাকা এই সুন্দর মানুষটির কথা হয়তো কোনোদিনই ভুলব না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি রইল আমার গভীর সমবেদনা ও অন্তরের ভালবাসা। তাঁর সাফল্য কামনা করি। একটু দুর্বলতা তো থাকবেই, কারণ তিনি বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর কন্যা।

হাবিব তানভীর
ভারতীয় নাট্যের কিংবদন্তি

বিপ্লব বালা

উপমহাদেশীয় নাগরিক থিয়েটার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই সংকটটি বুঝছিল; উপনিবেশ-সূত্রে প্রাপ্ত নাট্য-আঙ্গিকটি স্বদেশে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত নানা নাট্য-ধরন-রীতির সঙ্গে ঠিক সাযুজ্যপূর্ণ নয়। ফলে অভিনেতা-নাট্যকার-নির্দেশক-দর্শক সকলেই এক মৌলিক অভাববোধ জ্ঞাত কি অজ্ঞাতসারে করছিল। যদিচ নবলব্ধ ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতি নতুন এক নাগরিক সমাজের পত্তন ঘটাচ্ছিল; তাতে অধিকাংশ তৃপ্ত-আচ্ছন্নও থেকেছিল দীর্ঘকাল। স্বদেশের সঙ্গে বিভেদ-বিচ্ছেদের অনতিস্পষ্ট প্রক্রিয়া বিষয়ে তত অবহিত তাঁরা ছিল না বা থাকলেও তাদের এই নবীন-উন্মাদনা হয়ত তেমন ব্যাহত হতো না।

তবে বাংলা থিয়েটারে প্রাথমিক পর্যায়েই বিষয়টি অনুধাবন করতে দেখা যায়। মনমোহন বসু এবিষয়ে মুখ খোলেন সবার আগে। বিষয় ও রীতিতে কী করে এই নতুন খেলনা আমাদের হয়ে উঠতে পারে তাঁর নানা নিদান খুঁজে ফেরেন। দুই মহাকাব্যের উত্তরাধিকারকে তিনি সর্বাগ্রে বিষয়-ভাণ্ডার হিসেবে শনাক্ত করেন। স্বদেশীয় যাত্রার বিবিধ উপাদানে ভূষিত করতে চান প্রয়োগ রূপায়ণ প্রকরণ। যাতে জাতীয় যৌথমানস একটা স্বাবলম্বন পেতে পারে। গিরিশচন্দ্রের ভাষ্য ছিল : দর্শকের মর্মাশ্রয় করতে হলে ধর্মাশ্রয় করা চাই। ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের সামাজিক পটভূমি নিশ্চয় এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর সমূহবিপদ অবশ্য পরে টের পাওয়া যায়। সেটা যদিও ঐতিহাসিক অনিবার্য বাস্তবতাই ছিল। তবে এ তো অন্য প্রসঙ্গ।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী অনেক পরে, গতশতকের পঞ্চাশের দশকে জাতীয় নাট্য আঙ্গিক বলে যাত্রার কথা তোলেন। যদিও তাঁর কোনো প্রয়োগ-রূপায়ণ করতে পারেন নি তিনি। তবে তিনি ছিলেন মিশ্র কলামাধ্যম হিসেবে নাট্যের এক সমন্বিত আদলের প্রথম রূপকার। নাগরিক থিয়েটারের প্রথম নির্দেশকও ছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথই বিষয়টিকে সমগ্রভাবনায় অনুধাবন করে তাঁর সৃজনশীল আখ্যান রচনা করেছেন বিবিধ বিচিত্র রূপ-রূপান্তরে মাহাত্ম্যে। উত্তরাধিকারের মানস ধারাপাতের অঙ্গাঙ্গী সংলগ্নতায়। তিনিই তো আমাদের প্রথম এবং প্রধান

জাতীয় নাট্যকার।

চল্লিশের দশকে গণনাট্য সংঘ সন্ধান আর সূত্রপাত করে আরেক পন্থার। গ্রাম-নগরের এক বিনিময় মিথস্ক্রিয়ায়। উপমহাদেশজুড়ে নাট্যের এক বিচিত্রবীর্য স্বদেশ যাত্রার উদ্বোধন তাতে ঘটে। যদিও পতন-বন্ধুর সে যাত্রাপথ।

গতশতকের চল্লিশের দশকের শেষ থেকে উপমহাদেশে 'গ্রুপ থিয়েটার' চর্চার সূত্রপাত ঘটে। শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাট্যের প্রয়োগ-রূপায়ণে সম্ভব করে তোলেন এক মুক্তধারা। সেই সূত্রে তিনি ক্রমে সংহত হন ভারতীয় নাট্যের এক অভিভাবনায়। ষাটের দশক থেকে এই ভাবন-বীজ উপমহাদেশজুড়ে রোপিত, ব্যাপ্ত প্রয়োগধারাপাত ঘটায়। উৎপল দত্তও যাত্রায় উৎসাহী হন ক্রমে। হাবিব তানভীর এই পটভূমিতে তাঁর নাট্যচর্চায় সম্ভাবনাময় এক প্রয়োগ রূপায়ণ সম্পন্ন করেছেন। ভারতের নানা অঞ্চলে গ্রাম-শহরের বিচ্ছেদ বাস্তবতা বিবিধ, ভিন্নতর। ভারতীয় সংগীত-নাটক আকাদেমি ১৯৭১ সালে ট্র্যাডিশনাল থিয়েটার নিয়ে এক গোলটেবিল আয়োজন করে। তাতে নানা রাজ্যের দিকপাল নাট্যজন মতবিনিময় করেন। সংস্কৃত ধ্রুপদী নাট্য, নানা অঞ্চলের লোকায়ত রীতিসমূহের সঙ্গে নাগরিক নাট্যের সম্পর্কসূত্র ও তাঁর প্রয়োগ ভাবনা নিয়ে যেসব নিরীক্ষা চলছিল সেই অভিজ্ঞতা এতে উঠে আসে। হাবিব তানভীর বলেন– স্বদেশীয় যে-কোনো আঙ্গিক বেছে নেয়া যায় যাতে অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রকাশ পেতে পারে নাগরিক বিষয়-ভাবনা। এর চেয়ে বেশি আর কোনো যুক্তি দেখানোর প্রয়োজন নেই। তবে কেউই পুনরাবৃত্তি পছন্দ করেন না। ১৯৫৪ সালের 'আগ্রাবাজার' প্রযোজনার পেছনেও আছে লোক সংস্কৃতির প্রেরণা। তবুও ১৯৬৪ ও ১৯৭০-এর প্রযোজনায় অনিবার্যভাবে কিছু পার্থক্য, কিছু তফাৎ থাকতে বাধ্য। ফোকফর্মের ব্যবহারে আমার যে অভিজ্ঞতা তা আমাকে জানিয়েছে প্রকৃত লোক-অভিনেতাদের দিয়ে কাজ করানোর সময় কী করতে হবে। লোক-অভিনেতাদের বাদ দিয়ে নাটকে একটা শহুরে চেহারা কেউ দিতে পারে। কিন্তু একজন শহরের নাট্যকার যদি একই ভাবনায় চলেন, লোক-ঐতিহ্যের কথাটা মাথায় রেখে, লোক-অভিনেতাদের যদি কাজে লাগান তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি অনেকবেশি সুফল পাবেন। লোক-আঙ্গিকের ছবিকে অটুট রেখে সেই আঙ্গিকের রূপান্তরণে তিনি সক্ষম হবেন অনেকবেশি। স্বভাবতই সেই আঙ্গিক আর সেই আঙ্গিক থাকে না। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুই তাঁর পরিণতি। এই তত্ত্বের ওপরে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমাদের অধিকাংশ থিয়েটারকর্মী, এমনকি অসচেতনভাবেই কাজ করে চলেছেন। 'মিট্টি, কি গাড়ি' করার সময়ে, অথবা 'আগ্রাবাজার', চাঁদনিচকের রাস্তায় আমি যখন লোকশিল্পীদের নিয়ে কাজ করি তখনই এইরকম একটি ধারণায় উপনীত হয়েছিলাম। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক নাটক কিন্তু লোক-আঙ্গিক। সংস্কৃতির মাধ্যমে আমাদের যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংযোগ সেখানে এই আঙ্গিকের কার্যকারিতা যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক। আমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আজ বিশ্বাস করি, এই পরিস্থিতিতে ঐতিহ্যবাহী নাট্য-আঙ্গিকগুলিকে আরও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে রাজনৈতিক ও সামাজিক নাটকে।

হাবিব তানভীর ১৯৪৫ সালে বোম্বের গণনাট্য সংঘে একজন অভিনেতা হিসেবে যোগ দেন। সংঘের নেতৃস্থানীয়জন বৃটিশ বিরোধিতার কারণে কারারুদ্ধ হলে তাকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯৪ সালে নয়াদিল্লির হিন্দুস্থানি থিয়েটারে যোগ দেন। একই সঙ্গে চিলড্রেন থিয়েটারেও কাজ করেন, সেখানে প্রচুর নাটক লেখেন। এসময় তিনি অভিনেত্রী-নির্দেশক মনিকা মিশ্রের সঙ্গে পরিচিত হন, পরে তাদের বিবাহ হয়। ১৯৫৪ সালেই তাঁর প্রথম বিশিষ্ট প্রযোজনা 'আগ্রাবাজার' মঞ্চস্থ হয়। এই নাট্যে তিনি স্থানীয়জন এবং দিল্লির ওখলা গ্রামের লোকশিল্পীদের যুক্ত করেন। জামিয়া মিল্লা ইসলামিয়ার ছাত্রেরা যোগও দেয়। এই সমন্বয়ও ভারতীয় থিয়েটারে প্রথম দেখা গেল। কোনো নির্দিষ্ট মঞ্চে নয় অভিনয় একটি বাজারে অনুষ্ঠিত হয়। অদীক্ষিতজন এবং লোকশিল্পীদের এই অভিনব সমন্বয় পরে পরিণতি পায় ছত্তিশগড়ের লোকশিল্পীদের যুক্ত করে। ১৯৫৫ সালে তিনি ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত রয়েল একাডেমি (RADA)- তে অভিনয় বিষয়ে শিক্ষা নেন। নির্দেশনার পাঠ নেন ১৯৫৬ সালে ব্রিস্টল ওল্ড ভিক্টোরিয়া থিয়েটার স্কুলে। পরবর্তী দু'বছর তিনি ইউরোপের নানা নাট্যক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন।

১৯৫৬ সালে তিনি বার্লিন যান ব্রেশটের মৃত্যুর কিছু পরে; সেখানে তিনি ৮ মাস ধরে বার্লিন এনসেম্বল-এর নানা নাট্যপ্রযোজনা দেখেন। এটা তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। নাট্যকর্মে স্থানীয় নাট্যবাচন যুক্ত করার ক্ষেত্রে এটা পরবর্তীকালে তাকে সহায়তা করে, নানা সংস্কৃতির উপকথা ও মতাদর্শ নাট্যে ধারণ করার সৃজনবুদ্ধি খুঁজে পেতেও। উপস্থাপনা ও প্রয়োগকলায় সারল্য অর্জন করে, নিরীক্ষায় যথা-সামর্থ্য লাভ করেন তিনি। গভীরভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে হাবিব তানভীর ১৯৫৮ সালে দেশে ফেরেন এবং নাট্য-নির্দেশনা সার্বক্ষণিক ক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেন। শূদ্রক-এর 'মৃচ্ছকটিক' অবলম্বনে 'মিট্টি কা গাড়ি' ছত্তিশ-গড়ি রীতিতে নির্মাণ করেন। ৬ জন লোকশিল্পী এতে কাজ করেন। এরপর আর তিনি পেছনে ফিরে তাকান নি। মধ্যপ্রদেশের ভূপালে ১৯৫৯ সালে পত্তন করেন 'নয়া থিয়েটার'।

১৯৭০-৭৩ ছিল তাঁর প্রয়োগ-নিরীক্ষাকাল। তাঁর সকল প্রযোজনায় হিন্দী ও ছত্তিশগড়ি ভাষার যুগপৎ ব্যবহার শুরু হয়। স্থানীয় লোকসংগীত রীতি 'পাওবাণী' নিয়েও তিনি কাজ করেন। ১৯৭২ সালে ছত্তিশগড়ি নাছরীতিতে 'গাঁও কা নাম শ্বশুরাল' প্রযোজিত করেন। ১৯৭৫ সালের 'চরণদাস চোর' ভারতীয় নাগরিক থিয়েটারে অভিনব এক নাট্যবাচন হিসেবে পরিগণিত হয়। নাটকটি শ্যাম বেনেগালের পরিচালনায় চলচ্চিত্রায়িত হয়। এছাড়া তিনি ৯টি চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করেন। আটেনবোরার 'গান্ধী', 'ব্ল্যাক এ্যান্ড হোয়াইট' প্রভৃতিতে।

বাবরী মসজিদ ভাঙ্গন-পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে ধর্মীয় প্রতারণামূলক ঐতিহ্যবাহী ছত্তিশগড়ি নাটক 'পোঙ্গাপণ্ডিত'-এর নবভাষ্য তুমুল প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে। যদিও তিরিশের দশকে ছত্তিশগড়ি থিয়েটার আর্টিস্ট লোককথা-নির্ভর এই নাটক করেছিল এবং তিনিও এটি ষাটের দশক থেকে করে আসছিলেন। সাম্প্রদায়িক সংগঠন আর. এস.এস. নানা জায়গায় এই নাট্যের প্রদর্শনীতে বাধা দেয়।

১৯৯৩ সালে শেকসপীয়রের 'এ মিড সামার নাইট'স ড্রিম' এর নবভাষ্য 'কামদেওকা আপনা বসন্ত ঋতু কাণ্ড স্বপ্ন' অভিনীত হয়। চিকাগো অ্যাক্টরসর এসেম্বল-এর আমন্ত্রণে ১৯৯৫ সালে তিনি আমেরিকায় তাঁর একমাত্র ইংরেজি নাটক 'The Broken Bridge' মঞ্চস্থ করেন। ২০০২ সালে ভূপাল গ্যাস ট্রাজেডি নিয়ে রাহুল ভার্মা রচিত 'জহরলি হাওয়া' নির্মাণ করেন।

সমগ্র নাট্যজীবনে তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিবিধ ঐতিহ্য উপস্থাপন করেন। সংস্কৃত নাট্যকার শূদ্রক, ভাস, বিশাখ দত্ত, ভবভূতি যেমন, তেমনি ইউরোপীয় ধ্রুপদী শেকসপীয়র, মলিয়ের, গলডনি ; আধুনিক মহান ব্রেশ্‌ট, লোরকা, গর্কি, অস্কার ওয়াইল্ড ; ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ, আসগর ওয়াজাহাট, শংকর মেনন, সফদর হাসমী, রাহুল ভার্মা, প্রেমচাঁদের গল্প। ছত্তিশগড়ি লোককথা তো বটেই।

তাঁর জীবন ও নয়াথিয়েটার নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি নির্মিত হয়– 'গাওন কে নাওন থিয়েটার। মোর নাওন হাবিব'।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও নাটক 'বিসর্জন' অবলম্বনে তাঁর রচনা ও নির্দেশনায় প্রযোজিত হয় 'রাজরক্ত' ২০০৬ সালে। তিনি তাঁর আত্মজীবনী রচনা করছিলেন উর্দুভাষায়। এমতকালে ২০০৯ সালের ৮ই জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হাবিব তানভীর সংগীত নাটক আকাডেমি পুরস্কার পান ১৯৬৯ সালে, পদ্মশ্রী ১৯৮৩ সালে, কালিদাস সম্মান ১৯৯০-এ, সংগীত নাটক আকাডেমি ফেলোশিপ ১৯৯৬-এ, পদ্মভূষণ পান ২০০২-এ। ১৯৮২ সালে 'চরণদাস চোর' এডিনবরা আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে ফ্রিন্‌জ ফার্স্টস এওয়ার্ড অর্জন করে। ২০০৭ সালে ব্রেশ্‌টও লোকপ্রকরণের সমন্বয়ে অভিনব নাট্যবাচন উদ্ভাবনায় তাঁকে সম্মাননা দেয়া হয়।

উপনিবেশ-উত্তর ভারতীয় থিয়েটারের নাগরিক স্বদেশী বাচন আবিষ্কারের দায়পালনের অভিযাত্রায় হাবিব তানভীর অমিত এক সৃজন-কর্তা। তাঁর স্বীকৃতি বিশ্ব জুড়েই ঘটেছে। তবে নিছক কোনো জাতীয়তাবাদী প্রণোদনায় তা সম্পন্ন হয় নি। স্থানীয় ছত্তিশগড়ি নানা রীতির ভূমিতে সংলগ্ন হয়েই বিশ্বের নাট্য-উত্তরাধিকার আত্মস্থ করে তাঁর সৃজনশীল উদ্ভাবন অভিনব এক ভারতীয় আন্তর্জাতিক নাট্যভাষ আয়ত্ত করেছে। মুক্ত এক নান্দনিক মনন প্রবর্তনায়ই তা অর্জিত হয়েছে। ভাষার বন্ধনও যেন অনায়াসে উত্তরিত হয়েছে নাট্যের অমিত সামর্থ্যে। আঙ্গিকের কোনো জাত্যাভিমানে উদ্বেসিত হয় নি তো তাঁর সৃজনকল্পনা। নাগরিক নানাভাষী দর্শকসাধারণ তাই গ্রহণ করতে পেরেছে সে সকল নাট্য। রাজনৈতিক সামাজিক এক দায়বদ্ধতায় বহুতর ভোক্তা সংযোগের অভিপ্রায় থেকেই তাঁর এই স্বদেশীয় নানারীতির সৃজননিরীক্ষা। গণনাট্য সংঘের মৌল জনসম্পৃক্তির এষণা তাই আধুনিক কোনো সৌখিন আঙ্গিকবিলাসে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে নি। বাংলাদেশে যেমন দেখি, দেশজ আঙ্গিক সৃজনের ঘোষণা উপেক্ষা করে চলে দর্শকসাধারণের সঙ্গে বিনিময় সহযোগের প্রাথমিক দায়। অনায়াসে ঘোষিত হয়– কোনো দর্শক তাঁর আর অন্বিষ্ট নয়–এমনি সৃজনবিলাস ক্রমস্ফীত বাংলাদেশের মঞ্চে। দেশ-সমাজ-সময়-দর্শক কিছুই যেন আর তত বিবেচ্য থাকছে না।

আমরা ঢাকায় তাঁর 'আগ্রাবাজার' ও 'চরণদাস চোর' দেখি নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের এক উৎসবে গতশতকের শেষ দশকে। অচেনা এক জনসমাজ, আমাদের অজানা ভাষায় মঞ্চে প্রবল জীবন্ত বাঙ্ময় হয়ে ওঠে মানবিক ক্রিয়াদির বিচিত্র স্বর-সুর, চলন-বলনের ক্ষিপ্রতায়। চলচ্চিত্রের মতোই যেন এক আন্তর্জাতিক নাট্যভাষার নন্দন আস্বাদ তাতে করা গেল।'আগ্রাবাজার' যেন বা প্রাকৃতিক স্বতঃস্ফূর্ততায় সামাজিক নাট্য আখ্যান হয়ে ওঠে। 'চরণদাস চোর' লেকবাচনমুদ্রায়, ক্ষিপ্র নাট্যগতির তুখোড় উপস্থাপনে বিহ্বল করেছিল।

মনে হয়, উপমহাদেশে বাঙালি অধিক পরবাসিতায় বিচ্ছিন্ন। ভারতীয় নানা রাজ্য-অঞ্চলের নাগরিকজন তুলনায় সম্পৃক্ত স্বদেশীয় সংস্কৃতি মানসে। নান্দনিক যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া তাই বুঝি সম্ভব হয়েছে। তাঁর পেছনে রাজনৈতিক নান্দনিক দায়ের শক্ত পাটাতন ছিল যে। বাঙালি সত্যিই বুঝি বাগাড়ম্বতায় যত পটু, নানা তত্ত্বনীতি ঘোষণায় তত পারঙ্গম। জনমানসযুক্ততায় তার কোথাও মৌলিক গলদ, খামতি কিংবা অন্তঃসারশূন্যতা বুঝি রয়েই গেছে। কলকাতার বাঙালির উচ্চম্মন্যতা গত শতকের আশির দশকে সর্বভারতীয় নাট্যসিদ্ধি দেখে প্রথম ধ্বসে পড়ে। হুঁশ ফেরে। আর আমরা আত্মমগ্ন অন্ধ উটপাখি, নাকি আজিকার বাজারিদাসত্ব চাতুর্যে ডগমগ স্বেচ্ছাবন্দি?

অন্ধকারে আলোর চিঠি

এ জেড এম আবদুল আলী

বইটি হাতে নিয়ে এক ধরনের ক্ষোভ, দুঃখ আর তিক্ততায় মনটা ভরে উঠে। কেন এত প্রাণ দেওয়া হয়েছিল একাত্তরে? কি কারণে এত পিতামাতা সন্তান হারিয়েছিল, স্ত্রী স্বামী হারিয়েছিল, বোন ভাই হারিয়েছিল, নারী লাঞ্ছিত হয়েছিল? *প্রথম আলো* পত্রিকা এবং গ্রামীণ ফোনের যৌথ উদ্যোগে সংকলিত ও প্রথমা প্রকাশিত 'একাত্তরে চিঠি' বইটি নিয়ে আমার তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া এই। মাত্র কয়দিন আগেও রাজাকার এবং যুদ্ধাপরাধীগণ বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে গাড়ি চড়ে বেড়িয়েছে। বিএনপি ও চারদলীয় জোট আবার ক্ষমতায় এলে আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। এ বইটি তখন নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে। এ সেদিনও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক উপদেষ্টা তাঁর বইতে লিখলেন, "২০০০ ইং সালে জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারীকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের ফলে কথিত বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের নাচা-নাচি ও হৈ-হুল্লোড়ের মাত্রা অনেকাংশে বেড়ে যায়, উলুধ্বনিসহকারে এবং রাধাকৃষ্ণের সাজে সজ্জিত হয়ে এ

দেশের মুসলমান তরুণ-তরুণীদের আনন্দ মিছিল চলতে থাকে দেশব্যাপী, দিনের পর দিন। এছাড়া বাঙালি ঐতিহ্যের নামে মঙ্গল প্রদীপ, রাখিবন্ধন, সিঁথিতে সিঁদুরসহ নানাবিধ হিন্দুয়ানী সামাজিক আচার-আচরণকে আমাদের তরুণ প্রজন্মের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে। একই সাথে সূক্ষ্মভাবে ওপার বাংলার বিধর্মীদের সাথে মুসলিম তরুণীদের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে। বর্তমানে তা মুসলমান নামধারী মহিলা শিল্পীদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলে তার ক্ষেত্র অচিরেই আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। ফলে সেদিন হয়তো খুব দূরে নয়, যখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা আমাদের দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সর্বোপরি আমাদের মুসলিম পরিচিতিকে মুছে ফেলার জন্য যেমন সোচ্চার হবে, তেমনি '৪৭-এ ভারত বিভক্তির পূর্বাবস্থায় এদেশকে নিয়ে যাবার জন্য তারা আরও বেশি মাত্রায় তৎপর হবে।"

এইসব লেখা পড়ার পর আমার দুঃখ আর ক্ষোভকে কেউ কি অন্যায় বলতে পারবেন? বইটি হাতে নিয়ে তাই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। অবশেষে প্রচ্ছদের পাতা উল্টাতেই চোখে পড়লো, বইটি সম্পাদনা পর্ষদের প্রধান হচ্ছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সালাহ্উদ্দিন আহমদ। সদস্যগণে রয়েছেন বন্ধুবর রশীদ হায়দার, সেলিনা হোসেন, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু এবং আমিন আহম্মেদ চৌধুরী। একটি দুটি করে চিঠিগুলি পড়তে শুরু করলাম। কি মর্মস্পর্শী এক-একটি চিঠি! স্ত্রীকে লেখা, বাবা-মাকে লেখা, বন্ধুকে লেখা এক একটি চিঠি পড়তে পড়তে একাত্তর আবার চোখের উপর ভেসে উঠল। এই তো সেদিন চট্টগ্রামে, আমার তিন-দিন বয়সী পুত্রসন্তানকে কোলে নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর কথা মনে পড়ে গেল। স্ত্রী পুত্রকন্যাকে ঢাকাতে পাঠিয়ে যেখানে স্থিতু হয়েছিলাম সেই আসকার দীঘির অল্পদূরেই ছিল চট্টগ্রামের সার্কিট হাউস, যার উপরে উড়তো পাকিস্তানের পতাকা এবং ভিতরে ঘরে ঘরে হতো নির্যাতন এবং বাঙালি হত্যা। অসাধারণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও রোজ সকালে ওই পতাকাটির দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম একদিন সেখানে ওই পতাকার বদলে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়বেই। নয় মাস সেই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে এক চুলও সরে আসি নি। এবং সত্যিই একাত্তরের সতেরই ডিসেম্বর (ঢাকায় ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করলেও চট্টগ্রামে ১৭ই ডিসেম্বরের সকালের আগে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠে নি) ওই সার্কিট হাউসের ভিতরে দাঁড়িয়ে নিজ চোখে এক তরুণকে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে এনে সেটাকে সকলের সামনে পোড়াতে দেখেছি।

বইটি আবার হাতে নিলাম। প্রচ্ছদেই ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগের সাথে মিলে আছে জহির রায়হানের দস্তখত। মনটা কেমন করে উঠল। বিশ্ববিদ্যালয়ে জহির আমার এক ক্লাশ নিচে পড়লেও ওদের দলের আনিসুজ্জামান, নেয়ামাল বাসির, সৈয়দ আহমদ হোসেন, জহির রায়হানের সাথে আমার সখ্য গড়ে উঠেছিল সবচাইতে বেশি। মনে আছে জহিরের সাইকেলের সামনে বসে

> "যেভাবে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, সেখানে আমাদের বেঁচে থাকাটাই লজ্জার। আপনাদের দোয়ার জোরে হয়তো মরব না। কিন্তু মরলে গৌরবের মৃত্যুই হতো। শুয়ে শুয়ে মরার মানে হয় কি?"

অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি ঢাকা শহরে। বিশ্বাস করি আর না করি আমতলায় পুকুরের ঘাটে বসে জহিরকে আমার হাত দেখিয়েছি। ও তখন পামিস্ট্রিতে উৎসাহী। পরে অবশ্য জহির সিনেমার দিকে চলে যাওয়ার পর বেশি যোগাযোগ হতো না। 'একাত্তরেব চিঠি'গুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁরা আমার সবচাইতে চেনা। আমার বুকের মধ্যে ওরা মিশে আছে আজো। প্রথম চিঠিতে লিখেছেন কাজী নুরুন্নবী। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাতেই এই তরুণ যোগ দেন যুদ্ধে। তিনি রাজশাহী থেকে তাঁর মাকে লিখছেন, "যেভাবে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, সেখানে আমাদের বেঁচে থাকাটাই লজ্জার। আপনাদের দোয়ার জোরে হয়তো মরব না। কিন্তু মরলে গৌরবের মৃত্যুই হতো। শুয়ে শুয়ে মরার মানে হয় কি?" ওই তরুণের ভাগ্যে অবশেষে একাত্তরের অক্টোবর মাসে শহীদ হওয়ার গৌরব হয়েছে। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র এই তরুণ পাকিস্তানি জল্লাদদের হাতে ধরা পড়েন অক্টোবরের ১ তারিখে। তারপর আর তাঁর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

চিঠিগুলি একটির পর একটি পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ে যায় গত মহাযুদ্ধের উপর লেখা মার্কিন লেখক নরমান মেইলারের একটি বিখ্যাত উপন্যাস 'দি নেকেড অ্যান্ড দি ডেড' এর কথা। সেখানে একটি স্বামী-স্ত্রীর কাহিনি রয়েছে। স্ত্রীটি রণাঙ্গন থেকে একটি বিশেষ টেলিগ্রামের মাধ্যমে তাঁর স্বামীর শহীদ হওয়ার খবর পাওয়ার পরও সাধারণ ডাকে পাঠানো দু-তিন সপ্তাহ ধরে তাঁর স্বামীর চিঠি পেয়ে যাচ্ছেন। 'একাত্তরের চিঠি'তেও এরকম আছে। এক মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়ে তাদের ক্যাম্পে বন্দী অবস্থাতেও কোনোক্রমে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন তাঁর মাকে। মা যখন চিঠিটা পড়ছেন তখন তাঁর ছেলে শহীদ হয়ে গেছেন। 'একাত্তরের চিঠি'র পত্রলেখকদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়ে গেছেন, তাঁদের দেহাবশেষটুকুও খুঁজে পাওয়া যায় নি। অনেকে জীবিত ফিরে এসেছেন। এরকম একজন পত্রলেখক মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা। মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সুখী জীবনযাপন করছিলেন। তারপর ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার তিন মাসের মাথায় নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আর এক অন্ধকার যুগের সূচনায় নিহত হন।

কতগুলি চিঠি স্থান পেয়েছে এই বইতে। হয়তো এর বাইরেও অনেক চিঠি লেখা হয়েছে। যথার্থই প্রকাশক লিখেছেন, বইটি 'পরিগণিত হবে ইতিহাসের এক অনন্য সম্পদরূপে।' প্রয়োজন ছিল এমনি একটি বইয়ের। কেননা ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা চলে আসছে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকেই। কে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে সেই বিতর্ক জাতিকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা বেলাল মোহাম্মদ বেঁচে থাকতেই তাঁর উপর দিয়ে এ বিষয়ে কথা বলছেন অনেকে। রাজাকার-যুদ্ধাপরাধীদের সমাজে-রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে যারা তাদের অপচেষ্টা এক দিনের জন্যও থেমে নেই। কাজেই অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বইটি। বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে এই বইটি থাকা উচিত।

আবার দৃষ্টি ফেরাই বইটির দিকে। পৃষ্ঠা ১০৪-এ দেখা যাচ্ছে, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মুশতাক এলাহীর চিঠি। চিঠিটি তিনি একাত্তরের ২৯শে নভেম্বর তারিখে লিখছেন তাঁর পিতাকে, রংপুর শহরে ধাপ অঞ্চলের বাসিন্দা খন্দকার দাদ এলাহীকে। আমি নিজে রংপুর শহরের ওই অঞ্চলের মানুষ। ক্লাশ থ্রি থেকে বিএ পাশ করা পর্যন্ত ওই অঞ্চলেই থেকেছি। তারপর চলে আসি ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এবং অতঃপর চাকরি জীবনে। এই শহীদ মুক্তিযোদ্ধা অথবা তাঁর পিতা নিশ্চয়ই আমার পরিচিত হবেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র সতের দিন আগে এই চিঠিটি লেখা। ওই সময়ে ঠিক কিভাবে তিনি শহীদ হলেন– তা জানতে পারলে ভালো হতো। পরের চিঠিটি লিখেছেন আর এক শহীদ মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট সেলিম। ইনি নভেম্বর মাসে ফেনীর বেলোনিয়া ও পরশুরাম অঞ্চল মুক্ত করে ৩০শে নভেম্বর তাঁর মাকে লিখছেন, "শিগগিরই মাগো, আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব ভেবে মনটা ভরে গেল।" এই লেখকের মনটা ভরে গিয়েছিল ঠিকই। স্বাধীনতার পর শত্রুমুক্ত দেশে ফিরে তিনি মায়ের কোল ভরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর ৩০শে জানুয়ারি মীরপুর শত্রুমুক্ত করতে গিয়ে তিনি শহীদ হন। জহির রায়হানের নিখোঁজ হওয়ার মতো একই মর্মান্তিক ঘটনা। এরা দু'জন সম্ভবত একইসাথে এবং একই দিনে মীরপুরের আত্মীয় স্বজনদের খোঁজে গিয়েছিলেন।

শেষ করব এক প্রবাসী বাঙালির একাত্তর সনকে স্মরণীয় রাখার প্রচেষ্টার কথা বলে। কানাডা প্রবাসী অঙ্কের অধ্যাপক মিজান রহমান উনিশ শ' একাত্তর সন থেকে নতুন এক সন গণনার পদ্ধতি চালু করেছেন। তিনি ওই বছরটিকে 'মুক্তিসন ১' ধরে নিয়ে তাঁর সব লেখাতে তারিখ দিচ্ছেন। তাঁর সর্বশেষ কলাম, যেটি এখন আমার হাতে রয়েছে, লেখা হয়েছে মুক্তিসন ৩৭তে (ইংরেজি সন ২০০৯)। একাত্তরে আমাদের জীবনে যে অন্ধকার এসেছিল তাকে কবির ভাষাতে বলব সে অন্ধকার ছিল 'আলোর অধিক'। বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি কবিতাগ্রন্থের শিরোনাম দিয়েছিলেন 'যে আঁধার আলোর অধিক'। একাত্তরের এই চিঠিগুলিকে তাই 'অন্ধকারে আলোর চিঠি' শিরোনাম দিয়েছি।
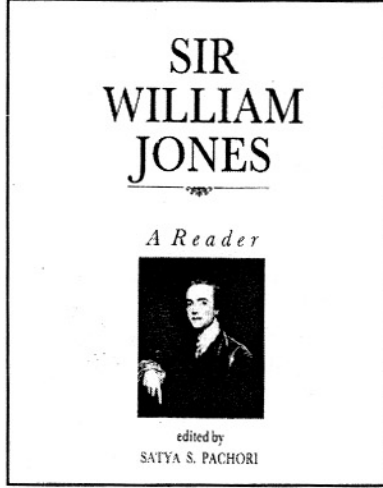
স্যার উইলিয়াম জোনস্

আবু তাহের মজুমদার

SIR WILLIAM JONES
A READER
Edited with Introduction and Notes by
Satya S. Pachori

Oxford University Press
Delhi, Oxford, New York 1993
Pages : 230

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে নিবিড় সাহিত্য-সম্পর্কের প্রথম প্রবক্তা এবং স্থপতি, অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠতম ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশারদ এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক ও কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি স্যার উইলিযাম জোনস্ তাঁর অন্তহীন জিজ্ঞাসার প্রদীপ জ্বেলে পাঠকদের জন্য খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করে যে রত্নরাজি রেখে গেছেন তা এখনকার পাঠকদের মনকেও বিস্ময়ে অভিভূত করে। ১৭৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করে এই ক্ষণজন্মা প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ১৭৯৪ সাল পর্যন্ত ফাউস্টের মতো একাগ্রতায় এবং ঐকান্তিকভাবে তাঁর জ্ঞানের পরিধিকে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করে বিশ্বমানবতার সেবায় তা নিয়োজিত করে গিয়েছেন। সেইজন্যই তিনি আজও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-সাহিত্য-সম্পর্ক প্রেমিক, বোদ্ধা পাঠক এবং মানবতাবাদীদের নিকট স্মরণীয় ও বরণীয়।

১৭৫৩ সালে তিনি হ্যারোতে পড়াশোনা শুরু করেন। তারপর ১৭৬৪ সালে পড়াশোনা শুরু করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত তিনি আর্ল স্পেন্সারের গৃহশিক্ষকতা করেন। এটি তাঁর জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল; কারণ এর ফলে তিনি স্পেন্সার পরিবারের বিখ্যাত এবং বিশাল লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করার

সুযোগ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। মেধার জন্য তিনি অক্সফোর্ডে বেনেট ফেলোশিপ লাভ করেন। ১৭৭০ সালটি তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সাল। কারণ এই সালে তিনি ডেনমার্কের রাজার বিশেষ অনুরোধে এবং ইংল্যান্ডের রাজার ইচ্ছানুসারে *History of Nadir Shah* শিরোনামে একটি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করে ডেনমার্ক এবং ব্রিটেন উভয় দেশেই খ্যাতি অর্জন করেন। ডেনমার্কের রাজা তাঁকে ডেনমার্কের রয়েল সোসাইটির সদস্য করে নেন এবং ইংল্যান্ডের রাজার কাছে তাঁর প্রশংসা করে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি পরে প্রকাশ করা হয়। এই সালেই তিনি প্রাচ্যসাহিত্যবিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখে প্রাচ্যসাহিত্যের প্রতি ইউরোপীয় সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৭৭১ সালে তাঁর *A Grammar of the Persian Language* শিরোনামে ইউরোপে প্রথমবারের মতো ফারসি ভাষার একটি ব্যাকরণ প্রকাশ করেন এবং এটিতে হাফিজের কয়েকটি গজলের অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত করেন। এগুলো পরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি পারস্য-সাহিত্য চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং এই সাহিত্য চর্চার উদাত্ত আহ্বান জানান। প্রাচ্যসাহিত্য সম্পর্কে তিনি আরও একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (*Dissertation Sur La Literature Oriental*)। ইউরোপীয়দের চোখে প্রাচ্যসাহিত্যের ছবিটি আরও উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। ১৭৭২ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *Poems, Consisting Chiefly of Translations from the Asiatic Languages* প্রকাশিত হয়। বইটিতে তিনি তাঁর দু'টি প্রবন্ধও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর একটি ছিল প্রাচ্যের কবিতা সম্পর্কিত: "An Essay on the Poetry of the Eastern Nations." এই প্রবন্ধটিতে তিনি প্রাচ্যসাহিত্যের সঙ্গে গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্যের তুলনা করেন এবং আবেগপূর্ণ ভাষায় প্রাচ্যসাহিত্যের অনুবাদের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই প্রবন্ধেই তিনি প্রাচ্যসাহিত্যের সমৃদ্ধ উপাদান দিয়ে খরাক্রান্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যকে নবজীবন দান করার আহ্বান জানান। ১৭৭৩ সালে তিনি রয়েল সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেনের এবং ড. জনসনের বিখ্যাত ক্লাবের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর প্রাচ্যসাহিত্যবিষয়ক সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী আলোচনাগ্রন্থ *Poeseos Asiaticae Commentariorum Libri Sex* ১৭৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ছয়টি অংশে বিভক্ত এবং ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত লিখিত তাঁর সকল প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্যের পুনরালোচনা করা হয় এবং সমগ্র ইউরোপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্যবিষয়ক কর্মকাণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে কবিতা লিখে তিনি তাঁর কবিখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখেন। এরই মধ্যে ১৭৮২ সালে *The Moallakat* শিরোনামে সাতটি বিখ্যাত আরবি কবিতার আরেকটি যুগান্তকারী অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটির দ্বারা তিনি ইউরোপে প্রথম আরবি কবিতার অনুবাদক হিসেবে আবির্ভূত এবং খ্যাত হন। ১৭৮৩ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় "এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" প্রতিষ্ঠা করেন এবং সোসাইটিতে বার্ষিক বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করে তিনি নিজের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মোট ১০টি ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এই কর্মকাণ্ড প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে গভীর এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। কলকাতা থেকে তিনি *দি অর্ডিন্যান্সেস অব মনু*-র অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি হিন্দুদের দেব-দেবীদের নিয়ে অনেকগুলি ওড রচনা করেন এবং এগুলোতে অনেক ভারতীয় শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি *হিতপদেশ অব বিষ্ণু-শর্মা* অনুবাদ করেন। তাঁর অন্যতম যুগান্তকারী অনুবাদ হলো জয়দেবের *গীত গোবিন্দ* এবং মহাকবি কালিদাসের *শকুন্তলা*। *শকুন্তলার* অনুবাদটি সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যমহলে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। মহাকবি গ্যেটে এবং কবি হ্যার্ডার, জোনসের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং জোনস্ সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্য প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ হিসেবে তাঁর খ্যাতিকে একেবারে শীর্ষে নিয়ে যায়। তিনি প্রাচ্যবিষয়ক দুটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর একটি হলো মুসলিম আইনবিষয়ক গ্রন্থ *আল সিরাজিয়া* এবং কালিদাসের *ঋতু সংহার* (*The Seasons*)। কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁর বিশেষভাবে আরাধ্য অনুবাদগ্রন্থ *The Ordinances of Manu* এবং *The Digest of Hindu Laws* অসমাপ্ত থেকে যায়। তারপরও কোনো অসুস্থতাই তাঁর কাজের ধারায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে নি। প্রাচ্যবিষয়ক এইসব যুগান্তকারী কর্মকাণ্ডের ফলে জোনসের খ্যাতি ইউরোপ ছাড়িয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকাতেও তিনি বিশেষভাবে খ্যাত হন। এই শেষোক্ত দেশে তাঁর খ্যাতি এমন এক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ১৭৯৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পরও এই খবর না জেনে Historical Society of Massachusetts ১৭৯৫ সালের ২৭শে জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁকে সর্বসম্মতভাবে একজন সহযোগী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে। বিচারক হিসেবে তাঁর পদমর্যাদা এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির পদ ও *Asiatic Researches*-এর সম্পাদকের পদ তাঁর লেখা এবং বক্তব্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ববহ করে।

সাহিত্যক্ষেত্রে জোনস্-এর সবচেয়ে বড় অবদান এই যে, তিনি প্রাচ্যসম্পদ ব্যবহার করে প্রতীচ্যের মন্দাক্রান্ত সাহিত্যকে উজ্জীবিত করার উদাত্ত আহ্বান জানান। আর প্রাচ্যবিষয়ক স্বীয়

মৌলিক এবং অনুবাদকর্ম দিয়ে সেই ঘোষণার প্রবল প্রবক্তা হন। তখন থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য-সম্পর্কের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। তাঁর সাহিত্যকর্ম ইংরেজি রোমান্টিক ও ভিক্টোরিয়ান কবিদের অনেককেই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। পরে জোনসের এই প্রভাব একাধারে দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশক তাঁকে নিয়ে আলাপ-আলোচনার এবং লেখালেখির গতি ছিল অনেকটা শ্লথ, কিন্তু ১৯৪৬ সালে তাঁর ২০০তম জন্মবার্ষিকী পালনের পর থেকে তাঁর প্রতি পাঠক ও লেখকদের আগ্রহ গভীর এবং ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় এবং প্রচুর লেখালেখি ও গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়। ফলে জোনস্ তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার বহুলাংশ ফিরে পান। জোনস্ সম্পর্কে লেখালেখি এবং তাঁর রচনাবলি এখনও পঠিত হয় এবং তাঁর সম্পর্কে গবেষণা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

তাঁর সম্পর্কে প্রকাশিত গ্রন্থের ব্যাপারে সব রকমের খোঁজখবর রাখা সম্ভবপর না হলেও এ বিষয়ক সর্বশেষ যে গ্রন্থটি আমার হাতে রয়েছে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৩ সালে। গ্রন্থটি স্যার উইলিয়াম জোনসের বিভিন্ন সময়ে লেখার একটি সংকলন। গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশ নিম্নরূপ:

এই বইটি প্রকাশ করে লেখক সত্য এস. পেচোরি নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। তিনি স্যার উইলিয়াম জোনস্‌কে বিংশ শতাব্দির নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বিশ্বের পাঠকদের নিকট তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল রচনাবলি, সুচিন্তিতভাবে নির্বাচিত এবং প্রকাশিত করে উপস্থিত করেছেন। পুরাতন পাঠকেরা জোনস্‌কে আবার ফিরে পাবার শিহরণ যেমন নতুন করে উপলব্ধি করবে, তেমনি নবীন পাঠকেরা তাঁকে হাতের কাছে পেয়ে আলোকিত এবং সমৃদ্ধ হবে। জোনস্‌কে নতুনভাবে উপস্থাপিত করার জন্য ড. পেচোরির কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করতেই হবে। এ প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড সাঈদের *Orientalism*-এর আলোকে ঔপনিবেশবাদ-এর প্রেক্ষাপট টেনে এনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বান্দ্বিকতার

সূত্রপাত না করে আমরা জোনস্-এর উপর আলোকপাত করে যাব। গ্রন্থটির জন্য লেখা তাঁর 'Foreword'-এ প্রথিতযশা পণ্ডিত Rosane Rocher একটি অসাধারণ মন্তব্য করেছেন। আমরা সেটি বিবেচনা করব: তাঁর মতে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে জোনস্ একটি বিরাট কাজ করেছেন। এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে একটি "Momentous step in the internationalization of culture", জোনস্ "was commemorated not only in Calcutta, the seat of the first Asiatic Society, but around the world. In the USA the Modern Language Association, the American Historical Association and international conferences in Princeton on the historiography of linguistics and in Philadelphia on Sanskrit studies, underscored the significance of this event. *It is good that this new publication presents, in a manner accessible to a general educated readership, some of the major achievements of the Asiatic Society's founder, Sir William Jones.*

জোনসের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহ উদ্রেককারী বিষয়বস্তুর সংখ্যা ছিল বিশাল। উদ্ভিদবিদ্যার সঙ্গে রসায়নশাস্ত্র থেকে শুরু করে অসংখ্য বিষয়বস্তু তাঁর মন ও মানসকে আচ্ছন্ন করেছিল। তিনি শুধু বিভিন্ন বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করেই ক্ষান্ত হন নি, সেগুলো অধ্যয়ন করেছেন এবং সেগুলো নিয়ে গবেষণাও করেছেন এবং তাঁর অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলাফল আমাদের জন্য রেখে গেছেন। জোনস্ আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি যে 'Multinational' এবং 'Multicultural' বিশ্বের সম্পর্কের সূচনা করে গিয়েছেন তা আজও বিশ্বের জন্য দিকদর্শন হিসেবে কাজ করে চলেছে। প্রফেসর পেচোবি এই দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাঁর জোনস্ 'READER' সাজিয়েছেন। এই রিডারটিও বিশালায়তনিক। কিন্তু এটির মধ্যে জোনসের কয়টি লেখাইবা আর স্থান পেয়েছে। জোনসের আরো অসংখ্য লেখা রয়েছে যেগুলোর প্রতি অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করতে এ গ্রন্থটি সাহায্য করবে। এখানে *Sir William Jones A Reader*-এর সব লেখার শিরোনামই উদ্ধৃত করা হলো। জোনসের লেখার বিষয়বস্তু এবং ধরন-ধারণ সম্পর্কে পাঠকদের মনে একটি ধারণা দেওয়া হলো। বহুমুখী এই পণ্ডিত ব্যক্তিটির বিচিত্র মেধার বিষয়টিও এই তালিকার মধ্য দিয়ে ফুঠে উঠেছে। গ্রন্থটি থেকে যেসব লেখা এখানে অন্তর্ভুক্ত হয় নি, সেসবের প্রতি পাঠকদের আগ্রহ বাড়বে বলেই আমাদের ধারণা। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় বিখ্যাত জোনস্ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. গার্লেন্ড ক্যানন কর্তৃক সম্পাদিত দুই খণ্ডে প্রকাশিত জোনসের চিঠিপত্রের কথা যা অনেক পাঠককেই সিসেরোর কথা মনে করিয়ে দেবে এবং মনে করিয়ে দেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে ব্রিটেনের খ্যাতিমান সব পত্রলেখকদের কথাও। *Asiatic Researches*-এর বিভিন্ন ভলিউম-এর কথাও গবেষকেরা ভুলতে পারবেন না। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শপেনহাওয়ার এই ভলিউমগুলোর চতুর্থটির একটি কপি নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং তাঁর *The World As Will And Representation* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের লেখায় এটি ব্যবহার করেছিলেন। বস্তুত, জোনসের অর্জনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। সম্পাদক ড. পেচোরি তাঁর এই সংকলনের প্রত্যেকটি অংশের শুরুতে একটি পরিচিতিমূলক নাতিদীর্ঘ রচনা সংযোজন করেছেন এবং অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলির ক্ষেত্রেও টীকা সংযোজন করে পাঠকদের জন্য সহায়ক আলোকপাত করেছেন। এর ফলে পাঠকেরা লেখার পটভূমি সম্পর্কে অবহিত হবেন। অনেক ক্ষেত্রে সম্পাদক টীকা সংযোজন করে সেগুলোকে জোনসের টীকা থেকে ব্রাকেটের সাহায্যে আলাদা করে দেখিয়েছেন। হিন্দুদের জ্ঞানের দেবতা গণেশের উদ্দেশ্যে একটি স্তুতি দিয়ে গ্রন্থটির শুরু এবং এটি ৩টি প্রধান অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অংশেরই নিজস্ব একটি ভূমিকা রয়েছে। আমরা উপরের উদ্ধৃতিগুলো বিচার-বিবেচনা করলেই এই বিষয়গুলো স্পষ্ট হবে। জোনসের সাহিত্যকর্মের বিপুল বিস্তারের কথা মনে রেখে লেখক সংকলনের প্রথম অংশে *Literature* শিরোনামে জোনসের সাহিত্যকর্মের একটি ব্যাপক পরিচিতি দেবার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশের শিরোনাম *Language and Linguistics* এবং এই অংশে রয়েছে তাঁর ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত রচনাবলি। তিনিই আধুনিক এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা ও স্থপতি। গ্রন্থের তৃতীয় এবং শেষ অংশের শিরোনাম *Religion, Mythology and Metaphysics* এবং এটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাঁর সংশ্লিষ্ট রচনাসমূহ। সংকলিত প্রথম লেখাটি *On The Gods of Greece, Italy and India* শিরোনামের নিবন্ধ এই তিনটি দেশের পৌরাণিক কাহিনিসমূহের একটি পথিকৃত তুলনামূলক আলোচনা। এশীয়দের দর্শন নিয়ে আলোচনাটিও একটি পথিকৃত রচনা। হেস্টিংসের মতো জোনস্ও ভেবেছিলেন যে, ভারতীয় আইন দ্বারাই ভারতের বিচারকার্য পরিচালিত হওয়া উচিত এবং সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই তিনি মুসলমান এবং হিন্দুদের আইনগ্রন্থ অনুবাদের কাজে হাত দেন। *বেদ*-এর এবং উপদেশমূলক *মহামুদ্গার* শ্রেষ্ঠতম জোনস্গবেষক প্রফেসর গার্লেন্ড ক্যানোন কর্তৃক উদারভাবে সরবরাহকৃত হলোগ্রাফ থেকে নেওয়া। এর মধ্যে *মহামুদ্গার* এই প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হলো। এই সংকলনে পাঠকেরা পাচ্ছেন প্রায় ২০০ বছর যাবত যেসব লেখা পাওয়া যায় নি তা এবং ইতোপূর্বে অপ্রকাশিত অনেকগুলো অনুবাদ। এই কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, প্রফেসর পেচোরির *Sir William Jones A Reader* স্যার উইলিয়াম জোনস্ সম্পর্কিত আধুনিক যুগের উপযোগী একটি আধুনিক আকরগ্রন্থ। গ্রন্থটির পাঠকপ্রিয়তা এটির সাফল্যের পরিচায়ক।

সংস্কৃতি সংবাদ

এহসানুল ইয়াছিন

শিল্পী শর্বরী রায়চৌধুরীর ভাস্কর্য প্রদর্শনী অনুভূতির মূর্তায়ন

বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস ও কলকাতার আকার প্রকার গ্যালারির সহযোগিতায় প্রখ্যাত শিল্পী শর্বরী রায়চৌধুরীর একক ভাস্কর্য প্রদর্শনী শেষ হয়েছে ৫ই জুলাই। এটি ছিল শিল্পীর নবম একক প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর উদ্বোধন এবং কলকাতার 'আকার প্রকার গ্যালারি' কর্তৃক প্রকাশিত 'অনুভূতির মূর্তায়ন : শর্বরী রায়চৌধুরীর ভাস্কর্য ' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এই প্রদর্শনী আয়োজনে সহযোগিতা করেছে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এবং ঢাকা ক্লাব। শিল্পী শর্বরী রায়চৌধুরী ১৯৩৩ সালে তৎকালীন পূর্ববাংলার ফরিদপুরের উলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট থেকে ভাস্কর্য বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। এ পর্যন্ত তাঁর ৯টি একক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে। তিনি ১৯৫৩ সালে অল ইন্ডিয়া স্কাল্পচার এক্সিবিশনে ভারত সরকারের পুরস্কার এবং ২০০৫ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গগন-অবনী পুরস্কার' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'অবনীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি ১৯৬৯ সাল থেকে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে শিক্ষকতা করছেন। তাঁর শৈল্পিক কাজে বাস্তব ও পরাবাস্তব সত্তার আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটেছে।

সোনাই মাধব

লোকসংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির শেকড়। হাজার বছর ধরে বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ ধারায় শক্তি জুগিয়ে এসেছে লোকসংস্কৃতি। এই অফুরান শক্তির কারণেই আকাশ সংস্কৃতির দাপুটে কালে আমাদের লোকজ পরিবেশনা নতুন করে আন্দোলিত করবে। আর এই ধারণা থেকেই সম্ভবত লোক নাট্যদল মৈমনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে প্রযোজনা করল নাটক সোনাই মাধব। ৬ই জুলাই ২০০৯ সোমবার সন্ধ্যায় এই নাটকটি মঞ্চস্থ হলো শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে। নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন ইউজিন গোমেজ। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন মুস্তফা আনোয়ার স্বপন। নাটকে শুধু মৈমনসিংহ গীতিকার গল্প নেয়া হয় নি। পুরো লোকআঙ্গিকে মঞ্চায়নও করা হয়েছে। চরিত্র উপস্থাপনেও এর প্রয়োগ ঘটেছে। এক কথায় বললে লোক ঐতিহ্যের প্রতিফলন। অবশ্য এরকম একটি গ্রাম পটভূমিনির্ভর কাহিনী অবলম্বনের নাটকে এ ধরনের বাস্তবতাবোধ না থাকলে সফল মঞ্চায়ন কখনই সম্ভবপর হতো না। তাই কাহিনির সঙ্গে সংগতি রেখেই

আনুষঙ্গিক বিষয়াশয় ঠিক করতে হয়। এতে করে দর্শকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিল্পের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে পারে। নাটকটির কাহিনি সোনাই ও মাধবের প্রেম এবং তাদের বিয়োগান্তক পরিণতি নিয়েই রচিত। সোনাই মাধব নাটকটি পদাবলি কীর্তন এবং যাত্রার আঙ্গিকের। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৃত্য। তবে নৃত্য,

সংগীত কিংবা যাত্রার ঢং যাই বলি না কেন, নাটকটিতে উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো- এতে মেয়েদের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ছেলেরা। মজার ব্যাপার হলো মঞ্চায়নের সময় কিংবা আগে থেকেই যদি দর্শকেরা না জানে যে, এখানে কোনো নারী অভিনয় করে নি তাহলে- বোঝা মুশকিল হবে। কারণ অভিনেত্রীর চরিত্রে অভিনয় করা ছেলেরা দারুণ পারফর্ম করেছেন। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন- কামরুন নূর চৌধুরী, আসলাম শিশির, জাহিদ চৌধুরী, পিপলু মনির হায়দার প্রমুখ।

আবুল ফজলের ১০৬তম জন্মবার্ষিকী

আমাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে সাহিত্যিক ভাবুক আবুল ফজলের রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। ১লা জুলাই ২০০৯ বুধবার বিকাল ৪টায় বাংলা একাডেমী সেমিনার কক্ষে আবুল ফজলের ১০৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে 'আবুল ফজলের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. সৈয়দ আজিজুল হক। আলোচনা করেন ড. মাহবুবুল হক এবং ড. সৌমিত্র শেখর। স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী।

'আবুল ফজল আমাদের সাহিত্যের বলবান প্রতিনিধি। তিনি শুরু করেছিলেন গল্প-উপন্যাস দিয়ে। একইসঙ্গে আমাদের চিন্তাশীলতা বিশেষ করে মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯২৬ সালে যে 'শিখা' গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল সেই গোষ্ঠীর অন্যতম তাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর অবদান অসামান্য। একজন সমাজচিন্তক হিসেবে তিনি তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমাদের চিন্তাশীলতার ইতিহাসকে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত করে গেছেন- স্বাগত ভাষণে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান এ কথা বলেন। প্রাবন্ধিক ড. সৈয়দ আজিজুল হক বলেন, কথাশিল্পী আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) চেয়ে প্রবন্ধকার আবুল ফজলই অধিক খ্যাতিমান। কিন্তু তাঁর কথাশিল্পকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে স্বীকার করতেই হয় যে, তাঁর শিল্পীসত্তার মূল প্রবণতা কথাসাহিত্যের মধ্যেই নিহিত। ৬টি উপন্যাস, ৪০টি গল্প, ১১টি নাটিকা নিয়ে সমৃদ্ধ তাঁর কথাশিল্প-বিশ্ব। উপন্যাসগুলোর নাম চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৯৪০-৪১), সাহসিকা (১৯৪৬), জীবনপথের যাত্রী (১৯৪৮), রাঙ্গা প্রভাত (১৯৫৭) ও পরাবর্তন (১৯৮০)। যদিও ১৯৩৪ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত তাঁর উপন্যাসসমূহ প্রকাশের কালগতসীমা। রয়েছে সংশয় ও টানাপড়েন এবং শৈলীগত নিরীক্ষা। ড. সৌমিত্র শেখর বলেন, আবুল ফজল আমাদের চিন্তক, পথপ্রদর্শক। তিনি ছিলেন সমাজ ও দেশ সচেতন একজন মানুষ। সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এক মিথস্ক্রিয়া। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মকে নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বিষয়কেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ড. মাহবুবুল হক বলেন, আবুল ফজল ছিলেন একজন অন্তর্বাস্তবমুখী দায়বদ্ধ ঔপন্যাসিক। তিনি তাঁর উপন্যাসে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের জীবনধারার জটিল দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করেছেন। সভাপতির ভাষণে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, আবুল ফজল তাঁর সাহিত্যে ধর্ম এবং ধর্মতন্ত্র বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন- ধর্মের প্রথাগত কাঠামোর মধ্যে নিজেকে আটকে না রেখে মানবধর্ম মেনে চলতে হবে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ১২৪তম জন্মবার্ষিকী

৯ই জুলাই ২০০৯ বৃহস্পতিবার বেলা ৪টায় বাংলা একাডেমী সেমিনার কক্ষে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রণেতা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ফিরোজা ইয়াসমীন। আলোচনা করেন অধ্যাপক মহাম্মদ দানীউল হক এবং অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী। স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

স্বাগত বক্তব্যে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক বলেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহী মানুষ। বাংলা একাডেমী দু'খণ্ডে বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অধ্যাপক ফিরোজা ইয়াসমীন বলেন, ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় ড. শহীদুল্লাহ্ রচিত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'। একটি বিশেষ কারণে বাংলা ভাষার এ ব্যাকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণের দাবিদার। বাংলা ব্যাকরণ রচনার ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল ১৭৪৩ সালে পাদ্রি মনোএল-দা-আসসুম্পসাওঁ রচিত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর মাধ্যমে। ১৯৩৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছর সময়ে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় অনেকে সচেষ্ট হলেও এঁদের কেউ-ই প্রশিক্ষিত ও পেশাগতভাবে ভাষাবিজ্ঞানী ছিলেন না। এ কারণেই ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অধ্যাপক মহাম্মদ দানীউল হক বলেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন একজন ভাষাপথিক। তিনি ব্যাকরণবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ব্যুৎপত্তি নির্ণায়ক। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন ধর্মভীরু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। শিক্ষাজীবনে সাম্প্রদায়িকতার শিকার হলেও তিনি ছিলেন নিষ্কলুষ একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ।

কবি সুফিয়া কামালের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী

বাংলা একাডেমী কবি বেগম সুফিয়া কামালের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৮শে জুন ২০০৯ রবিবার সকাল ১১টায় একাডেমীর সেমিনার কক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে 'সময়ের এগিয়ে থাকা মানুষ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন। আলোচনা করেন জনাব বেবী মওদুদ এবং কবিপুত্র ড. সাজেদ কামাল। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আয়শা খানম। স্বাগত ভাষণে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক বলেন, কবি সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন দৃপ্তকণ্ঠের অধিকারী একজন সাহসী মানুষ। অন্যায়-অবিচারে, তিনি সবসময় প্রতিবাদী হয়েছেন এবং মানুষের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন বলেন, কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন দ্বৈত সত্তার মানুষ। তিনি সৃজনশীলতাকে যেমন লালন করেছেন তেমনি সামাজিক দায় থেকে এ দেশের সংস্কৃতিচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। ড. সাজেদ কামাল বলেন, কবি সুফিয়া কামাল সবসময়ই বাঙালির সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতেন। শুধু তাই নয়, তিনি সারাবিশ্বের মানুষের কল্যাণের কথাও চিন্তা করতেন। বেবী মওদুদ বলেন, অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনার অধিকারী বেগম সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের দুঃসময়ে জাতির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ধর্মচর্চার পাশাপাশি তিনি বাঙালি নারীকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছেন। সভাপতির ভাষণে আয়শা খানম বলেন, বেগম সুফিয়া কামাল সময়কে ধারণ করেছিলেন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যেখান থেকে তিনি সমাজকে এগিয়ে নিয়েছেন। তিনি ছিলেন আমাদের জাতির বিবেক।

জেমকন সাহিত্য পুরস্কার-২০০৯

বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি নির্মলেন্দু গুণ ও তরুণ কথাসাহিত্যিক শাজান শীলন পেলেন জেমকন সাহিত্য পুরস্কার ২০০৯। এ উপলক্ষে ২৮ জুন হোটেল শেরাটনের বলরুমে হয়ে গেল এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে জেমকন গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদ পুরস্কার প্রদান করেন। জুরি বোর্ডের পক্ষে বক্তব্য রাখেন– পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র, ত্রিপুরার কবি আকবর আহমেদ, প্রফেসর মোহীত উল আলম, প্রাবন্ধিক আহমাদ মাযহার প্রমুখ। পুরস্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ নির্মলেন্দু গুণকে তার 'আত্মকথা ১৯৭১' গ্রন্থের জন্য নগদ ২ লাখ টাকা, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র এবং শাজান শীলনকে তার 'জ্যান্ত সাপের চক্কর' নামের গল্পের পাণ্ডুলিপির জন্য নগদ ২৫ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।